ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস
নীবারসপ্তক
সূর্যতামসীর পরবর্তী খণ্ড
শ্রী কৌশিক মজুমদার প্রণীত

বিজ্ঞাপন

নীবারসপ্তক

- এই পুস্তকটি সূর্যতামসী উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে বিবেচিত হইবে।

- এই পুস্তকে ব্যবহৃত সকল স্থান, স্থানিক ইতিহাস, গুপ্ত সমিতি, গোপন চিহ্ন, চিকিৎসাবিদ্যা ও জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসমূহ লেখকের জ্ঞানমতে সম্পূর্ণ সত্য।

- পুস্তকে বর্ণিত কিছু চরিত্র সম্পূর্ণ বাস্তব এবং কয়েকটি ঘটনা সরাসরি সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে আহৃত হইয়াছে। যে সকল জীবিত ব্যক্তিকে এই পুস্তকে চরিত্ররূপে ব্যবহার করা হইল, লেখক ব্যক্তিগতভাবে দূরভাষে তাঁহাদের অনুমতি লইয়াছেন; যদিচ তাঁহাদের সংলাপ ইত্যাদি লেখকের কল্পনা আশ্রিত। ব্যক্তিগতভাবে লেখক তাঁহাদের নিকট ঋণী।

- মূল কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

- কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইহার সহিত বাস্তবের মিল পাইলে লেখক দায়ী নন।

উপসংহার

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জার্নাল
২৮ জুন, ১৯১১, বৈকাল ৫ ঘটিকা

অতঃপর বাক্সের ভূতকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হইল। এই জগতে এমনবিধ কাণ্ড যে ঘটিতে পারে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলেও তো মনে স্থান দেওয়া যায় না! পাপের কী কুহকময়ী শক্তি! ক্ষমতার কী অপরিহার্য ভয়ানক সংক্রমণ গুণ! লোভের কী ভয়াবহ পরিণাম! কখনও দেখিলাম না এই কুহকে পতিত হইলে কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। নরকের এই পঙ্কিলময় হ্রদ হইতে পুনরুত্থান কি এতই কঠিন!

এক সুতীব্র শীতল অমানিশায় পালকিবাহিত হইয়া চিনাপাড়ার উদ্দেশে আমার যে যাত্রা শুরু হইয়াছিল, ভাবি নাই তাহার শেষ পরিণতি এই প্রকার ভয়ংকর দাঁড়াইবে। যে সকল মহা মহা পাপকে মহান আত্মাদের কলুষিত করিতে দেখিলাম, তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইল কি? বহু নিরপরাধের প্রাণ গেল, বহু পরিবার সর্বস্ব হারাইল, ভূতের দাপটে ইংরাজ সরকারের অটল সিংহাসন অবধি ভাঙিয়া পড়ার উপক্রম হইল। এই সকলই আমি আমার এই বিবৃতিতে বিশদে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পুনরায় বলিবার প্রয়োজন দেখি না। প্রবাদে শুনিয়াছি নৃপতিদের যুদ্ধ হইলে নাকি উলুখাগড়াগণের প্রাণনাশ ঘটে। এই সামান্য সময়কালে তেমন কত উলুখাগড়ার রক্তাক্ত দেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম, তা ভাবিলে ভয়ানক এক নরক-চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। দুঃস্বপ্নের ন্যায় কলিকাতা মহানগরী তাহাকে ভুলিতে চায়।

কিন্তু পারিবে কি?

ভবিষ্যতের পাঠক, যিনি আরম্ভের সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়াও এই জার্নাল সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিলেন, তাঁহার প্রতি এক অসামান্য দায়িত্ব বর্ষিত হইল। তিনি এক্ষণে জানিয়াছেন, সকল অপরাধের পশ্চাতে যে দীর্ঘ ছায়া দণ্ডায়মান, তিনি কোনও সাধারণ মানব নহেন। তাঁহাকে সন্দেহ করা যায়, কিন্তু তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করা কাহারও সাধ্যের বাহিরে। পরবর্তীতে এই ঘটনার উল্লেখ মাত্রে টমসন সাহেব হইতে সাইগারসনের মুখমণ্ডলে এমন আতঙ্কের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়াছি, যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমার বিশ্বাস এই রোমহর্ষণকারী গণহত্যার নায়ক চিরকাল পর্দার আড়ালেই থাকিয়া

যাইবেন। ক্ষমতা দুর্নীতির জনক। যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা তাঁহাতে বর্ষিত হইয়াছে, তাহার বলে তিনি গোটা দেশকে পঙ্কিলতার হ্রদে নিমজ্জিত করিয়া গেলেন। বিশ্বনিয়ন্তা পিতা গো! ইহা হইতে পুনরুত্থানের কি কোনও উপায় নাই?

সাইগারসন সাহেব সম্প্রতি আমায় এক গোপন পত্র লিখিয়াছেন। তিনি গোয়েন্দাগিরি হইতে অবসর লইয়া লন্ডন হইতে অদূরে ডাউনস গ্রামের এক খামারে মধুমক্ষিকা পালনে সময় অতিবাহিত করেন। তারিণীও আপাতত গোয়েন্দাগিরি ছাড়িয়া সস্ত্রীক চুঁচুড়ায় আপন গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। যাইবার পূর্বে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহার চক্ষে জল। প্রিয়তম ব্যক্তির নৃশংস হত্যার অভিঘাত সে এখনও কাটাইতে পারে নাই মনে হয়। অন্যদিকে গণপতি আজ গোটা বঙ্গ তথা ভারতে এক পরিচিত নাম। প্রফেসর প্রিয়নাথ বোসের সার্কাসে তাঁহার ভৌতিক বৃক্ষ, কংসের কারাগার, ভূতুড়ে সিন্দুকের খেলা যাহারাই দেখিয়াছেন, তাঁহার মুনশিয়ানার তারিফ করিয়াছেন। যে ভয়াবহ ঘটনাবলি ও ষড়যন্ত্রের জাল আমাদিগকে একবিন্দুতে আনিয়াছিল আজ সেই নিকষকৃষ্ণ মেঘজাল সাময়িক অন্তর্হিত হইবার কারণে সকলেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি।

হৃদয়ের এক অনাবিল তাড়নায় এই সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম। জানি না, উচিতকার্য হইল কি না। তবে যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, ভূত আমার আয়ত্তে বিশ্রামে রহিয়াছে, কিন্তু ধ্বংস হয় নাই। আমি ইহাকে ধ্বংসের সপক্ষে ছিলাম, কিন্তু সাইগারসনের পীড়াপীড়িতে ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সর্ববৃহৎ প্রমাণকে নিজ হাতে নষ্ট করিতে পারি নাই। ভূতের মুণ্ড তারিণীর নিকট, ধড় আমার দখলে রহিবে। এমন ব্যবস্থা করিয়া সাইগারসন দেশে ফিরিয়াছিলেন। ধড় মুণ্ড একত্র হইলে পুনরায় ভূত জাগিবে। কোনও দুষ্কৃতকারীর হস্তে তাহা পতিত হইলে তো মহা সর্বনাশ। ভবিষ্যতে যদি সেই ভূত জাগ্রত হয়, তবে যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে তা ভাবিতেই শোনিত শুখাইয়া আসে। আর আগ বাড়িব না। আমার সময় ফুরাইয়া আসিতেছে। ইচ্ছা বাকি জীবন সাহিত্যকর্মে ও দেবী সরস্বতীর সেবায় অতিবাহিত করিব।

হে শান্তিময় পিতঃ! তোমার নিকট এখন এই প্রার্থনা যে, ভবিষ্যতে এইপ্রকার পাপের কুহকে কখনোই যেন আমাকে ভুলাইতে না পারে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা জীবনের শেষ সময়ে যেন একাকী বসিয়া জগৎপিতাকে প্রাণভরে স্মরণ করিতে পারি।

আমার জার্নাল এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

পূর্বখণ্ড- সংশয়

প্রথম পরিচ্ছেদ— তৈমুরের অন্দরে অদ্ভুত রহস্য

খট করে একটা শব্দ হয়ে পাল্লাটা খুলে গেল। ভিতরে অন্ধকার। হাত ঢুকিয়ে বুঝলাম কিছু রাখা আছে। টেনে বার করে আনলাম। কাপড়ে প্যাঁচানো দড়ি বাঁধা একটা ছোট্ট প্যাকেট। দেখলেই বোঝা যায় একশো বছরেরও বেশি বয়স হয়েছে। কাপড় জ্যালজ্যালে হয়ে গেছে। দড়ি জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। কাপড় ছিঁড়তেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লাল খাম। মুখ আটকানো। আমার তর সইছিল না। হাত কাঁপছে। কোনওমতে খাম ছিঁড়তেই বেরিয়ে এল বাদামি রঙের একটা বই। আমি নেটে আগে দেখেছি। অবিকল সেটা। বিশ্বাস হচ্ছে না। হাত বোলালাম। আবার... আবার... সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আরও বড়ো কাজ বাকি। তারিণীর ডায়রি? যা থেকে গণপতির ভূতের বাক্সের সন্ধান পাওয়া যাবে? ডিরেক্টরের খোপে হাত ঢোকালাম। কিছু ঠেকল না। এবার টর্চ মেরে দেখলাম। ভিতরটা খাঁ খাঁ করছে। একটা সুতোর টুকরো অবধি নেই।

বাইরের বৃষ্টিটা ধরে গেছে এতক্ষণে। মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে বসলাম। যদি উর্ণার কথা আর গুগলে দেওয়া এই তথ্য সঠিক হয়, তবে এই মুহূর্তে আমি বেশ কয়েক কোটি টাকার মালিক। গোল্ডমাইন আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু কীভাবে সে মাইন থেকে টাকাটা পাব, জানি না। পেলে কী করব তাও বুঝতে পারছি না। প্রথমেই বোধহয় একটা ফ্ল্যাট কিনে উর্ণাকে বিয়ের প্রপোজ করব। ওর বাবা না করলেও শুনব না। কিংবা এই দুই কামরার অফিসের বদলে বড়ো একটা অফিস নেব। কোটিপতিরা কি অফিসে যায়? নো আইডিয়া। কেমন একটা ভোম্বল টাইপ লাগছে নিজেকে।

হাতের চটি বইটার উপরে বাদামি মলাটের চারিদিকে কলকা দেওয়া বর্ডার। ঠিক এমন বর্ডার আমি আগে কোথাও দেখেছি। কোথায় তা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। কিন্তু খুব চেনা। উপরে বড়ো বড়ো হরফে লেখা
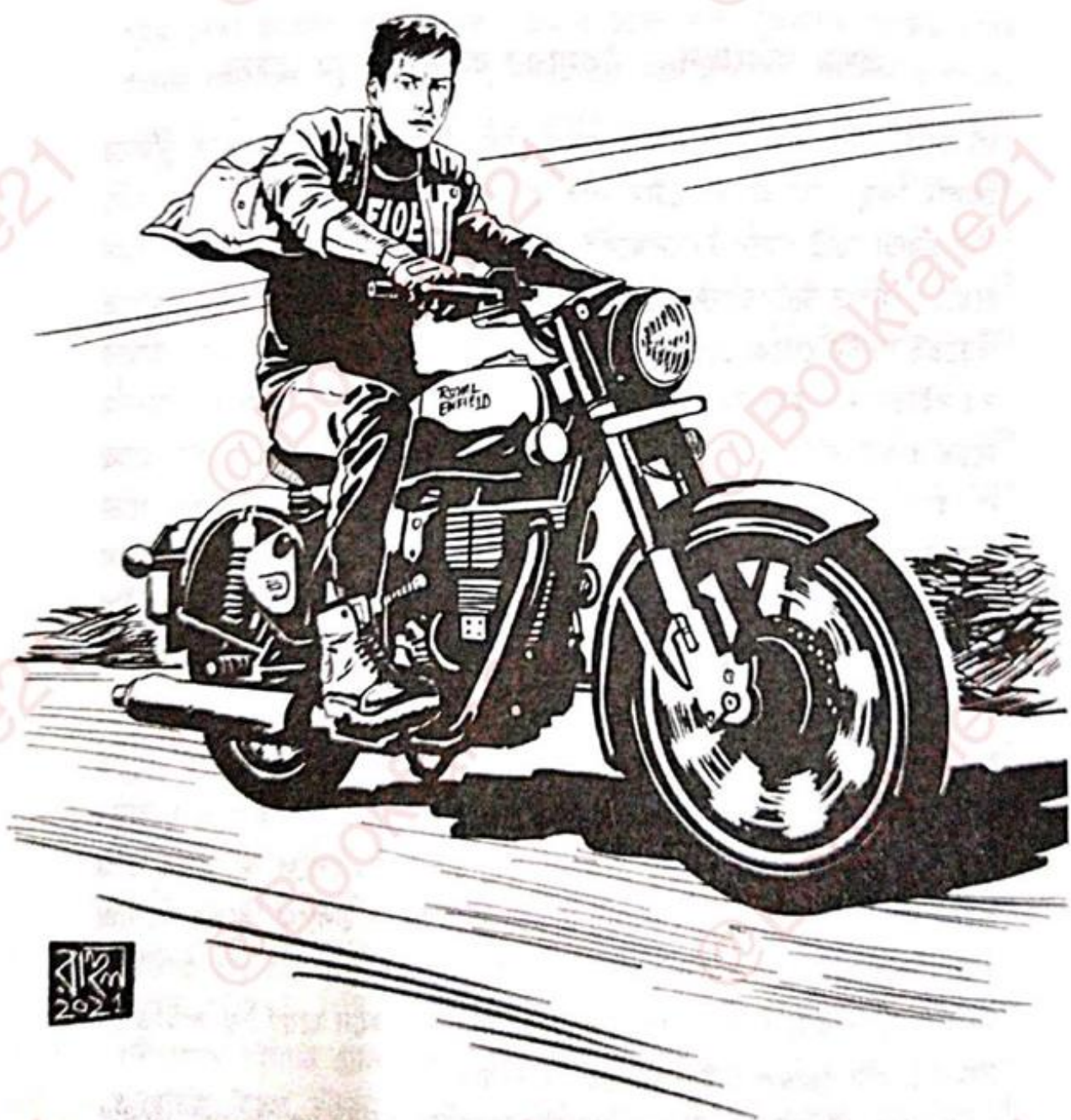
TAMERLANE, তারপরে ছোট্ট করে And আর তার তলায় OTHER POEMS। লেখকের নাম নেই। শুধু পাইকা হরফে মুদ্রিত "এ বোস্টোনিয়ান", যেমনটা উর্ণা বলেছিল। মুদ্রক কেলভিন অ্যান্ড টমাসের নামের নিচেই প্রকাশের সাল, ১৮২৭।

টেমারলেনের ছাপা হওয়া পঞ্চাশ কপির একটা। "তৈমুরের কাব্যগাথা", যার জন্য দেবাশিসদাকে খুন হতে হল, তা এই মুহূর্তে আমার হাতের মুঠোয়। উলটেপালটে দেখতে যাব, তার আগেই টেবিলে একটা গোঁ গোঁ শব্দ। ফোন বাজছে। ভাইব্রেটার মোডে। ফোন হাতে নিয়ে দেখলাম টেলিপ্যাথি... উর্ণা ফোন করছে।

-হ্যালো

-কী ব্যাপার? এতগুলো হোয়াটসঅ্যাপ করলাম, জবাব দিচ্ছ না কেন?

-ক্লায়েন্ট এসেছিল। ব্যস্ত ছিলাম। তুমি এত ফিসফিস করে কথা বলছ কেন? কী হয়েছে?

-অনেক কিছু। ফোনে বলা যাবে না। আমার ক্লাস এইমাত্র শেষ হল। দেখা করা যায়? আর্জেন্ট।

-ঠিক আছে। কিন্তু কোথায়?

-ওই চেনা জায়গা। অ্যালবার্ট হল। রিচার্ডসনের ঘর। শেষ গলিতে। রাখি।

তাড়াহুড়ো করেই ফোন কেটে দিল উর্ণা। কী ব্যাপার কে জানে! ওর বাড়ির লোক, বিশেষ করে বাবা খুব স্ট্রিক্ট। আমার সঙ্গে প্রেম করছে জানলে আমাকে বাড়িছাড়া করবে। বাড়িতে আমরা অচেনা মানুষের মতো থাকি। বাইরেও লোকসমক্ষে ঘোরাঘুরি করি না। তাই দেখা করার জন্য অদ্ভুত সব জায়গা বেছেছে উর্ণা। তাদের একটা অ্যালবার্ট হলের রিচার্ডসনের ঘর। এই ব্যাপারটা আমি আগে জানতাম না। আমাকে উর্ণাই বলেছে। হিন্দু কলেজের ম্যানেজার রামকমল সেনের বাড়ির নাম ছিল অ্যালবার্ট হল। বেজায় রাজভক্ত এই ভদ্রলোক রানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী অ্যালবার্ট, প্রিন্স কনসর্টের নামে নিজের বাড়ির নাম রাখেন। পরে এই বাড়িতেই তিনি স্থাপন করেন অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট। বাড়ির দোতলার এক ঘরে থাকতেন হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ইংরেজির শিক্ষক, অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসন। 'সেই সময়' বইতে সুনীল গাঙ্গুলিও নাকি তাঁর কথা লিখেছেন। পরে রামকমল সেনের নাতি কেশবচন্দ্র এই বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা করেন ভারতসভা-র। চল্লিশের দশকে কলেজপাড়ার এই অ্যালবার্ট হল চলে গেল ভারতীয় কফি বোর্ডের হাতে।

অ্যালবার্ট হল নাম মুছে গিয়ে জন্ম নিল নতুন নাম। কফি হাউস। কিন্তু উর্ণা আগের নামটাই পছন্দ করে। তাতে দুটো সুবিধে, একে তো নস্টালজিয়ার একটা ছোঁয়া থাকে, পাশে চেনা কেউ থাকলেও সহজে বুঝতে পারে না কোন জায়গার কথা হচ্ছে।

উর্ণার গলায় অদ্ভুত একটা চাপা টেনশান। কী হল কে জানে! হাতের বইটা উলটে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময় নেই। কোনওমতে সেটাকে পিঠের ব্যাকপ্যাকে ফেলে অফিসে তালা লাগিয়ে বুলেট স্টার্ট দিলাম। মিনিট দশেক লাগল কফি হাউসের সামনে পৌঁছোতে। গিয়ে দেখি সামনে মঞ্চ-টঞ্চ বেঁধে বেজায় চেল্লামেল্লি করছে এক রাজনৈতিক দল। সামনে ভিড় জমে আছে। যেখানে রোজ বাইক রাখি সেখানে রাখতে গিয়ে দেখি গোপাল হাসি হাসি মুখে পান চিবোতে চিবোতে আসছে। গোপাল এই অস্থায়ী পার্কিংটা দ্যাখে। আমায় দেখে বললে, "আইজ এহানে রাইখেন না দাদা। দ্যাখসেন না মিটিং চলত্যাসে। জ্যাম হইয়া যাইব।"

-এই তো পঞ্চায়েত ভোট শেষ হল। আবার কীসের মিটিং?

-আরে দাদা। আফনে বোঝেন না ক্যান? এডা তো সেমিফাইনাল। ফাইনাল হইব নেস্ট ইয়ার। লোকসভায়। হেইডারই প্রাকটিস চলতে আসে। এহন যতদিন না ইলেকশান হইব, এ চলব। আফনে অন্য জায়গায় গাড়ি রাহেন।"

অনেক দূরে বাইক পার্ক করে আবার কফি হাউসে আসতে আরও মিনিট পনেরো লাগল। শ্যাওলাধরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে দেখি উর্ণা আবার ফোন করছে। ফোন না ধরেই কফি হাউসকে ডান দিকে ফেলে সোজা ঢুকে গেলাম পাশেই চক্রবর্তী চ্যাটার্জির বইয়ের দোকানে। উর্ণার কেন জানি না ধারণা, এই ঘরেই রিচার্ডসন সাহেব থাকতেন। ব্যাগ পিঠেই ভিতরে ঢুকছিলাম। কাউন্টারের ভদ্রলোক মনে করিয়ে দিলেন ব্যাগটা রেখে ঢুকতে। এবার লম্বা লম্বা বইয়ের র‍্যাকের একেবারে শেষের গলিতে। গোপন কথা বলতে গেলে উর্ণা এমন অদ্ভুত জায়গাতেই দেখা করে।

গিয়ে দেখি একটা ইংরাজি বই হাতে নিয়ে ওলটাচ্ছে। নাইট নামের কোনও এক লেখকের লেখা। আমাকে দেখে বই হাতেই বেশ তেরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী ব্যাপার বলো তো? কখন ফোন করেছি! এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার দোকানের আদ্ধেক বই মুখস্থ হয়ে গেল।"

-বাহ। জানলে তো আরও একটু পরে আসতাম। সব বই বিনে পয়সায় পড়া হয়ে যেত। কী বই পড়ছিলে?

-এই বইটা বেশ ইন্টারেস্টিং, ফ্রি ম্যাসনদের নিয়ে লেখা। কিনেই নেব ভাবছি। যাই হোক, শোনো। ফাজলামোর ব্যাপার না। একটা কেস হয়েছে। তোমার জানা দরকার।

-কী কেস?

-বাবা বোধহয় তোমার আমার রিলেশানটা জানতে পেরে গেছে।

-কী করে বুঝলে?

-বাবা তো এমনিতে আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না জানোই। বললেও একেবারে ফর্মাল। সেই বাবা আজ সকালে ব্রেকফাস্টের সময় আমায় জিজ্ঞেস করছে, তুর্বসু কেমন ছেলে রে?

-তুমি কী বললে?

-আমি কী বলব? বলব যে বিচ্ছিরি ছেলে? ফোন করলে এক ঘণ্টা বইয়ের দোকানে দাঁড় করিয়ে রাখে? আমি বলেছি আমি জানি না। তখন বলল আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি কি না। বললাম দুই-একবার কথা হয়েছে। তারপরেই অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল জানো। জিজ্ঞেস করল বাড়ির বাইরে কি আমরা কোথাও দেখা করি?

-কী আশ্চর্য! তুমি কী বললে!

-বললাম।

-কী?

-ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর গোলদিঘিতে দেখা করার কথা।

-মানে?

এবার হেসে ফেলল উর্ণা, "তুমি কি পাগল? ওসব কেউ বলে? বললে তুমি আর আমাদের বাড়ি টিকতে পারবে ভেবেছ? বললাম, জীবনে না। কিন্তু বাবা নানাভাবে জিজ্ঞেস করল। কী মুশকিল বলো দেখি।"

-হুম। তা আমায় এভাবে এখানে ডাকলে কেন?

-শোনো। আমার ধারণা আমার কোনও বন্ধুই বিভীষণগিরি করছে। আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। বাইরেও কোথাও দেখা করা যাবে না। আমি চেষ্টা করছি কে এই শয়তানিটা করছে সেটা ধরার। ততদিন ভিক্টোরিয়া, গোলদিঘি সব বাদ।

-ফোন করা যাবে?

-হোয়া করবে। দরকার হলে আমি কল ব্যাক করব।

-তুমি বাবাকে খুব ভয় পাও, তাই না?

-ও বাবা! যমের মতো। ছোটো থেকে বাবা কোনও দিন আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশেনি। নিজের জগৎ নিয়ে থাকত। অফিস আর ওই এনজিও নিয়েই সারাদিন থাকে। আমার আর মায়ের সঙ্গে কটা কথাই বা বলে সারাদিনে!

-কীসের এনজিও?

-একটা এনজিও আছে বাবাদের। আমিও ভালো জানি না। নানারকম সামাজিক কাজকর্ম করে-টরে। ওটাই বাবার প্রাণ। আমি, মা, কেউ না। ছোটোবেলা একবার বাবার টুলবক্সের কম্পাস ভেঙে ফেলেছিলাম বলে বাবা আমায় প্রচণ্ড মেরেছিল। মা বাধা দিতে আসায় মাকেও...

দেখলাম উর্ণার চোখের কালো আইলাইনারের কোনা জলে ভরে আসছে। গলা ভাঙা ভাঙা। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললাম,

-শোনো না, একটা উপায় আছে। সবদিক ঠিক থাকবে। সাপ মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

"কী", চোখের জল আঙুলের ডগা দিয়ে মুছে জিজ্ঞেস করল উর্ণা।

-আমি বরং তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলি আমি তোমায় বিয়ে করব।

"ইয়ার্কি মেরো না", চোখে জল নিয়েই হেসে ফেলল উর্ণা, "তোমার সবটাতে ইয়ার্কি।"

-একদম না। তুমি একবার বলো। আমি আজকেই গিয়ে বলছি তোমার বাবাকে।

-বাবাহ! বীরপুরুষ। বিয়ে করে রাখবে কোথায়? আমাদের বাড়িতে ঘরজামাই থাকা চলবে না বলে দিলাম।

-কে থাকবে ঘরজামাই! রাজারহাটে ফ্ল্যাট কিনব ভাবছি।

-যা-তা বলছ কিন্তু এবার।

-সিরিয়াসলি! পাঁচ কোটি টাকায় ভালো ফ্ল্যাট হবে না?

-শোনো, হয় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নয়তো আমায় তুমি বোকা বানাচ্ছ। কেসটা কী বলো দেখি?

-সেই পো-র বই। তৈমুরের কাব্যগাথা... তুমি বলেছিলে... বারো কপি... পাঁচ কোটি... গোল্ডমাইন...

-হ্যাঁ, তাতে কী?

-তেরো নম্বরটা পাওয়া গেছে।

-বলো কী! সত্যি!! কোথায়?

-কোথায় পাওয়া গেল পরে বলছি। কিন্তু এখন কোথায় আছে বলতে পারি।

-কোথায়?

-ওই সামনের টেবিলে। আমার ব্যাকপ্যাকে।

-মানে?

-দেখবে তো চলো।

উর্ণা প্রায় লাফিয়ে বেরোতে যেতেই একপাশের ডাঁই করে রাখা বইতে ধাক্কা লাগাল। হুড়মুড় করে পড়ে গেল সবগুলো। কাউন্টারে বসা ভদ্রলোক বেশ ভ্রূকুটি করে তাকাতেই আমি "সরি সরি" বলে বই গুছাতে শুরু করলাম। উর্ণা ততক্ষণে কাউন্টারে চলে গেছে। হাতের বইটা সেই ভদ্রলোককে দিয়ে "এটার বিল করবেন" বলেই ব্যাকপ্যাক খুলে আমার বইটা বার করে ফেলেছে। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে বইটার মলাটের দিকে। ওর চোখ বিস্ফারিত। মুখ হাঁ হয়ে আছে। যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। খুব ধীরে ধীরে বইয়ের মলাট ওলটাল উর্ণা।

আমি দূর থেকে দেখলাম ওর ভুরু কুঁচকে গেছে। আবার দুটো পাতা উলটে গেল খুব তাড়াতাড়ি। দ্রুত চলে গেল পিছনের মলাটে। তারপর হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকল।

আমি বইগুলো গুছিয়েই ওর কাছে উপস্থিত হলাম। উর্ণার চোখে ভ্রূকুটির সঙ্গে ঠোঁটের ডগায় অদ্ভুত তিরতিরে একটা হাসি। বইটা আমার হাতে দিয়ে বলল, "পো সাহেব বাংলায় নাটক লিখতেন সেটা তো জানা ছিল না!"

আমি কিছু না বুঝেই ওর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কোথাও একটা বিষম ভুল হচ্ছে। সবটাই যেন খুব বাজে একটা মজা। প্র্যাকটিক্যাল জোক। যেখানে ইংরাজি কবিতা থাকার কথা, সেখানে একগাদা পাতলা বাদামি পাতা জুড়ে, জড়ানো ছাপার অক্ষরে একটা নাটক ছাপা রয়েছে। নাটক! আর গোটাটাই বাংলা ভাষায়। সে ভাষাও এমন ভাষা যা আমার একেবারেই অচেনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— মৃত্যু প্রহেলিকা

অনেকদিন পরে কলকাতায় এমন সাংঘাতিক গরম পড়েছে। এরকম প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম গত দশ বছরে কেউ দেখেনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের একটা পাতাও নড়ে না। দুপুরে রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। সেদিন চোখের সামনে আকাশের এক পাখিকে ছটফট করতে করতে মাটিতে পড়ে যেতে দেখেছে

প্রিয়নাথ। সারাদিন ঘাম হয়। পুলিশি উর্দিতে সেই ঘাম জমে পচা দুর্গন্ধ ছড়ায়। চারদিকে শুধু শুকনো ধুলো। সবুজের লেশমাত্র মুছে গেছে শহরের বুক থেকে। চামড়া ফেটে যায়, চোখের পাতাও যেন কাগজের তৈরি বলে বোধ হচ্ছে। ব্ল্যাক টাউনে অস্বাস্থ্যকর বদ্ধ জলে মলমূত্রের দুর্গন্ধে রাস্তায় চলা দায়। সেখান থেকে জন্ম নিচ্ছে মশা আর মাছির দল। সাহেবপাড়ায় প্রতিবারের মতো এবারও মড়ক লেগেছে। গরম এলেই সাহেবরা ভয়ে সিঁটিয়ে যান। কেউ পালান সিমলায়। আর যাঁরা তা পারেন না, তাঁরা প্রহর গোনেন। কে জানে এবার কার পালা আসে। এবারের সংখ্যাটা ভয়াবহ। কলেরা, টাইফয়েডের সঙ্গে বম্বে শহর থেকে আসা প্লেগ নামে নতুন এক রোগে মানুষজন গণহারে ফৌত হচ্ছে। সবে মে মাসের শুরু। বৃষ্টি নামতে এখনও একমাসের বেশি। এর মধ্যেই একুশজন রাইটারের মরার খবর এসেছে। রোজ স্টেটসম্যানের অবিচুয়ারি কলাম ভরে থাকে এইসব খবরে।

লালবাজারে নিজের রুমে বসে প্রিয়নাথ সংবাদপত্রের পাতা ওলটাচ্ছিল। মোটা ইটের দেওয়াল, উঁচু সিলিং, তা বলে গরম একটুও কমছে না। আজকাল খুব সকালে অফিস খুলে যায়। দুপুর হতে না হতে জানলা দরজা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে জানলায় মোটা খসখসের পর্দা টাঙানো। ভৃত্যেরা নিয়মিত তাতে পিচকিরি দিয়ে গোলাপজলের ছিটা দেয়। ফলে বাইরের আগুনের হলকা খসখসের মধ্যে দিয়ে ঘরে ঢুকে সুন্দর মৃদু একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু এই গন্ধে বেশিক্ষণ থাকলে আবার মাথা ধরে যায়।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের পাতায় কিছুদিন আগেও শুধু কাজের খবর ছাড়া কিছু থাকত না। এখন পত্রিকার আয়তন বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে অদ্ভুত সব বিজ্ঞাপন আর কেচ্ছা। "দৈবযোগে নরবলি" শীর্ষক এক খবরে লেখা— "জিলা হুগলীর সোনাই মহম্মদপুরে কিছুকাল পূর্বে এক ব্রাহ্মণ আপনি ছাগ বলিদান করিতেছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ওই জন্তুদিগকে ধরিয়াছিল, তাহাতে দৈবযোগে এক কোপ ছাগের গলে না পড়িয়া ভ্রাতার গলে পড়িয়া তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ হইয়া মহা বিপদ ঘটে..." তারপর পুলিশ নাকি "ভ্রাতাবলিদানকারীকে ফৌজদারিতে উপস্থিত করিয়া দিয়াছে।" একই কলামে হুগলী জেলার আরও একটি খবর। "কুলকন্যার কুলত্যাগ"। তাতে জানা যাচ্ছে চুঁচুড়ার কালীপ্রসাদ দত্তের কন্যা যাদুমণি দেবী নাকি এক কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ের পরেই বিধবা হন। এরপরেই "তাঁহার ইন্দ্রিয়বিকার ঘটে।" তিনি কুলত্যাগ করে পালিয়ে যান। বহুদিন তাঁর কোনও খবর ছিল না। এদানি চন্দননগরের পতিতাপল্লিতে সেই

"পঞ্চদশীকে সুখে লীলা করিতে দেখা গিয়াছে।" প্রিয়নাথের মুখে একটা হালকা হাসি দেখা দিল। সেই লীলা, কে যে দেখল আর কীভাবেই বা দেখল সে বিষয়ে একটা কথাও নেই। পরের খবরটা দেখেই প্রিয়নাথ প্রায় শোয়া অবস্থা থেকে একটু উঠে বসল। শিরোনামটি চোখ টানার মতোই। খবরটা এইরকম—

গার্ডেনরিচে মৃত্যু প্রহেলিকা। ১২.০৫.১৮৯৬

পাঠকগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে গত তিন বৎসর যাবৎ কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী চটকলগুলাতে বিভিন্ন কারণে ইংরাজ মালিকগণ শ্রমিকদের অসন্তোষের কারণ হইতেছেন। বিগত তিন বৎসর পূর্বে ভারতীয় চটকল সংঘের সদস্যগণ শ্রমিকদের কর্মের সময় বাড়াইয়া দেন, পরন্তু মজুরি বাড়ান নাই। গত বৎসর টিটাগড় এবং কামারহাটি চটকলের শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথা পাঠকদের স্মরণে থাকিবে। মহামান্য ইংরাজ বাহাদুরকে এই বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আনিতে পুলিশ বাহিনীর সাহায্য লইতে হইয়াছিল। গত বৎসর জুনে বকরি ইদের দিবসে কাঁকিনাড়া চটকলের বিক্ষুব্ধ নেতাগণকে পুলিশ কারারুদ্ধ করেন। বিক্ষোভ স্তব্ধ হয় নাই। দুই মাস যাইতে না যাইতেই বজবজ চটকলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা উগ্র হইয়া উঠে। তাহারা চটকল নিকটবর্তী সকল ইউরোপীয় গৃহ জ্বালাইয়া দেয়। পুলিশ ২১ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিলেও কে বা কাহারা ইহাদের ইন্ধন দিতেছে তাহা লইয়া ইহারা একটি শব্দও উচ্চারণ করে নাই। আপাতনিরীহ এই শ্রমিকগণের এইরূপ আচরণ সকলকেই বিস্মিত করিয়াছে।

এই সকল ঘটনার ঊর্ধ্বে রহিয়াছে গত তিনদিন পূর্বে গার্ডেনরিচ চটকলের ভয়াবহ কাণ্ড। একেবারে প্রত্যুষে নিত্যকার মতই শ্রমিকরা সকলে আপনাপন কর্মে নিরত ছিল। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনবিরতির কিয়ৎক্ষণ বাদেই কারখানার মুসলমান শ্রমিকরা মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে। শুধু তাই নয়, হস্তে লাঠি সড়কি ইত্যাদি লইয়া কারখানার অধিকাংশ দ্রব্য ধ্বংসে উদ্যত হয়। প্রসঙ্গত জানানো প্রয়োজন এই কারখানায় সকল শ্রমিকদের সহিত মালিকপক্ষের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এমনবিধ আচরণে হতচকিত হইয়া মালিক স্টুয়ার্ট সাহেব কারখানার গেট বন্ধ করিয়া দেন।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকগণের মধ্যে আবুল হাসান নামক এক প্রৌঢ় মুসলমান ছিল। সে আচমকা কারখানার দরোয়ানকে আক্রমণ করিয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরে। সকলে নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ত থাকায় মাত্র কয়েকজনই আবুলকে ঠেকাইতে

চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। দরোয়ানটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। মৃত দরোয়ানের নাম কানাইয়ালাল দুবে। বেহার প্রদেশের হিন্দু। এই ঘটনায় অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে এক চাপা উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। আবুলকে ফৌজদারিতে উপস্থিত করা গেছে।

প্রিয়নাথের ভুরু কুঁচকে উঠল। তলায় তলায় বিপ্লবীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে, সে খবর তার কাছে আছে। সিপাই বিদ্রোহের পরে মহারানি ভিক্টোরিয়া যখন শাসনভার নিজের হাতে নিলেন, তখন সবাই ভেবেছিল সব বিদ্রোহের আগুনকে এবার ধামাচাপা দেওয়া যাবে। মহারানি একা হাতে গোটা দেশ সামলাবেন। সমাজের তথাকথিত ইন্টালেকচুয়ালরা মহারানির জয়গান গাইলেন। কিন্তু লালবাজারের কোনায় কোনায় খবর ছিল, বিদ্রোহের আগুন তো নেভেইনি, বরং ধিকিধিকি জ্বলছে সারা দেশ জুড়ে। কোনদিন আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে বেরোবে, কেউ জানে না। এই চটকলের শ্রমিকদের বিদ্রোহ তাতে নতুন সংযোজন। অন্য বিদ্রোহের মতো এটাও তারা দমন পীড়ন করে থামাতে চাইছে। এভাবে কি আর মানুষের ক্ষোভ চাপা দেওয়া যায়!

তবে প্রিয়নাথকে ভাবাচ্ছিল অন্য একটা ব্যাপার। এই প্রথম কোনও নেটিভ শ্রমিক আর-এক নেটিভকে আক্রমণ করল। শুধু তাই না, একেবারে খুন করে ফেলল। সমস্যা হল, যে খুন করল, আর যাকে খুন করল দুজনে আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ের। সুচতুর ইংরেজরা যদি বুঝতে পারে, তবে এই এক অস্ত্রে নিজেদের মধ্যেই বিভেদ বাধিয়ে এদের আন্দোলন একেবারে শেষ করে দেবে।

দরজায় খুব আস্তে দুইবার টোকা পড়ল। পিয়ন এসেছে। কিন্তু এই সময়! এমন গরমে ভরদুপুরে কে আবার এত্তালা পাঠাল! পিয়নটি একেবারে ছোকরা। এসে জানাল টমসন সাহেব প্রিয়নাথকে নিজের রুমে ডেকে পাঠিয়েছেন। জরুরি তলব। মাথায় শোলার হ্যাট চাপিয়ে "চলো তবে" বলে পা বাড়াল প্রিয়নাথ। বড়ো বড়ো অলিন্দগুলো পুরোটাই খসখসের পর্দায় ঢাকা। এদের বলে টাটি। টাটিতে গরম কিছুটা কমলেও এই আঁধারপুরীতে যেন নিজেকে প্রেতের মতো মনে হয়। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে একেবারে অকারণেই প্রিয়নাথের মনে পড়ে গেল বছর চার আগের এক শীতের রাতের কথা। টমসন সাহেব মাঝে কয়েক বছর বদলি হয়ে মুঙ্গের চলে গেছিলেন। এখন অবসরের সময় চলে এসেছে। শেষ পোস্টিং ফের লালবাজারেই।

দোতলায় টমসন সাহেবের ঘরের সামনে এক বিচিত্র যন্ত্র চলছে। সদ্য বিলেত থেকে আসা এই যন্ত্রের নাম থার্মান্টিডোট। কাঠের তৈরি, গোলমতন, প্রায় ৭ ফুট উঁচু, ফাঁপা এই যন্ত্রের পেটে চারটে পাখা লোহার রডে ফিট করা। বাইরে থেকে হ্যান্ডেল ঘোরালে চারটে পাখাই একসঙ্গে ঘুরে ঘরের গরম হাওয়া টেনে নেয়। আর দুধারের গোল করে কাটা ফুটো দিয়ে খসখসের মধ্যে থেকে হাওয়া ঢুকে ঘরে ঠান্ডা সুগন্ধী হাওয়ায় ভরে দেয়। বাইরে এক নেটিভ পিয়ন গলদঘর্ম হয়ে হ্যান্ডেল ঘুরিয়েই যাচ্ছে। প্রিয়নাথকে প্রথমে সে দেখতে পায়নি। পেয়েই চমকে উঠে সিধা দাঁড়িয়ে লম্বা একটা সেলাম ঠুকল। প্রিয়নাথ হাত নেড়ে তাকে বসতে বলল। এই ছেলেটি নতুন। আগে দেখেনি। টমসন সাহেবের ঘরের বাইরে চেয়ার পাতা। সামনে আর্দালি দাঁড়িয়ে। প্রিয়নাথকে চেয়ারে বসতে বলেই সে ঘরে ঢুকে গেল। বেরিয়ে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বলল, "সাহেবরা যেতে বললেন।"

"সাহেবরা?" আর কে আছেন টমসন সাহেবের সঙ্গে? তবে কি সত্যিই জরুরি কিছু ঘটল?

ভাবতে ভাবতেই আর্দালি ভারী ডবল পাল্লার দরজা খুলে দিল।

"মে আই কাম ইন স্যার?" বলতেই "প্লিজ কাম" বলে যে ভারী গলা ভেসে এল তা প্রিয়নাথের চেনা না। এ গলা টমসন সায়েবের না, এ গলা...

ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে প্রিয়নাথ। টমসন সায়েবের চেয়ারে যিনি বসে আছেন তাঁকে প্রিয়নাথ চেনে। নিজের চোখে দেখেছে মাত্র দুই-তিনবার। শেষবার দেখেছিল এক অভিশপ্ত রাতে যেদিন ম্যাজিকের মঞ্চে পরপর খুন হয়েছিল দুইজন। ইনি লালবাজারে আসেন না। দরকার পড়লে রাইটার্স বিল্ডিং-এ তলব করে পাঠান। প্রিয়নাথ সবিস্ময়ে দেখল তার দিকে সোজা তাকিয়ে আছেন বাংলা পুলিশের সর্বেসর্বা ইন্সপেক্টর জেনারেল এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরি। মুখ গম্ভীর। কপালে চিন্তার ভাঁজ। হেনরি সাহেব ১৮৯১ সালের শুরুতে বাংলা পুলিশের দায়িত্ব পান। পেয়েই নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে আসেন পুলিশ ফোর্সে। ফ্রান্সের বার্তিলঁর মাপজোক, আঙুলের ছাপ ইত্যাদি নিয়ে অপরাধী শনাক্তকরণের কাজ ভারতে তিনিই প্রথম শুরু করেন। এই বছরই জানুয়ারি মাসে একটা অর্ডার জারি করছেন তিনি। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে প্রত্যেক অপরাধীর দশ আঙুলের ছাপ নিয়ে একটা অঙ্গুলাঙ্ক পত্র তৈরি করতে হবে। সেগুলো রাখা থাকবে পুলিশের রেকর্ডরুমে। কিন্তু ইংরাজ সরকারের চোখের মণি এই হেনরি সাহেব আজ পথ ভুলে লালবাজারে কী করছেন?

অন্ধকারে চোখ একটু সয়ে যেতেই ঘরের বাকিদেরও দেখতে পেল প্রিয়নাথ। সাহেবের একটু দূরে অন্য একটা চেয়ারে বসে আছেন প্রৌঢ় টমসন সাহেব। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। উলটো দিকে দুই অচেনা নেটিভ, তাঁদের একজন যে মুসলমান, তা তাঁর গুম্ফহীন দাড়ি, মাথার টুপি আর পোশাক দেখেই আন্দাজ করা যায়। অন্যজন সাহেবি পোশাক পরা। রোগা, কঙ্কালসার চেহারা। মুখে দাড়িগোঁফের চিহ্নমাত্র নেই। এরা কারা? কেনই বা প্রিয়নাথকে তলব করা হল? এসব ভাবতে ভাবতেই একটা স্যালুট ঠুকে সিধে হয়ে দাঁড়াল প্রিয়নাথ।

প্রথম কথা টমসন-ই বললেন, "স্যার, এই যে অফিসার প্রিয়নাথ মুখার্জি। এঁর কথাই আপনাকে বলছিলাম।"

হেনরি কোনও উত্তর দিলেন না। শুধু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর সোজা প্রিয়নাথকেই প্রশ্ন করলেন, "তোমাকে কার্টারের ম্যাজিক শো-র দিন দেখেছিলাম তাই না?

আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি সাহেবের। এখনও তাঁকে মনে রেখেছেন! চমকে যায় প্রিয়নাথ। কিন্তু সেসব ভাবার আগেই ধেয়ে আসে পরের প্রশ্ন, "চটকলের শ্রমিক অসন্তোষ বিষয়ে কিছু জানো?"

একেই বোধহয় কাকতালীয় বলে। এক ঘণ্টা আগেও যদি সাহেব ডেকে পাঠাতেন, তবে প্রিয়নাথের বোকার মতো চেয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। মনে মনে সে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়কে ধন্যবাদ দিল। তারপর একটু আগেই সংবাদপত্রে যা পড়েছিল, হুবহু বলে গেল গড়গড় করে।

সাহেব বিশেষ খুশি হলেন না, "এসব তো সংবাদপত্রের কথা। সবাই জানে। ডিটেকটিভ হিসেবে এর বেশি কী জানো তা বলো।"

প্রিয়নাথ মাথা নাড়ল। সে জানে না।

হেনরি সাহেব মাথা নিচু করে কী যেন ভাবলেন। মোটা গোঁফে তা দিলেন দুই-একবার। তারপর বলা শুরু করলেন, "আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যখন বাংলা পুলিশের দায়িত্ব পেলাম, তখন থেকেই হাতের ছাপের উপরে আমার নেশা ধরে যায়। আমি এখনও বিশ্বাস করি কোনও দুটো মানুষের হাতের ছাপ একরকম হয় না, হতে পারে না। তারা দুই যমজ ভাই হলেও না। আমার আগে নদিয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার উইলিয়াম হার্সেল দশ-বারো বছরের ব্যবধানে একই মানুষের হাতের ছাপ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। সেসব ছাপের ভিত্তিতে ফ্রান্সিস গ্যালটন তাঁর 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' বইতে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন,

যে-কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হাতের ছাপ অপরিবর্তনীয়। মৃত্যু অবধি মানুষের চেহারা বদলালেও হাতের ছাপ একই থাকবে। এ কোনও বাজে ধারণা না। বৈজ্ঞানিক সত্য। সূর্য পুব দিকে ওঠে যেমন সত্য, তেমন সত্য।"

প্রিয়নাথ ভাবছিল সাহেব এমন জরুরি তলব করে এসব থিয়োরি কপচাচ্ছেন কেন? সাহেবও বুঝি তা বুঝতে পারলেন। সামনের দুই নেটিভকে দেখিয়ে বললেন, "এঁদের চিনে রাখো। ইনি খুলনা থেকে এসেছেন। নাম আজিজুল হক। ইনিই প্রথম হাতের ছাপের সূত্রটি আবিষ্কার করেন। আর তাঁর পাশের জন রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র বসু। তিনি সূত্রটা ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করেন বোঝার সুবিধের জন্য। যদিও সবাই আমার নামে এই পদ্ধতিকে হেনরি পদ্ধতি বলে, তবু এই দুজন ছাড়া এই কাজ সম্ভব হত না। যাই হোক, কাজের কথায় আসি", বলে সাহেব একটা চুরুট ধরালেন।

"চটকলের শ্রমিকদের অসন্তোষকে প্রথমে আমরা অন্য অসন্তোষের মতোই দেখছিলাম। কিন্তু গার্ডেনরিচের কাণ্ড আমাদের অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। প্রতি ক্ষেত্রেই দাঙ্গা বেধেছে আচমকা। সকাল থেকে কোনও আভাস কারও কাছে ছিল না। পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছে তাদের কারও কোনও পুলিশি রেকর্ড নেই। তাদের আত্মীয় বা পাড়াপ্রতিবেশীরাও জানিয়েছে প্রত্যেকেই একেবারে ছাপোষা শান্তিপ্রিয় মানুষ। কেন আচমকা তারা এমন ব্যবহার করল, তা কেউ বলতে পারছে না।"

"কিন্তু স্যার যারা অমন করেছে তারা তো বলতে পারবে নিশ্চয়ই।"

"আসল চমক এখানেই। তারা সবাই অস্বীকার করছে যে তারা কিছু করেছে। এমনকি তাদের কারও নাকি কিচ্ছু মনে নেই।"

"স্যার। তার মানে ওরা মিথ্যে বলছে।"

"আমরাও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু টিটাগড় আর কামারহাটির দাঙ্গার মধ্যে মাত্র দুইদিনের তফাত। কামারহাটির অপরাধীদের যখন ধরা হল, তখন টিটাগড়ের শ্রমিকরা জেলে বন্দি। একইরকম মিথ্যে কথা, একইভাবে দুই জায়গার শ্রমিকরা বলে কীভাবে, যদি না..."

"যদি না দুটোর পিছনেই একই মানুষ বা দল থাকে।"

"ঠিক তাই। আমরাও সেইভাবেই তদন্ত করছিলাম। কিন্তু গার্ডেনরিচের ঘটনা আবার সব হিসেব উলটে দিল।"

"কীভাবে স্যার?"

"আগে আমরা ভাবছিলাম এই দাঙ্গা একমাত্র ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে।

কিন্তু গার্ডেনরিচে এই প্রথম একজন নেটিভ অন্য এক নেটিভকে আক্রমণ করল। শুধু আক্রমণই করল না। একেবারে খুন করে ফেলল।"

"পুরোনো শত্রুতাও হতে পারে। পত্রিকায় অবশ্য একটা হিন্দু-মুসলমানের দিক তুলেছে স্যার।"

"ওদের তো তাই কাজ। আমি নিজে খোঁজ নিয়েছি। দারোয়ান ছেলেটি একেবারে নতুন। ছোকরা। সবে এক সপ্তাহ হল এসেছিল। আর যে খুন করেছে সে মাঝবয়সি। দুজনের এর আগে কোনও দিন কথাই হয়নি, শত্রুতা তো পরের কথা। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে আবুল হাসান নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছিল। আচমকা সে হাসিমুখেই তার গলা টিপে ধরে। ব্যাপারটা এতটাই আকস্মিক যে কেউ বুঝতেই পারেনি। ছেলেটির চোখ উলটে যায়, জিভ বেরিয়ে যায়, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যায়, আবুল তবু হাসি হাসি মুখে গলা চেপেই ধরে থাকে। সবাই দৌড়ে এসে ছাড়ানোর আগেই সব শেষ।"

"আবুল কী বলছে?"

"সেই আগের মতো। অস্বীকার করছে। বলছে তার কিছু মনে নেই। সে এইসব কিচ্ছু করেনি।"

"মিথ্যে কথা বলছে। আমি নিশ্চিত। ভালো করে জেরা করলেই সব বেরোবে। আমি নিজে ওকে জেরা করব। এখন ও কোথায় আছে স্যার?"

বেশ খানিক্ষণ চুপ থেকে হেনরি বললেন, "নিজের বাড়িতে। আমিই ওকে ছেড়ে দিতে বলেছি।"

"সে কী! কেন স্যার?"

"সেইজন্যেই তোমাকে ডাকা। চার বছর আগে যখন আমি এদেশীয় মানুষদের আঙুলের ছাপ জোগাড় করতে শুরু করি, তাতে অপরাধী ছাড়া সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষও ছিল। আজিজুল হক নিজে এমন কিছু মানুষের হাতের ছাপ নিয়ে সংগ্রহ করে রাখে। এদের মধ্যে আমাদের ছিল এই আবুল হাসান। তার হাতের ছাপ আমাদের আর্কাইভে পাঁচ বছর হল জমা আছে।"

"তবে তো হয়েই গেল স্যার।"

"না, হল না। মুশকিলটা সেখানেই। গ্রেপ্তার করার পর আবুলের হাতের ছাপ নেওয়া হয়েছে, যা হুবহু সেই পাঁচ বছর আগের ছাপের সঙ্গে মেলে। কিন্তু খুন হওয়া দারোয়ানের গলায় বা শরীরের হাতের ছাপের সঙ্গে এই ছাপের বিন্দুমাত্র মিল নেই। প্রায় পঞ্চাশজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে। তবুও

আবুলকে ছেড়ে দিতে হল। আমি যে বিজ্ঞানকে সত্য বলে জানি, তা এই প্রেপ্তার সমর্থন করে না।"

"সেকী! এ তো গণপতির ভোজবাজির চেয়েও অদ্ভুত! একেবারে ভুতুড়ে কান্ড!"

"ভুতুড়ে কান্ডই বটে! শোনো মিস্টার মুখার্জি, মহারানি এই দেশের শাসন হাতে নেওয়ায় সবাই যে খুব খুশি তা না। কোম্পানির আমলে অনেকের অনেক দুষ্কর্ম ধরা পড়ছে। বড়ো বড়ো রাঘব বোয়ালরা শাস্তিও পাচ্ছে। ফলে শুধু নেটিভরা না, অনেক ইংরেজরাও চাইছে কোনওমতে গোলমাল পাকিয়ে তাঁকে বিব্রত করতে। আমরা তো সেটা হতে দিতে পারি না, তাই না? আমি জানি আবুল খুনি। কিন্তু কীভাবে এক নিরক্ষর শ্রমিক অপরাধের সময় নিজের হাতের ছাপ বদলে ফেলল সেটা জানা খুব জরুরি। এভাবে চললে তো কিছুদিন বাদে কোনও অপরাধীকেই আর ধরা যাবে না! যে সামান্য একটা আলোর রেখা দেখা গেছে, সেটাও মুছে যাবে। তোমাকে দাঙ্গার তদন্ত করতে হবে না। তুমি শুধু এই ব্যাপারটা দ্যাখো। আর হ্যাঁ, আমাদের দপ্তরে আমি আর টমসন ছাড়া কাউকে এই বিষয়ে কিছু জানাবে না।"

"কিন্তু স্যার, এই আঙুলের ছাপ ইত্যাদি নিয়ে তো আমার কোনও ধারণাই নেই।"

"সেক্ষেত্রে দপ্তরের বাইরের একজন কনসালটিং ডিটেকটিভ থাকবেন তোমার সঙ্গে। আমার পরেই এ বিষয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি দক্ষ, এমন একজন। হয়তো আমার থেকেও তিনি কিছু বেশিই জানেন।"

"কে তিনি?"

"তোমার পূর্বপরিচিত। এই মুহূর্তে কলকাতায় নেই। বিশেষ কাজে অন্যত্র আছেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধেই তোমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া।"

হেনরি সাহেব গালা দিয়ে সিল করা একটা খাম প্রিয়নাথের দিকে এগিয়ে দিলেন। উপরে টানা হস্তাক্ষরে লেখা "To Mr Priyonath Mukkerjea"। খাম ছিঁড়তেই কার্ডের মতো মোটা দামি কাগজের ছোটো একটা চিঠি। এক পিঠে একটা ঠিকানা দেওয়া। অন্য পিঠে কালো কালিতে লেখা-

"বিশেষ কাজে চুঁচুড়ায় এসেছি। ঠিকানা দিলাম। অতি সত্বর দেখা করুন। ট্রেনযোগে আসবেন। বজরা বা পালকিযোগে না। সঙ্গে অবশ্যই তারিণীকে নিয়ে আসবেন। সময় বেশি নেই। খেলা শুরু হয়ে গেছে।

পুনঃ এখানে ভালো তামাক পাওয়া যায় না। কলকাতার গভর্নমেন্ট প্লেসের

কাছে স্টানলি ওকসের দোকান থেকে দুই পাউন্ড কড়া তামাক আনলে বাধিত হই। প্রতিদান হিসেবে একদিন অবসরে আপনাকে স্ট্র্যাডিভেরিয়াস বেহালায় উচ্চাঙ্গ সংগীত শোনাবার প্রতিজ্ঞা করলাম।

S.M.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— আশ্চর্য বিজ্ঞাপন
প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জার্নাল থেকে

হস্তে চিরকুট পাওয়া মাত্রে ইহা কাহার প্রেরিত বুঝিতে কিছুমাত্র বাকি রহিল না। নানাপ্রকার কার্য্যের গতিকে আজ কয়েক দিবস পর্য্যন্ত আমি বাসায় যাইতে পারি নাই; স্ত্রী ও পুত্রগণ কেমন আছে তাহারও কোনও সংবাদ লইতে সমর্থ হই নাই। এদিকে এই চিঠিকে অস্বীকার করি সে সাধ্য আমার কোথায়? একে আমরা পরাধীন, তাহাতে যে প্রকার কার্য্য করি, তাহাতে আমি পরাধীনের পরাধীন! এমনকি, অধিক কথা দূরে থাকুক, স্নান-আহার প্রভৃতিও স্বাধীনভাবে করিবার ক্ষমতা আমাদিগের অল্পই আছে। পত্র পাইবামাত্র বাসা যাইবার সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিলাম। চার বৎসর পূর্বের সেই নৃশংস নাট্যের কুশীলবরা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেন? এ কী নূতন কোনও ভয়াবহ ঘটনার পূর্বাভাস? নাকি যে পাপের পরিসমাপ্তি হইয়া গেছে মনে করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, সেই দানব পুনরায় জাগ্রত হইয়াছে? ভাগ্যদেবীর এই অপরূপ খেলার অর্থ বুঝিবার সাধ্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্র মনুষ্যের নাই।

আপন অদৃষ্টকে বারবার ধিক্কার দিয়া, অতি ধীরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার ছোটো ঘরটির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার সখের ছড়িগাছটি-যাহা কালের গতিকে ক্রমে অলক্ষিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ছোটো হইয়া পড়িয়াছে, সেই ছড়িগাছটি হস্তে লইয়া নানা দুশ্চিন্তায় কয়েক ঘটিকা ব্যয় করা গেল।

বৈকাল হইতেই সূর্যের তাপ কিছুটা কমিয়া আসিলে পদব্রজেই ধীরে ধীরে ক্লাইভ স্ট্রিট অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাজপথের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। পশ্চিমদিকে প্রকাণ্ড, প্রায় ছয় ফুট প্রশস্ত একখানি কাঁচা ড্রেন বা নর্দ্দামা। এই নর্দ্দামা দিয়াই পার্শ্বের বাটীগুলার পায়খানা, পাকশালার জল

বহিয়া যায়। এই জল, ময়লা প্রভৃতি মাটির সঙ্গে মিশিয়া যে অপূর্ব ভ্যাটভ্যাটে ও কীটসমাকুল আকার ও শ্রী ধারণ করে তাহা বর্তমান পাঠক কল্পনাচক্ষেই দেখিতে পারেন। এমন প্রবল গ্রীষ্মে প্রায়ই উহাতে কুকুর, গোরু ইত্যাদি মরিয়া পড়িয়া থাকে। তাহারা পচিয়া ফুলিয়া যে দুর্গন্ধ ছড়ায় সেই গন্ধের কথা স্মরণ করিলে আজও অন্নগ্রহণে রুচি চলিয়া যায়।

মনুষ্যের ফুর্তির তবু কমতি নাই। এরই মধ্যে কিছু সাহেব ও দেশী বাবুরা সুদৃশ্য ঘোড়া জুতিয়া পালকিগাড়ি বা আফিস ব্রাউনবেরি চাপিয়া দুর্গন্ধ বায়ুসেবনে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। চারদিক খোলা ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়িতে ঘর্মাক্ত কলেবর আফিসযাত্রীরা ঠাসাঠাসি হইয়া গৃহে ফিরিতেছেন। কিছু অধিক ধনীরা সুদৃশ্য ওয়েলার জুড়িয়া ল্যান্ডো ফিটন বা ওই প্রকার মাথাখোলা গাড়িতে ইডেন গার্ডেন অভিমুখে যাইতেছেন। বিলাতি ব্যান্ড বুঝুন বা নাই বুঝুন ইডেন গার্ডেনের ধারে গাড়ি রাখিয়া তাহাতেই সন্ধ্যার বাজনা শেষ না হওয়া অবধি বাবুরা বসিয়া থাকিবেন। গোরাদের ভয়ে ইঁহারা নামিতে সাহস করেন না। ধুতি চাদর পরিয়া গাড়ি হইতে নামিলেই গোরাদের হাতে ইঁহাদের যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইতে হয়। মিথ্যা কহিব না, কিছু ইংরাজ কনস্টেবলও এই লাঞ্ছনায় সানন্দে অংশগ্রহণ করেন।

ক্লাইভ স্ট্রিটে পদার্পণ করতেই দেখিলাম রাস্তার উপর লোকে লোকারণ্য। তাহার ভিতরে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য? ভিড় দেখিয়া সেই স্থানে একটু দাঁড়াইলাম, ও কী প্রকারে উহার ভিতরে প্রবেশ করিব, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে পুরুষ কণ্ঠে ক্রন্দনের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। আমি সেই স্থানে প্রায় দুই মিনিট কাল দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটি চেনা মানুষ সেই ভিড়ের ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া আমার নিকট আসিল। তারিণীচরণ। এই চার বৎসরে তাহার চেহারার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। মুখ মলিন। গণ্ডদেশ শ্মশ্রুমণ্ডিত। কিন্তু চক্ষু দুইটি যেন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল হইয়াছে। আমি উহার চক্ষু দেখিয়াই উহাকে চিনিতে পারিলাম।

তারিণী আমাকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আমি তারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "তারিণী, ব্যাপার কী, বলো দেখি?"

তারিণী— "মহাশয়, বলিব আর কী! আজ চিৎপুর হইতে তিনজন কৃষক তরিতরকারি ও ফলাদি লইয়া এই পথে বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল। পথিমধ্যে দ্বিপ্রহরে বাবু রামচাঁদের বাটির সম্মুখে বিশ্রাম লইয়া এক্ষণে ফিরিয়া যাইবে,

এমন সময় এক সাহেবের পালকিগাড়ির চক্রে একজন কৃষক পতিত হওয়াতে তাহার পদে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে। তাহা দৃষ্ট করিয়াও সাহেব আপন কৌচমেনকে অতিবেগে গাড়ি চালাইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। গরীব কৃষক সেই হইতে আঘাতী হইয়া ভূমে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। এক প্রহরী উপস্থিত আছেন বটে, কিন্তু তিনি নালিশ নেওয়া দূর সেই কৃষককেই ধমক দিয়া বাটীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে হুড়ো দিতেছেন।"

প্রহরী আমার পূর্বপরিচিত। বেহারী। নাম শিউপ্রসাদ সিং। তাহার নিকট হইতে একখানা সেলাম তো লাভ হইলই, উপরন্তু আমার আদেশে সে কৃষককে লইয়া পালকিতে বসাইয়া মেডিকেল কলেজের উদ্দেশে রওনা দিল। পালকির রাহাখরচ আমিই দিলাম। তারিণী আমাকে আপ্যায়ন করিয়া নিজের অফিসে লইয়া গেল। এই অফিসে শেষবার আসিয়াছিলাম চারি বৎসর পূর্বে সাইগারসন সাহেবের সহিত। ঢুকিয়া দেখি তারিণীর চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া, টেবিলে মুখ গুঁজিয়া এক অপরিচিত যুবক কিছু লিখিতেছে। এই কাজে সে এতই ব্যস্ত যে আমাদের আসিবার শব্দ অবধি তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। তারিণী তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সংকুচিত হইয়া দাঁড়াইল।

তারিণী— "মহাশয়। ইহাকে আপনি চিনিবেন না। আমার ন্যায় চুঁচুড়া হইতে ভাগ্য অন্বেষণে কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহার নাম শ্রী শৈলচরণ সান্যাল। চমৎকার লেখার হাত। নাট্যকার হইবার বাসনায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের নিমিত্ত পূর্বে বিভিন্ন থিয়েটারে বেনামে নাটক লিখিয়াছে। এদানি এক বৎসরকাল আমার নিকটেই অবস্থান করিতেছে।"

যুবকটি আমায় প্রণাম করিয়া সসংকোচে ঘরের এক কোণে মাথা নিচু করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "কী লিখিতেছিলে এত মনোযোগ দিয়া?"

যুবকটি ক্ষীণ কণ্ঠে কী বলিল শুনিতে পাইলাম না। এই যুবকের চেহারাতেও দারিদ্র্যের মসী লিপ্ত। সুন্দর কোমল মুখশ্রী, শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখমণ্ডল, দীর্ঘ কেশ গ্রীবা ছাড়াইয়া স্কন্ধে আশ্রয় লইয়াছে। কণ্ঠস্বর মহিলার ন্যায়। মনে মনে ভাবিলাম নাটকের উপযুক্তই বটে। তবে নাট্যকারের নয়, নায়িকার।

উত্তর তারিণীই দিল— "মহাশয়, কী বলিব, কলিকাতা শহরে এদানি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হইতে নাট্যকার সকলেরই বড়ো দুর্দশা। ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে অবসরে হ্যান্ডবিল ও বিজ্ঞাপনের কাপি লিখিতে হয়।"

আমি— "কীসের বিজ্ঞাপন?"

তারিণী— "মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে 'মহৎ আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়' নাম্নী এক ঔষধের দোকান রহিয়াছে। তাহাদের পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সচিত্র। সেই বিজ্ঞাপনের কাপি শৈল লিখে। আমি সঙ্গে দুই তিন ছত্র কবিতা রচনা করিয়া দেই। এই দেখুন", বলিয়া তারিণী একটি পাতলা কাগজের টুকরা আমার হাতে তুলিয়া দিল। কাগজে এক আলুলায়িতা কেশের রমণী। তাহার পরনের পুষ্পবস্ত্র স্খলিত, ফলে পীনোন্নত বক্ষদ্বয় উন্মুক্ত হইয়া আছে। সঙ্গে লেখা—

ইগনোর করিবেন না।

যুবতীর অহঙ্কার। টাইট ব্রেস্ট। আনমিত স্তনভার।

দৃঢ় ও উন্নত স্তনই রমণীর সৌন্দর্য্য

সেই সৌন্দর্য্য যাহাদের নষ্ট হইয়াছে তাঁহারা ঋতুকালে এক এক ঔষধ লইয়া সন্ধ্যায় দুই স্তনে তিনবার করিয়া পাঁচদিন মাত্র ব্যবহার করিলে শিথিল ও পতিত স্তন ঘট-সদৃশ উন্নত ও সুশ্রী হইবে। ইহা মালিশ করিতেও হয় না। কেবলমাত্র অঙ্গুলি দ্বারা স্তনের বৃন্ত ও চারিপার্শ্বে অল্প পরিমাণে পাতলা করিয়া মাখাইয়া দিতে হয়। কাপড় জামা বা সেমিজে দাগ লাগে না। মাসে আটদিনের অধিক ব্যবহারও করিতে হইবে না। মূল্য শিশি বারো আনা এক পাই।

ইহার পরেই এক দীর্ঘ কবিতা, যাহার শুরু এই প্রকার—

যুবতীর যাহা কিছু দর্প অহঙ্কার
আনমিত স্তনভার সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার
এ সম্পদ নাহি যার নাহি কিছু তার
যুগল শ্রীফল-বক্ষ নারীর বাহার।

পড়িয়া মন বিস্বাইয়া উঠিল। তারিণীর ন্যায় বুদ্ধিমান যুবকের এই দুরবস্থা দেখিয়া মনে মনে নিজেকেই ধিক্কার প্রদান করিলাম। চারি বৎসর পূর্বে সাইগারসন সাহেব চলিয়া যাইবার পরে একবারও কি উহার খবর লইয়াছি? জানিতে চাহিয়াছি কীভাবে সে গ্রাসাচ্ছাদন করে? এ কথা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সে না থাকিলে চিনাপাড়ার হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের সাধ্য আমাদিগের ছিল না। হায় রে মনুষ্যচরিত্র! হায় রে ক্ষুদ্র লোভ! আজ যাহাকে প্রাণপ্রিয় বলিয়া গ্রহণ করি আগামী কল্যই তাহাকে নিশ্চিন্তে পরিত্যাগ করিতে একবারও হৃদয় কাঁপে না। আমার চক্ষে জল আসিল। তারিণী বুঝিতে পারিয়া বলিল, "আসলে এই সমস্ত করিতে আমাদিগের বিন্দুমাত্র হীনবোধ হয়

না। আমার কাব্যপ্রীতির কথা তো আপনার অবিদিত নাই! আমি সানন্দেই ইহা করিয়া থাকি। এখন মহাশয় আপনি বলুন, কী উদ্দেশ্যে আজ এই অধমের কুটিরে আপনার পদার্পণ ঘটিল?"

পকেট হইতে চিরকুটখানি বাহির করিয়া তারিণীর হস্তে প্রদান করিলাম। পত্র পড়িয়া তারিণীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "সাইগারসন সাহেব পুনরায় আসিয়াছেন! ইহা হইতে সুখকর সংবাদ আর কী-ই বা হইতে পারে! আমার আদি বাসস্থান চুঁচুড়ায়। ফলে কোনও সমস্যা নাই। আপনি আগামী কল্য প্রভাতে আমার আপিসে আসিবেন। দুইজন একত্রে রেলযোগে যাত্রা করা যাইবে। এই পত্র আপাতত আমার নিকটেই রহিল। তবে এক্ষণে আমায় ক্ষমা করিবেন। কিছু হ্যান্ডবিল মুদ্রিত অবস্থায় আমার কাছে পড়িয়া রহিয়াছে। এগুলা যত শীঘ্র হউক আমাকে প্রাপকের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। সঙ্গে শৈল বলিল এই বিজ্ঞাপনের একটি কাপিও দিতে।"

আমি— "কীসের হ্যান্ডবিল?"

তারিণী— "গণপতির জাদু আর ছায়াবাজির", বলিয়া আর-একটি পাতলা লাল কাগজের হ্যান্ডবিল টেবিল হইতে উঠাইয়া আমায় হস্তান্তরিত করিল। তাহাতে মুদ্রিত—

ভৌতিক জাদুবিদ্যা এবং অদ্ভুত ছায়াবাজি

চিৎপুর রোডের সিন্দুরিয়াপটি নামক স্থাননিবাসী শ্রীযুত বাবু লালমোহন মল্লিক মহাশয়ের বাটিতে আগামী কল্য ১৩ মে, বুধবার সায়াহ্ন হইতে ১৭ মে, রবিবার পাঁচ দিবস ক্রমে ঠিক অষ্টম ঘটিকার পর অপূর্ব ভৌতিক জাদুবিদ্যা ও অদ্ভুত ছায়াবাজি অনুষ্ঠিত হইবে। হিমালয়ের গুরু হইতে জাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়া জাদুকর গণপতি চক্রবর্তী মঞ্চে নানাবিধ খেলা দেখাইবেন। তাঁহার মধ্যে বিখ্যাত হাতসাফাই, কংসের কারাগার ও বন্ধনমুক্তির খেলা বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত এই প্রথমবার তিনি মঞ্চে ভূত নামাইবেন। সে ভূতের কীর্তিকলাপ দেখিয়া চমকিত হইবেন না, এমন মানুষ পৃথিবীতে জন্মান নাই। ভূত কথা বলিবে, প্রশ্নের জবাব দিবে, এমনকি ধূম্রপানও করিবে। বিলাতে দেবেনপোর্ট সাহেবগণ ব্যতীত এই দেশে এমন জাদু আর কেহ দেখাইতে সক্ষম হন নাই। ইহার অব্যবহিত পূর্বেই আকসি হাইড্রোজেন যন্ত্র দ্বারা হীরকের ন্যায় প্রবল আলো ও ছবি সন্দর্শিত হইবেক। এই আলোর আশ্চর্য গুণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেনই। লণ্ঠনের ক্ষুদ্রাকৃতি ছবি আলোকমধ্যে বৃহৎ আকারে দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্বয়ং নিউলেন্ড সাহেব এই কল বানাইয়াছেন। তাঁহার যোগ্য শিষ্য

শ্রীযুত এইচ.এল. সেন মহাশয় জনমধ্যে আনন্দ জন্মাওনার্থ এই মনোরম ছায়াবাজি প্রদর্শন করিবেন। প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ১ টাকা। বাটির দ্বারে টিকিট পাওয়া যাইবে।

অতি সত্ত্বর আপনাপন টিকিট বুক করিয়া লউন!! আসন সীমিত!!!

মুদ্রক— শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, ২৫৬ আপার চিৎপুর রোড, রাজবল্লভ মোড়, পোঃ- বাগবাজার, কলিকাতা

আমি আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, হ্যান্ডবিল ও বিজ্ঞাপন হস্তে লইয়া আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— শ্রীযুক্ত শৈলচরণ শান্যাল

"বটতলা বলতে তুমি ঠিক কী বোঝো?" গম্ভীর গলায় চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

আমি থতোমতো খেয়ে "আমাকে বলছেন?" বলতেই প্রায় ধমকের সুরে উত্তর এল, "তা তুমি ছাড়া এই ঘরে দ্বিতীয় কোনও গোয়েন্দা আছে কি? গোয়েন্দাগিরি করবে আর এটুকু জেনারেল নলেজ থাকবে না, তা কী করে হয়?"

গলা-টলা খাঁকরে, "বটতলা... মানে বটগাছের তলা", বলতে না বলতেই হাঁটুতে প্রবল চিমটি। উর্ণার দিকে তাকিয়ে দেখি চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে। আমি সোজা সারেন্ডার করলাম, "জানি না স্যার।"

"তুমি স্যার বলছ কেন? তুমি কি আমার ছাত্র নাকি?"

"তাহলে কী বলব?"

"অধীশদা বলবে।"

গত পরশু চক্রবর্তী চ্যাটার্জিতে বই খুলে ভিতরে বাংলা বই দেখে উর্ণা প্রথমে বেশ খানিক মজা করছিল। আমি কিচ্ছু না বলে পাতা উলটে দেখছিলাম। পো-র কবিতার বইয়ের ভিতর আসল বইটাই নেই। পড়ে আছে শুধু মলাটটা। ভিতরে অদ্ভুত রকমের একটা বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অন্য একটা বই। সে ভাষার কিছুটা বোঝা যায়, আবার কিছুটা দুর্বোধ্য। যেন ধরা দিয়েও দিচ্ছে না।

উর্ণাকে বললাম, "শোনো না, তুমি তো সাহিত্যের মেয়ে। এই ভাষা চেনো?"

"সাহিত্যের তাতে কী হয়েছে? সে তো ইংরাজি সাহিত্যের। বাংলা তো আমার পাস সাবজেক্ট।"

"তাতে কী? চেনো কি না বলো।"

"চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু শিওর না। কেন বলো তো?"

ততক্ষণে আমি যা দেখার দেখে নিয়েছি। যতটুকু বুঝলাম এই বইটা আদতে একটা নাটকের বই। তাও আজকের না, বাংলা ১৩০৩ সনে লেখা। এই হিসেবটা আমি জানি। এরসঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলেই ইংরাজি সাল পাওয়া যায়... ১৮৯৬ সাল। আমার প্রপিতামহ তারিণীচরণের ডায়রি ওই একটি বছরেই মিসিং। নাট্যকারের নাম শ্রীযুক্ত শৈলচরণ শান্যাল। সান্যালের এমন বানান আগে দেখিনি। এই নামও আগে কানে আসেনি। কিন্তু চমকটা অন্য জায়গায়। মলাটের নিচে খুদে খুদে অক্ষরে লেখা, "যাঁহার এই পুস্তক প্রয়োজন হইবেক তিনি ৩৫ নং ক্লাইভ স্ট্রিটের শ্রী তারিণীচরণ রায়ের আপিসে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন।" ফলে এই লেখক যিনিই হোন না কেন ইনি তারিণীর পরিচিত। শুধু পরিচিতই না, ঘনিষ্ঠ। ঘনিষ্ঠ না হলে কেউ নিজের লেখা বইয়ের দায়িত্ব অন্য কাউকে দেয় না। তারিণীর যে কটা ডায়রি পড়েছি, তাতে কোনও লেখায় আমি এঁর কথা পাইনি। পেলেও খেয়াল করিনি। হয়তো সেই হারিয়ে যাওয়া ডায়রিতে ছিল। ডায়রি যখন নেই, তখন হাতে ক্লু বলতে শুধু এটাই।

"তোমার চেনা কেউ আছেন, যিনি এসব ব্যাপারে ভালো জানেন?"

"আছেন একজন, বাংলা ডিপার্টমেন্টের। অধীশ স্যার। অধীশ বিশ্বাস। কিন্তু আমার সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠতা নেই। বাংলায় আমার এক বান্ধবী আছে, শ্রুতি। ওকে বললে ব্যবস্থা করে দেবে।"

সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী দেড়দিনের মধ্যে আমরা দুজন অধীশ বিশ্বাসের বাড়িতে। উত্তর কলকাতার বনেদি অঞ্চলে দোতলা বাড়ি। বেল বাজাতেই তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে দরজা খুলে আমাদের লাইব্রেরি রুমে নিয়ে বসালেন। রুম দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। মেঝে থেকে ছাদ অবধি বিরাট বিরাট লোহার র‍্যাক। প্রতিটায় ঠাসা সব বই। তাতেও সাধ মেটেনি। মেঝেতে ডাঁই করে পাহাড়ের মতো কিছু বই রাখা। সেন্টার টেবিলে বই বাদে এক ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নেই। কারও ব্যক্তিগত কালেকশানে এত বই থাকতে পারে সে ধারণা আমার ছিল না। টেবিলের আশেপাশে তিন-চারটে গদিআঁটা চেয়ার। তার ওপর থেকেও বই সরিয়ে বসলাম। অধীশ বিশ্বাস প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে

ঢুকলেন। রাশভারী গোলগাল চেহারা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, ঠোঁটের কোনায় হালকা একটা হাসি ঝোলানো। যখন কথা বললেন, বুঝলাম সাধে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইনি এত ফেমাস নন। ভদ্রলোকের যা ভয়েস মডিউলেশান, নিশ্চিন্তে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সংবাদপাঠকের চাকরি পেতে পারেন।

অধীশবাবু খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে বললাম, ঠাকুরদার বাবার পুরোনো জিনিসপত্র ঘাঁটতে গিয়ে এটা পেয়েছি। আমি পেশায় গোয়েন্দা, রহস্য ভালোবাসি। ওঁর নাম আছে তাই জানতে আগ্রহ হচ্ছে কে এই লেখক? আর সেজন্যেই আসা। আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে অনেকক্ষণ মন দিয়ে দেখলেন ভদ্রলোক। পো-র বইয়ের মলাটটা খুলে বাড়িতে রেখে এসেছি। ওটা দেখলেই হাজার কথা উঠবে। শুরুতেই দুই-একবার আপনমনে "স্ট্রেঞ্জ, স্ট্রেঞ্জ" বললেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরে খুব মন দিয়ে বইটা পড়ে গম্ভীর গলায় চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বটতলা বলতে তুমি ঠিক কী বোঝো?"

আমি কিছুই বুঝি না জেনে ভদ্রলোকের মাস্টারি ভাবটা ফুটে বেরোল।

"তবে শোনো, আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগের কথা। শোভাবাজার কালাখানা অঞ্চলে বিরাট একটা বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের শানবাঁধানো তলায় শহরের মানুষরা বিশ্রাম নিতেন, আড্ডা দিতেন, গান বাজনাও করতেন অনেকে। সঙ্গে বসত সস্তার বইয়ের পসরা। এইসব বই ছিল বিশ্বনাথ দেব নামে একজনের ছাপা। ১৮১৮ সালে বটতলা অঞ্চলে বা উত্তর কলকাতায় তিনিই প্রথম ছাপাখানা খোলেন। বহুকাল অবধি এই বান্ধা বটতলাই ছিল অন্য প্রকাশকদের ঠিকানা। তবে এই বইগুলোর কিছু বিশেষত্ব ছিল। একেবারে সাধারণ কাগজে সস্তায় ছাপা হওয়াতে এইসব বইগুলোর প্রোডাকশান কস্ট কম। ফলে দাম কম, আর প্রচুর বিক্রি। কম দামে মানুষ কিনতে শুরু করল তাদের পছন্দমতো বই। কী নেই তাতে? ধর্ম থেকে যৌন কেলেঙ্কারি, জ্যোতিষ থেকে নেশা-বেশ্যা-আমোদ বিষয়ে নানা বই, যা মূল ধারার প্রকাশকরা প্রকাশ করতেন না। এলিট পাঠকরাও নাক কোঁচকাতেন। শিয়ালদহ, গরানহাটা, বড়বাজার, এন্টালি, ডালহৌসি, শ্যামবাজার হয়ে এমন বিরাট বইয়ের বাজার আগে কেউ দেখেনি। বিশ শতকের শুরু অবধি রমরমিয়ে চলেছে বটতলার ব্যবসা।"

"এই বইটা সেই বটতলার বই। তাই তো?"

"এই বইটা অতি অদ্ভুত এক বটতলার বই। একটা কারণে না। অনেকগুলো কারণ আছে।"

"যেমন?"

"শুরু থেকে শুরু করি। বটতলার বইতে ব্রাত্য হিসেবে কিছু ছিল না। তবে মূলত বটতলার বই ছিল দুরকম। ধর্মবিষয়ক, যাতে রামায়ণ, মহাভারত থেকে অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ছাপা হত, অথবা নানা নকশা বা প্রহসন। এই নকশা বা প্রহসনে চেষ্টা করা হত সমকালকে ধরার। তাতে নানা বিতর্কও থাকত। যৌন কেলেঙ্কারি, মদ্যপান, বেশ্যাশক্তি, বাল্যবিবাহ এইরকম আর কি। এই নকশা বা প্রহসনগুলো হত মূলত নাটকের ফর্ম্যাটে। এই নাটকেও শুরুতেই দাবি করা হয়েছে এটি একটি প্রহসন। কিন্তু কন্টেন্টে সমকাল তো নেই-ই, বরং এ এক রূপকথা বা ফ্যান্টাসির গল্প। তাও যে-সে ফ্যান্টাসি না, আজকের ভাষায় যাকে বলে ডার্ক ফ্যান্টাসি।"

"মানে?"

"তুমি পড়েছ এটা?"

"হ্যাঁ, একবার চোখ বুলিয়েছি। ভালো বুঝিনি।"

"না বোঝার কিছু নেই। মন দিয়ে পড়ে দ্যাখো। কী নেই এখানে? সরাসরি যৌন সংগম আছে, ভূত আছে, খুন আছে, বিশ্বাসঘাতকতা আছে, আর সবটাই আছে রূপকথার ছদ্মবেশে। গোলা লোকেদের জন্য লেখা প্রহসনে এত লেয়ার থাকতই না। এ নাটকের উদ্দেশ্য অন্য। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, নাটকে সরাসরি ক্লাসিক থেকে কোট করা হচ্ছে।"

"কীরকম?"

"এই জায়গাটা দ্যাখো।"

দেখলাম লেখা আছে, "কাপালিক– তোমাদের পণ কি? / বুদ্ধিধর– আমাদের পণ জীবনসর্বস্ব।"

"কী? চেনা চেনা লাগছে?"

মাথা নাড়লাম। চিনি না।

"বাংলা কি কিস্যুই পড়ো না নাকি?" বলে ভদ্রলোক উঠে আলমারি থেকে একটা লাল মলাটের বই নিয়ে এলেন। পাতা উলটে বললেন, "দ্যাখো দেখি।"

দেখি তাতে লেখা, "এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কী?" প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

"এবার বইয়ের নাম দ্যাখো", দেখলাম লাল কাপড়ে সোনার জলে লেখা "আনন্দমঠ।" শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। তলায় বইয়ের মালিকের সই, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত।

"কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে কুড়ি টাকায় এই অমূল্য রতন পেয়েছিলেম, বুঝলে! আনন্দমঠ লেখা হয় ১৮৮২ তে। ১৮৯৬-এ এই নাটক যখন লেখা হচ্ছে, তখন বঙ্কিম মারা গেছেন দুই বছর হল। কিন্তু আজ অবধি এমন ক্লাসিক বইয়ের উদ্ধৃতি কোনও বটতলার বইতে আমি দেখিনি।"

"এই নাট্যকার সম্পর্কে কিছু জানা যায় কি? সান্যাল নামের বানান এমন কেন?"

"বানান নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। তখন থোড়াই বাংলা আকাদেমি ছিল। যে যেমন পারত বানান লিখত। বোঝা দিয়ে কথা। যাই হোক, এই শৈলচরণের আদি নিবাস চুঁচুড়ায়। কলকাতায় এসেছিলেন অভিনেতা হতে। কিন্তু চেহারা, গলার স্বর নায়কের উপযুক্ত ছিল না। ফলে যা হয়, একদম শুরুতে কিছুদিন ন্যাশনাল থিয়েটারে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। বেশ কিছু হিট নাটকও ছিল ঝুলিতে। একদিন আচমকা অভিনয় ছেড়ে দিয়ে নাটক লেখার দিকে ঝুঁকলেন। কিন্তু তেমন সফল হলেন না। এদিকে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও এক ব্যাপারে ঝামেলার জন্য তাঁকে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। অভাবের ঠেলায় পঞ্জিকা, হ্যান্ডবিলের বিজ্ঞাপনও নাকি লিখেছেন এককালে। তারপর আচমকা তাঁর ভাগ্য ফেরে। বিজ্ঞাপনে দেখা গেল স্টার থিয়েটারে নাকি শৈলচরণের নতুন সামাজিক নকশা আসতে চলেছে। একাকার। আর তারপরেই সব শেষ।"

"শেষ মানে?"

"শৈলচরণ মোটেই এত বড়ো অভিনেতা বা নাট্যকার ছিলেন না, যে, তাঁর সম্পর্কে এটুকুও জানা যাবে। জানার অন্য কারণ আছে। শৈলচরণের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না। তখনকার পত্রপত্রিকায় এই নিয়ে বেজায় হাঙ্গামা বেধেছিল।"

"খুন?"

"শুধু খুন না, রিচুয়ালিস্টিক খুন। সারা দেহ ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে চিরে দেওয়া। অণ্ডকোশ কেটে মুখে পুরে দেওয়া হয়েছে। সে এক বীভৎস ব্যাপার। স্টারের অমৃতলাল বসু জানিয়েছিলেন শৈলচরণ নাকি মারা যাবার আগে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রহসন লিখে জমাও দিয়েছিল। যদিও পরে সেই নাটকের আর হদিশ পাওয়া যায়নি। দারোগার দপ্তরের প্রিয়নাথ মুখুজ্জে নিজে এই কেসে ছিলেন। রহস্যের সমাধান হয়নি। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, সব কেস নিয়ে লিখলেও এই কেসটা নিয়ে প্রিয়নাথ একটাও শব্দ লিখলেন না কেন?"

এটুকু শুনেই মনে পড়ে গেল চন্দননগরের দেবাশিসদার লাশটার ছবি।

রিচুয়ালিস্টিক খুন। ঠিক এটাই লেখা হয়েছিল পরের দিনের পত্রিকায়। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘোরাচ্ছিল। তবু তার মধ্যেই শুনতে পেলাম অধীশদা বলছেন, "আমি সবচেয়ে চমকে গেছি বিজ্ঞাপনের এই লাইনটা পড়ে, 'এক্ষণে গ্রন্থকর্ত্তার জীবননাশ বা জীবনোদ্ধার দুই কার্য্যের বিবিধ ভার আপনার উপরেই সমর্পিত হইল'। তাহলে কি শৈলচরণ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি এই নাটকের জন্য খুন হয়ে যেতে পারেন? তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন। এটাই কি সেই হারিয়ে যাওয়া নাটক?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— বিড়বিড়, একাকী
(শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রায়ের ডায়রি থেকে)

সহরটা আজকাল বড় বিমর্ষ ঠেকচে। ঝড়ের আগে, বজ্রাঘাতের আগে, পাড়াকুঁদুলে মাগীদের কন্দলের ঠিক আগে যেমন সবটা কেমন নিরব, নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, সহরটা ঠিক তেমনি তালঠান্ডা কচ্চে। কোথাও কিছুই ধূমধাম নাই। অন্ধ জাগ, কিবা রাত কিবা দিন মতন কালও যেমন ছিল আজও তেমনি। খবরের কাগজে বাসি খবরে ভরভত্তি। কোন কারখানায় কে পটল তুলেচে, কে বেগুন বেচচে, আঁতুড়ঘরের ছেলেপিলে চ্যাঁ ভ্যাঁ কচ্চে, অমুকবাবু লাপিয়ে রায়বাহাদুরে উঠলেন, কোন বাঙ্গাল দুপাতা ইংরিজি পাশ দিয়েচে, এই সব উৎসাহহীন খবর। চুঁচুড়া হতে এসেচিলাম বড় আশা নিয়ে। চার বচর আগেও কিচু করার সুবিধে ছিল। সেসব এখন বন্ধ। ড্রিসকল সাহেব গত হয়ে অবধি অপিসে ভাটা লেগেচে। কী করব বুদ্ধির থই পাইনে। কোনক্রমে অন্ন সংস্থান করি। মনকে বলি, সত্যকে প্রকাশ না হতে দিয়ে একদিন বড় পাপ করেছিলাম। চার বচর বাদে সেই পাপেই হয়ত কেবল দুর্গন্ধ পাঁক ও জঙ্গলের আধার হয়েচি। জানি না এই পোড়া অদৃষ্ট কবে ফিরবে।

মনে মনে এমন কল্পনা কচ্চি, সেই সময় এই ত্যাজ্য আমার স্থলে আজ বিধাতা প্রিয়নাথ মুখুজ্জেকে পাঠালেন। কিন্তু কেন? এখন রাত প্রায় তিন প্রহর, ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। চরাচর সকলেই প্রায় নিস্তব্ধ। মনে হয় কোথাও কেউ যেন বেঁচে নাই। শুদু গোচ্ছা গোচ্ছা কঠিন প্রাণ জোনাকপোকা, কালপেঁচা, ঝিঁ২, কর্কশ ধ্বনিতে রাত সরগরম করার উদ্যোগ পাচ্চে। দূরে কোতায় এক বাড়ীতে এক বাবু ইয়ারকির হদ্দ কোরে ফিরে এসে সদর দোর ঠাংয়াচ্চেন। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, ঘুরঘুটে অন্ধকার, কেবল বড় রাস্তা নতুন

বিজলি বাতিতে ফুটফুট কচ্চে। কে যেন হেঁড়ে গলায় বারান্ডা থেকে "প্রেম করা নয় মানুষ মারা" গান গাইচে। এ গান যে লিখেচে সে গুঁড়ি মেরে আমার পাশের ফরাসে শুয়ে আচে। আমি টিমটিমে তেলের আলোতে ডাইরি লিখচি। আমি কি মানুষ! কলকাতায় এসে অবধি কত খুন, গলায় দড়ি, বিষ খেয়ে মরা, কত ভয়ানক চুরি, সিঁধ, মাতলামি, ঢলাঢলি দেখলুম স্মরণ কল্লে গা শিউরে উঠে। তবু চার বচর আগের মত অমন অসৈরণ ঘটনা দেকিনি কো। বাবুরা সাহেবরা তো নিজেদের নিয়েই খুশি। গত চার বচরে একবারটি এ পথ মাড়াননি। সোনাগাছির লক্ষীমতি মরেচে। সে নাকি গলায় দড়ি দিয়েচিল। আমি গেচিলাম গণপতিকে নিয়ে। গোটা মুখ কালোবরণ। দেহ শুকিয়ে গেচে। কেউ বিষ খাইয়ে ঝুলিয়ে দিয়েচে। আমি লালবাজারে প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে দেখা কত্তে গেলাম। দারোয়ান ভাগিয়ে দিলে। উনি আমার মত পেঁচাপেঁচি লোকের সাথে কতা কন না। ময়নারও খোঁজ নেই। নিস্তারিণী বুজি চন্দননগরে পালিয়েচে।

গণপতির অবস্তা কিছু ভালো না। নবীন মান্না তাকে কেলাব ছাড়া করেচেন। এখন তার "ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।" এদানি নাকি হীরালাল নামে এক বড়ঘরের ছেলের সাতে আলাপী হয়ে শো করে দু পয়সা রোজকার কচ্চে। কিন্তু শৈল? সে কী পাপ কল্ল যে তাকে এই শাস্তি ভোগ কত্তে হচ্চে? কত গুণ তার। নীরদ ওস্তাদের কাচে খেয়াল টপ্পা এমন শিকেচে যে গেয়ে মোহিত কত্তে পারেন। চেহারা দেবশিশুর মতন। খাড়া নাক, রং ফুটে বেরুচ্চে, যেন পাকা আঁবটি— যেন দুদটুকু মরে ক্ষীরটুকু হয়েচে। ন্যাশনালের সেরা অভিনেতা ছিল। নলদময়ন্তী নাটকে নায়িকার ভূমিকায় শৈলর অভিনয় দেখে দানীবাবুর বাপ গিরিশ ঘোষ অব্দি ক্ল্যাপ দিয়েচেন। বলেচেন, "শৈলসুন্দরী একন সেরা নটী।" সেই শৈলর যখন মহা বিপদ, তখন দানীবাবু, গিরিশ ঘোষ সবাই তাকে পায়ে ঠেললে। তার কতা বিশ্বেস কল্লে না। অভাগা দ্বারে দ্বারে ঠোকর খেয়ে বেড়ায়। হায় রে! এমন প্রতিভার এ কী দুর্দশা! তবে চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। হাসিকান্না রামসন্নার পিসতুতো মাসতুতো ভাই। আজ খারাপ যাচ্চে, কাল ভালো যাবে। শৈল বড় অভিমানী। ভয় হয়। অভিমানের বশে কখন কী করে আর বিপদ ডেকে আনে। আমি তাকে বারবার বলি, অভিমানের বশে, রাগের বশে হিংসার পথে না যেতে। ও গা করে না। যাদের সঙ্গ পায় তারা সব সাক্ষাৎ কাঁচাখেগো শয়তানের বাচ্চা। ওর ঈশ্বর ওকে সুমতি দিন। প্রিয়নাথবাবুর থেকে খপর পেলুম সাইগারসন সাহেব আবার এসেচেন। তাও চুঁচড়োয়। আমায় যেতে নির্দেশ করচেন। সাহেবের ডাক উপেক্ষা করি সে সাধ্য

আমার নেই। এই মূর্খ নেটিবকে সাহেব যে সম্মান দিয়েচেন তা চিরকাল মাতায় করে রাকব। বিধাতা হয়ত আমাদের ভাগ্যে যন্ত্রণাই লিখে গেচেন। বিধাতার লিখন বদলায় সে সাধ্য কার? মনের ভাব মনই জানে। উন্মত্তের খেয়ালের মত কী যে লিকলাম তার মাতামুন্ডু নেই। ভোর হতে চল্ল। কাল ভোরে প্রিয়নাথবাবু আমাকে নিতে আসবেন। শুতে যাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— জাবুলন

প্রিয়নাথ পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। এতটা পথ, তাও রেলযোগে। ট্রেনে হাজার কিসিমের পেঁচাপেঁচি লোকের ভিড়। তায় আবার একটা ট্রেন মিস করলে পরের ট্রেন অনেকক্ষণ পরে। এই তাড়াহুড়ো প্রিয়নাথের না-পসন্দ। চুঁচুড়া যেতে বজরার চেয়ে ভালো কিছু হয় না। পুলিশের নিজের বোট বিভাগ থেকে একটা আট দাঁড়ের বজরা ভাড়া করলে এক বেলাতেই দিব্যি চুঁচুড়া পৌঁছে দিত। টমসন সাহেব সেই ব্যবস্থা করে দিলে প্রিয়নাথের নিজের রাহাখরচাও কিছু হত না। কিন্তু ওদিকে সাইগারসন সাহেব বারবার করে বলে দিয়েছেন পালকি বা বজরায় না যেতে। কেন কে জানে? স্ত্রী কলকাতায় নেই। বাসার চাকরটাও ছুটি নিয়েছে কদিন হল। স্পিরিট স্টোভ জ্বেলে কোনওক্রমে চাল ডাল চাপিয়ে অপটু হাতে খিচুড়ি বানিয়ে নিল প্রিয়নাথ। তাতেও বিস্তর দেরি হয়ে গেল। সাড়ে দশটায় হাওড়া থেকে প্রথম ট্রেন। দরজায় তালা মেরে রাস্তায় নেমে পকেটঘড়ি দেখল। নটা বেজে গেছে।

একটু দূরেই রাস্তার মোড়ে ছ্যাকরা গাড়ির স্ট্যান্ড। ঘোড়াগুলো নিবিষ্ট মনে মিউনিসিপ্যালিটির লোহার ট্যাংক থেকে জল খাচ্ছে আর ছোলা চিবোচ্ছে। কোচোয়ানরা বিজাতীয় হিন্দি ভাষায় নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাশা করছে। চকচকে কালো রঙের ফার্স্টক্লাস ফিটন আর ব্রুহামগুলোকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল প্রিয়নাথ। এই ওয়েলার ঘোড়ায় টানা গাড়ি চড়ে আরাম, কিন্তু খরচায় বেজায় বেশি। মাইল প্রতি আট আনা। বরং লাল রঙের থার্ড ক্লাস ছ্যাকরাতে তিন আনায় প্রতি মাইল যাওয়া যাবে। দরদস্তুরের প্রশ্নই নেই। গাড়ির গায়ে এনামেলের প্লেটে ভাড়ার চার্ট লাগানো। এককালে এই দরদামের চোটে ঝগড়া, মারামারি এমনকি খুনোখুনির ঘটনাও ঘটেছে। তাই ইদানীং সরকার বাহাদুর গাড়ির কোচোয়ান আর মালিকদের সঙ্গে কথা বলে ভাড়া নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

দুটো ক্যাংলামতো দেশি ঘোড়া একটা থার্ড ক্লাস গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পা ঝাড়ছিল। কোচোয়ান ভিতরে বসে মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। প্রিয়নাথ গিয়ে হালকা ঠেলা দিল।

"এই যে ভাই, হাওড়া স্টেশন যাব। চলো।"

চোখ বন্ধ করেই অবলীলায় কোচোয়ান জবাব দিলে, "নেহি যায়েঙ্গে।"

এই এক মুশকিল। উপরি ভাড়া না দিলে এদের নড়ানো যায় না। সরকার নানারকম চেষ্টাচরিত্র করেছে। আদেশ দিয়েছে কোনও যাত্রীকে ফেরানো যাবে না, কিন্তু সে কথা এদের কানে ঢোকায় কার সাধ্যি!

প্রিয়নাথ গলা চড়াল। "পুলিশ, চল..."

টকটকে লাল চোখে ধড়মড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমেই একটা সেলাম ঠুকল কোচোয়ান, "চলিয়ে সাব। কাঁহা যায়েগা?"

"প্রথমে এখান থেকে ক্লাইভ স্ট্রিট, সেখান থেকে হাওড়া স্টেশন", গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করতে করতে জবাব দিল প্রিয়নাথ।

"বহত খুব।"

ক্লাইভ স্ট্রিটে এখনও অফিসযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়নি। হবে আর খানিক বাদে। নিজের অফিসের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল তারিণী। দাড়ি কামানো। কিন্তু চোখের তলায় কালি। মনে হয় আগের রাতে ভালো ঘুমায়নি। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে প্রিয়নাথ তাকে ডেকে নিল। গাড়ি এসে থামল গঙ্গার এপারেই। স্টেশন হাওড়ায় হলেও, টিকিট আড্ডা কলকাতাতেই। মিন্টের বাড়ির ঠিক পাশ ঘেঁষে। গাড়ি থেকে নেমেই তারিণী "দেখি ব্রিজ খোলা আছে না বন্ধ" বলে কোথায় যেন দৌড় দিল।

বছর কুড়ি আগে কলকাতা থেকে হাওড়া যাতায়াতের জন্য তৈরি হয়েছে এই ভাসমান পন্টুন ব্রিজ। তার আগে ট্রেন ধরতে হাওড়া যেতে গেলে রেলের স্টিমারই ভরসা ছিল। ব্রিজ হওয়াতে হাওড়া যাওয়া এখন অনেক সোজা। একের পর এক কাঠের ডেক জুড়ে ব্রিজ। জাহাজ গেলে মাঝের অংশ খুলে ফেলা হয়। তখন যাতায়াত বন্ধ থাকে। তারিণী সেইজন্যেই খবর নিতে গেল বোধহয়। প্রিয়নাথ গেল টিকিট কাউন্টারের দিকে। সেখানে গিয়ে দ্যাখে আর-এক নাটক চলছে।

থার্ড ক্লাস বুকিং অফিসে প্রচুর লোকের ঠেলাঠেলি। ভিড় সামলাতে রেলের চাপরাশিরা মাঝে মাঝেই সপাসপ বেতের বাড়ি লাগাচ্ছে। লোকের তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। এ ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, গুঁতো মারছে, "গু-খেগোর বাচ্চা" বলে

গালি দিচ্ছে। শুধু শোনা যাচ্ছে, "মশাই শ্রীরামপুর!" "বালি বালি!" "আমাকে দুটো চন্দননগর দিন না।" টিকিটবাবু একটা টুলের উপরে বসে আছেন। সামনে একটা শতছিদ্র আমকাঠের টেবিলের উপরে খোপকাটা ছোটো আলমারি। তার মধ্যেই টিকিটগুলো স্তরে স্তরে সাজানো। টিকিটবাবুও রেগে গিয়ে মাঝেমধ্যেই "চোপ রও", "নিকলো" বলে চিৎকার করছেন আর হাতের লোহার স্ট্যাম্প দিয়ে টিকিটে তারিখ ছাপাচ্ছেন। ভুল হচ্ছে। শ্রীরামপুরের টাকা নিয়ে বালির টিকিট পেয়ে কেউ চিৎকার জুড়েছে, কেউ আবার টিকিটের দাম কেন বেশি, তা নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছে।

প্রিয়নাথ দেখল এই লাইনে দাঁড়ালে আজ আর যাওয়া যাবে না। সে সেকেন্ড ক্লাসের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই লাইন অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। টিকিটের দামও বেশি। থার্ড ক্লাসে রিটার্ন টিকিটের সুযোগ নেই। এখানে আছে। দুই টাকা দিয়ে দুজনের দুটো রিটার্ন টিকিট কেটে পিছন ফিরতেই প্রিয়নাথ দেখল তারিণী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমরা সেকেন্ড ক্লাসে যাচ্ছি?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"আসলে কোনও দিন সেকেন্ড ক্লাসে চাপিনি কি না। চলুন স্যার, এখন জাহাজ নেই। ব্রিজ দিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু গাড়িতে যাওয়া মুশকিল।"

"কেন?"

"দেখে এলাম গোটা ব্রিজে গোরুর গাড়ির ভিড়। একটা গাড়িও নড়তে পারছে না। তাই গাড়ি ধরতে হলে পায়ে হেঁটে যাওয়াই শ্রেয়।"

"বেশ", বলে কোচোয়ানের ভাড়া মিটিয়ে দিল প্রিয়নাথ। এক আনা দস্তুরিও দিল। এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল যা হোক।

ব্রিজে উঠে দেখল তারিণীর কথাই ঠিক। মালবোঝাই গোরুর গাড়িতে গোটা সেতু ঠাসাঠাসি। তার উপরে ব্রিজের ধার বরাবর নানা খাবারের দোকান। সব মিলিয়ে পথচারীদের লবেজান। কোনওক্রমে ভিড় ঠেলে স্টেশনে পৌঁছে দেখল ট্রেন প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। কিছুদিন আগে অবধিও হাওড়া স্টেশনে একটাই প্ল্যাটফর্ম ছিল। ইদানীং আরও দুটো নতুন প্ল্যাটফর্ম হয়েছে। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ট্রেন দাঁড়িয়ে হুইসল মারছে। প্ল্যাটফর্মগুলো ছোট। তাই ইউরোপিয়ান ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রীরা প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়িতে উঠতে পারে। থার্ড ক্লাসের পাঁচটা বগি প্ল্যাটফর্মের বাইরেই থাকে। ট্রেনের বগির তলায় তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। এতকাল তারিণী

ওইভাবেই ট্রেনে উঠেছে। এই প্রথম প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনে উঠল। উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। কাঠের লম্বা বেঞ্চ। আসনের তলায় অনেকে ছোটো ছোটো পুলিন্দায় নানা পণ্যসামগ্রী রেখেছে। যাঁদের মালের পরিমাণ বেশি, তাঁরা মালের জন্য আলাদা এক টাকা ভাড়া গুনেছেন। টিকিট চেকার সেগুলো মিলিয়ে নিচ্ছেন। সেকেন্ড ক্লাসে তেমন ভিড় না হলেও প্রায় প্রতিটা আসন পূর্ণ। ট্রেনে ওঠার আগে স্টেশনের একটা দোকান থেকেই সংবাদপত্র আর কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়েছিল প্রিয়নাথ। গম্ভীর মুখে সেই পত্রিকাটাই পড়তে লাগল। তারিণী খানিক উদাস চোখে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু আলগোছেই বলে উঠল, "আপনার স্ত্রী সন্তানরা আপনার কাছে নেই, ছোটোটা একেবারে শিশু। আপনার মনখারাপের কারণ আমি বুঝতে পারি।"

চমকে উঠল প্রিয়নাথ। এসব তারিণী কীভাবে জানল?

"তুমি কি আমার উপরেও গোয়েন্দাগিরি করছ নাকি হে? বেশি বাড়াবাড়ি করতে এসো না। সোজা হাজতে ঢুকিয়ে দেব", বেশ বিরক্ত হয়েই বলল প্রিয়নাথ।

হেসে ফেলল তারিণী, "আজ্ঞে বাচাল মানুষ, কখন কী বলে ফেলি ঠিক নেই। তবে আপনার আশঙ্কা ভুল। খানিক আগে আমি জানতামও না যে আপনি বিবাহিত।"

"তবে? এ কথা বললে কীভাবে?"

"অনুমানে। যেভাবে আমি অনুমান করতে পারছি যে আপনার চাকর কাম রাঁধুনিটি ছুটিতে গেছে, তাই ভোরে উঠে হাত পুড়িয়ে আপনাকেই খিচুড়ি রান্না করে খেয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে হয়েছে।"

প্রিয়নাথের চক্ষু চড়কগাছ। এখন যা বলছে তা জানা তো কারও পক্ষেই সম্ভব না। গণপতির সঙ্গে থেকে তারিণীও কি জাদুবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে? বছর চারেক আগে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে সাইগারসন সাহেব এমনই অনুমান করে তাকে চমকে দিয়েছিলেন মনে আছে, কিন্তু নিতান্ত সাধারণ এই ব্যক্তি সেই ক্ষমতা আয়ত্ত করল কীভাবে?

যেন প্রিয়নাথের মনের কথা বুঝতে পেরেই তারিণী বলল, "স্যার, আমিই বলি তবে। ছ্যাকরা গাড়িতে উঠে অবধি আপনি বারবার আপনার তর্জনীতে ফুঁ দিচ্ছিলেন আর বুড়ো আঙুল বোলাচ্ছিলেন। আঙুলে কাটা নেই, লাল হয়ে আছে, কিন্তু এখনও ফোসকা পড়েনি। মানে আঙুল পুড়েছে বটে, তবে বেশিক্ষণ আগে না। আজ সকালেই। সকাল সকাল কেন আপনার আঙুল পুড়ল ভাবতে ভাবতে আপনার পোশাকে চোখ পড়ল। সাদা শার্টের দুই জায়গায় হলুদ দাগ আর এক

জায়গায় একটা চাল অবধি শুকিয়ে লেগে আছে। বোঝা গেল আপনার রাঁধুনিটি নেই। নিজেকেই রেঁধে খেয়ে আসতে হয়েছে। তারপরেই দেখলাম ফুলহাতা জামার ডানদিকের হাতার উপরে কালো বুটপালিশের দাগ। মানে জুতোটাও শেষ মুহূর্তে আপনাকেই পালিশ করতে হয়েছে। যে মানুষ নিজে নিজের কাজ করতে অভ্যস্ত তার এইরকম হবে না। এদিকে একই দিনে রাঁধুনি আর চাকর দুজনেই অনুপস্থিত সেটাও মেনে নেওয়া মুশকিল। ফলে সিদ্ধান্ত একটাই, দুজনে আসলে একই লোক। স্ত্রী বাড়িতে থাকলে এসবের প্রশ্নই উঠত না।"

"আর বলো কেন? পরশু ছুটি নিয়েছে ব্যাটা। কাল আসার কথা ছিল। আজ সকাল অবধি পাত্তা নেই। কিন্তু আমি বিবাহিত সেটা বুঝলে কী করে?"

"স্টেশনে আপনার কেনাকাটি দেখে। সংবাদপত্র কিনেই আপনি এক বোতল কুন্তলীন আর দেলখোস কিনলেন। স্ত্রীর মানভঞ্জনে এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। কিন্তু তারপরেই আপনার মনে হল সন্তানদের কথা। আপনি একখানি খেলনা গাড়ি আর একটি ঝুমঝুমি কিনলেন। ফলে সিদ্ধান্ত, সন্তান নয়, অন্তত দুটি সন্তান আছে আপনার। আর আমার ধারণা সত্যি হলে বড়োটি পুত্রসন্তান। ছোটোটি সদ্যজাত। হয়তো সেইজন্যেই আপনার স্ত্রীকে এখন তাঁর বাপের বাড়ি থাকতে হচ্ছে। সামনেই অক্ষয় তৃতীয়া। আপনার বাড়ি যাবার কথা ছিল। সদ্য জানতে পেরেছেন হয়তো যাওয়া হবে না। তাই স্ত্রীর মানভঞ্জনের জন্য এসব কিনে নিলেন।"

প্রিয়নাথের বিস্ময়ভাব কাটেনি। অস্ফুট স্বরে সে শুধু বলতে পারল, "ধন্য তুমি, ধন্য তুমি তারিণী। আমাদের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট জানে না তারা তোমার মতো হিরের টুকরোকে হারাল। আমি টমসন সাহেবের কাছে তোমার হয়ে তদ্বির করব।"

ম্লান একটা হাসি ফুটে ওঠে তারিণীর মুখে, "আপনি চার বছর পরে আমাকে স্মরণ করেছেন সেটাই আমার ভাগ্যি! এর বেশি কিছু চাওয়া আমার পক্ষে বাতুলতা।"

এদিকে গাড়ি শেওড়াপুলি পেরিয়েছে। ট্রেনের কামরা ভিখিরিদের খোল করতালের গানে মেতে উঠেছে—

আয় গো আয় মোহান্তের তেল নিবি কে
হুগলির জেলখানায় তেল হতেছে।
এ তেল এক ফোঁটা ছুঁলে, টাক ধরে না চুলে
বোবায় মাখলে ফোটে কথা, বাঁজার হয় ছেলে।

কুড়ি বছর হয়ে গেল। কেচ্ছার শেষ হল না। বাবু নবীনচন্দ্রের সুন্দরী বউ এলোকেশীকে দেখে তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরির দেহে মদন-আগুন জ্বলে উঠল। নবীনের অনুপস্থিতিতে মোহান্ত এলোকেশীর সতীত্ব নাশ করে। এলোকেশীও মোহান্তের দিকে ঢলে পড়ে। মোহান্তের হাত থেকে বউকে রক্ষা করতে নবীন আঁশবটি দিয়ে এলোকেশীর মাথা কাটে। বিচারে মোহান্তের জেল হয়। সেই কাহিনি এখনও মুখে মুখে ফেরে। গানের সঙ্গে আবার কেউ কেউ টাকে চুল গজানোর তেল বেচে, কেউ আবার বেচে বটতলার বই "মহন্তের এই কি দশা!!" এক আনা দিয়ে একখানা বই কিনেই নিল প্রিয়নাথ। কিন্তু পড়তে শুরু করার আগেই তারিণী তাড়া দিল।

"উঠুন স্যার, চন্দননগর এসে গেছে। এরপরেই চুঁচড়ো। গাড়ি মাত্র এক মিনিট থামবে।"

চুঁচুড়াতে নেমে চিঠির ঠিকানায় আর-একবার চোখ বুলিয়ে নিল তারিণী।

"এ আমার চেনা বাড়ি। চলুন", বলে প্রিয়নাথকে পালকির আড়ার দিকে নিয়ে চলল। পালকি বেহারারা তারিণীর পুর্বপরিচিত। ফলে মাত্র তিন আনায় রাজি হয়ে গেল। তারিণী পালকি নেবে না। সে পাশে পাশে হেঁটে যাবে।

পালকিতে মিনিট দশেক যেতেই সাদা বড়ো বাড়িটা চোখে পড়ল প্রিয়নাথের। গঙ্গার একেবারে ধারেই সাহেবি বাড়ি। সামনে বাগান। পোর্টিকো। তবে কলকাতার সাহেবি বাড়ি থেকে একটু অন্যরকম। অন্য ধাঁচের। পাশেই সুন্দর একখানা পার্ক।

"এই বাড়ি একশো বছরের বেশি পুরোনো। এক ওলন্দাজ সাহেবের বানানো। ইংরেজরা এককালে এই বাড়িতে স্বাস্থ্য উদ্ধারে আসতেন। মাঝে কিছুদিন সংস্কারের কাজে বন্ধ ছিল..." হাঁটতে হাঁটতেই জানাল তারিণী।

এখানকার গরম কলকাতার চেয়ে কম। কারণ হয়তো গঙ্গার হাওয়া। এত জোরে হাওয়া বয় যে পাড়ে বসে থাকলে হাওয়ার আওয়াজে অন্য কোনও কথা শোনা যায় না। গেটের সামনে পালকি নামাল বেহারারা। সদরে বল্লম হাতে পাইক দাঁড়িয়ে। প্রিয়নাথ নিজের নাম বলতেই রাস্তা ছেড়ে দিল। বোধহয় তাদের আসার খবর আগাম বলা ছিল। সামনের কেয়ারি করা বাগানে নানারকম বিদেশি ফুল ফুটে আছে। মাঝে মাঝে মার্বেলের নারীমূর্তি। সেসব পেরিয়ে মূল দরজায় যেতে এক নেটিভ চাকর তাদের দিকে দৌড়ে এল। সাইগারসন সাহেব কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই একেবারে বশংবদ হয়ে "এদিকে আসুন। সাহেব সবে ঘুম থেকে উঠে ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট করছেন" বলে

বাড়ির অন্যপাশে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সাহেবি আমলের পুরোনো বাড়ি। দেওয়াল খুব মোটা আর ছাদ খুব উঁচু। চারিদিকে আমবাগান হবার জন্য ভিতরটা বেশ ঠান্ডা। খাবার ঘরে বিরাট বড়ো সেগুন কাঠের টেবিলের একপ্রান্তে সাহেব বসে ব্রেকফাস্ট সারছিলেন। টেবিলে থরে থরে খাবার, ফল, ফলের জুস সাজানো। সাহেব অবশ্য এসব কিছুই মুখে তুলছেন না। তিনি একমনে পাশের একটা প্লেটে একফালি বাঁকা চাঁদের মতো পাউরুটিতে গোলাপি জেলি মাখিয়ে খাচ্ছেন। পাশেই লম্বা ডাঁটিওয়ালা রুপোর কাপে একটা কাঁচা ডিম রাখা। সঙ্গে চামচ। রুটির পরেই সাহেব এই ডিম ভেঙে খাবেন।

প্রিয়নাথদের দেখেই একগাল হেসে উঠে দাঁড়ালেন সাইগারসন। প্রিয়নাথ আগের দিন সাহেবের তামাক কিনে এনেছিল। সাহেব তা পেয়ে দারুণ খুশি। প্রিয়নাথ আর তারিণীকে বললেন তাঁর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে। প্রিয়নাথ বেশি কিছু খেল না। তারিণী বোধহয় কিছু খেয়ে আসেনি। সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। খাবার টেবিলে মাথায় একটা চৌকো পাখা ছাদ থেকে ঝুলছে। ঘরের একধারে এক ভৃত্য দাঁড়িয়ে। সে একবার পাখার দড়িটা টানছে, আর ছাড়ছে, যেমনভাবে লোকে ঘণ্টা বাজায়।

প্রিয়নাথ দেখল এবার কাজের কথায় আসা উচিত। বলল, "কিছু জরুরি কথা ছিল সাহেব। জরুরি আর গোপনীয়। টমসন সাহেব আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেছেন। তারিণী বরং এখানে খেতে থাক, আমরা নাহয় অন্য ঘরে..."

"আপনার বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে অফিসার। আমি তারিণীকে আপনার পথপ্রদর্শক হিসেবে আসতে বলিনি। বরং আপনাকেই অনুরোধ করেছি তারিণীকে নিয়ে আসতে। আমার প্রয়োজন আপনার সঙ্গে যতটা, তারিণীর সঙ্গে তার অণুমাত্র কম নয়।"

প্রিয়নাথ অবাক। তারিণীর দিকে তাকিয়ে দেখল তারও খাওয়া বন্ধ। সেও অবাক চোখে সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছে। সাইগারসন চোখের ইশারা করলে পাঙ্খাবরদারটি সেলাম ঠুকে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। যাবার আগে বন্ধ করে গেল ঘরের ভারী দরজাটা।

এবার সাইগারসন নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে বসলেন তারিণীর ঠিক উলটো দিকের চেয়ারে। পকেট থেকে একটা ব্রায়ার রুট পাইপ বার করে তাতে প্রিয়নাথের আনা তামাক ভরতে ভরতে তারিণীর দিকে তাকিয়ে সরাসরি তাকেই প্রশ্ন করলেন সাইগারসন, "তারিণী, যা বলবে সত্যি কথা বলবে।

যদিও আমি বিশ্বাস করি তুমি মিথ্যে বলতে পারবে না। তবু বলছি, যা জানো, যতটুকু জানো, গোটাটাই আমায় বলো। কিচ্ছু গোপন করলে মহা বিপদ।"

তারিণীর খাওয়া বন্ধ। পাশেই কাচের পাত্র থেকে গেলাসে জল ঢেলে মুখের খাবারটা কোনওক্রমে গিলে ফেলে তারিণী প্রশ্ন করল, "বলুন সাহেব, কী জানতে চান আপনি?"

"জাবুলনদের নিয়ে তুমি কী জানো?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ— হামচুপামুহাফ

অধীশদার বাড়িতে কফি, শিঙাড়া খেয়ে বেরোতে বেরোতে দেরি হয়ে গেল। অধীশদা প্রথমে বইটা রেখে দিতে চাইছিলেন, পরে কী যেন ভেবে বললেন। "বাদ দাও। মোবাইলে ছবি তুলে নিচ্ছি।" বেরিয়েই উর্ণার একগাল হাসি। বাংলায় যাকে বলে 'হাইক্লাস'।

"দেখলে তো? একদম খোদ জায়গায় নিয়ে এসেছি। আমি আগেই জানতাম, যদি কেউ পারে তো অধীশদাই পারবেন।"

"সে তো ঠিকই, কিন্তু আসল খটকাটা রয়ে গেল। এই নাটক পো-র বইয়ের ভিতরে গেল কীভাবে? আসল বইটাই বা কোথায়? শৈলচরণের সঙ্গে তারিণীর সম্পর্ক কী? শৈলচরণের খুনের যা বর্ণনা শুনলাম তা প্রায় পুরোটাই দেবাশিসদার খুনের মতো। একশো বছরের ব্যবধানে দুজন মানুষ একইভাবে খুন হয় কীভাবে? এটা কি কাকতালীয়? না ইচ্ছে করে এমন কেউ করছে, যে আগের খুনটা বিষয়ে সব জানে?"

উর্ণা গম্ভীর মুখে আমার কথা শুনতে শুনতেই হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল, "এই রে, সাড়ে আটটা বেজে গেছে! শিগগির বাড়ি যাই। টিউশানে যাব বলে বেরিয়েছি। আর দেরি হলে বাবা আমার পিঠের ছাল ছাড়াবে। তুমি গঙ্গার ধারে বসে বসে এসব ভাবো। এক ঘণ্টার আগে বাড়ি ঢুকো না।"

"তুমি বাড়ি ফিরবে কীসে?"

"চাপ নেই, ট্যাক্সি পেয়ে যাব।"

"পৌঁছে ফোন করবে?"

"না না। ইমপসিবল।"

মুচকি হেসে বললাম, "বাইকে করে একটা লিফট দিয়ে দিই?"

"আগে তো একটা সিট তো লাগাও বাইকের পিছনে, তারপর বড়বড় কথা বলবে" বলে উর্ণা ভুরু কুঁচকে এমন রাগি রাগি লুক দিল যে আর কিছু বলার সাহস পেলাম না। আমি বাইক ঘুরিয়ে সোজা গঙ্গার দিকে। অধীশদার বাড়ির একটু দূরেই ছোটেলাল ঘাট। আসল নাম নাকি ছোট্টুলাল দুর্গাপ্রসাদ ঘাট। সামনে সরু রাস্তা, ঘিঞ্জি দোকান পেরিয়ে ঘাটের লাল বাড়ি। এখন ঘাটের ভিড় অনেকটা কম। কিছু মানুষ এদিক ওদিক বসে আছেন। জলে তিন-চারটে নৌকা। উলটো দিকেই হাওড়া স্টেশন। হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে গেলাম জেটির ধারে। এখানে জল বেশ গভীর। কেউ পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না।

জেটিতে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে থাকতে একটা কথা মনে হল। একশো বছর আগে তারিণীর বন্ধু শৈলচরণের খুন আর আমার বন্ধু দেবাশিসদার খুনে অদ্ভুত মিল। শৈল থাকতেন চুঁচুড়া, দেবাশিসদা চন্দননগর। দুজনেই সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, পড়াশুনো করা মানুষ। এদিকে আমি আর তারিণীচরণ দুজনেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ। অবাস্তব শুনতে লাগলেও মনে হচ্ছে কেউ একজন সেই খুন সম্পর্কে জেনে আবার সেটাকে রিক্রিয়েট করছে। আমাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে সেটা সমাধানের। কিন্তু তারিণী কি শৈলবাবুর মৃত্যুরহস্য সমাধান করেছিল? জানার উপায় তখনকার পত্রপত্রিকা। অধীশদাই তো বললেন বেশ হইচই হয়েছিল সেসব নিয়ে। আর কোথায় পেতে পারি? ভাবতেই চমকে উঠলাম। আরে! ক্লু তো দেবাশিসদাই আমায় দিয়ে গেছেন। মারা যাবার ঠিক আগে। "প্রিয়নাথের শেষ হাড়" আর "তারিণীর ছেঁড়া খাতা।"

এই হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই দুজনের যোগ ছিল। আমি নিশ্চিত। দুজনেই লিখতে ভালোবাসতেন। এত বড়ো ঘটনার কথা লিখে যাবেন না তা হতেই পারে না। কিন্তু দুটোকেই কেউ হাপিস করে দিয়েছে। প্রিয়নাথের লেখাটা আর্কাইভ থেকে দেবাশিসদা চুরি করে নিয়ে এসেছিলেন, যদিও অফিসার মুখার্জি জানিয়েছেন তিনি দেবাশিসদার ঘরে সেটা পাননি। তবে কি প্রিয়নাথের লেখাতে তারিণীর কথা ছিল? সেখান থেকেই তিনি ক্লাইভ স্ট্রিটের অফিসের খোঁজ পেয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন? আমাকে দেবাশিসদা বারবার বলতেন আমার জন্যেই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কেন? শৈলর মৃত্যুর ডিটেইলস খুব সম্ভব তাঁর জানা ছিল। তার পরেও ঠিক একইভাবে তিনি নিজেই খুন হয়ে গেলেন। এই ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছিল না। এদিকে শুনছি অফিসার মুখার্জিও দারুণ ভয়ে আছেন।

দেবাশিসদার মৃত্যুর পরে আমাদের দুইজনের কাছে দুটো জিনিস আসে। আমার কাছে সেই ছড়া আর ওঁর কাছে কাটা অণ্ডকোশ। এই ঘটনা দুটো কি বিচ্ছিন্ন? না পরস্পরের সঙ্গে জড়িত? উনি বলছেন কারা নাকি তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে। বাড়িতে চৈনিক চিহ্নযুক্ত চিঠি আসছে। যে বা যারাই এই খেলাটা খেলুক না কেন, খেলার দুই বোড়ে আমরা দুইজন। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল। রাত বাড়ছে। একঘণ্টার অনেক বেশি হয়ে গেছে। এবার বাড়ি ফেরা যাক।

গলিতে ঢোকার মুখেই পুলিশের গাড়িটা দেখে কেমন একটা সন্দেহ হল। উর্ণাদের বাড়ির একটু দূরে দাঁড়ানো সাদা এসইউভি-টার নম্বর আমার চেনা। দিন পনেরো আগে এতে চড়েই চন্দননগরে দেবাশিসদার বাড়ি যেতে হয়েছিল। কিন্তু এ গাড়ি আবার এখানে কেন? আবার কী হল? গাড়ির পাশেই অমিতাভ মুখার্জি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমায় দেখে হাত নেড়ে দাঁড়াতে বললেন।

"একঘণ্টা ধরে ফোন করছি। ধরছ না কেন?"

এই রে! অধীশদার বাড়ি ঢুকে মোবাইল সাইলেন্ট করেছিলাম। আর অন করা হয়নি।

মিথ্যে বললাম, "চাপ পড়ে সাইলেন্ট হয়ে গেছে। খেয়াল করিনি।"

"সে কী! অ্যান্ড্রয়েড ফোনও আজকাল চাপ পড়ে সাইলেন্ট হয়ে যাচ্ছে! যাই হোক, তোমার বাড়ির মালিক বলল যাবে আর কোথায়, রাতে তো বাড়িতেই ফিরবে, তাই দাঁড়িয়ে আছি। তোমার অফিসেও গেছিলাম। তালাবন্ধ।"

"আমি আর নতুন কোনও খবর পাইনি স্যার। পেলে আপনাকে অবশ্যই জানাব।"

"আমি তোমায় নতুন খবর দিচ্ছি। অন্য একটা কেসে আবার তোমার নাম উঠে এসেছে। এখন এসেছি সেটার এনকোয়ারি করতেই।"

"কী কেস?" আমি তো অবাক।

"বিশ্বজিৎ দে নামে কাউকে চেনো?"

"বিশ্বজিৎ দে? না তো... মনে পড়ছে না। কে বলুন তো?"

"বড়বাজারে শাড়ির দোকানে কাজ করে। চেনো?"

"ওহহ, বিশ্বজিৎ? হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনি। চিনি মানে ও আমার কিছু কাজ করে দেয় আর কি।"

"কী ধরনের কাজ?"

"জানেনই তো স্যার, কীভাবে পেট চালাই। এক ক্লায়েন্টের বর তার

গোপন প্রেমিকাকে নিয়ে প্রায়ই ওর দোকানে আসে শুনেছি। তাই ওকে কিছু টাকা দিয়ে ফিট করেছিলাম ওদের দুজনের একসঙ্গে ভিডিও তোলার জন্য।"

"সে ভিডিও পেয়েছিলে?"

"কোথায় আর পেলাম? সেদিনই তো পুলিশ আমায় ধরল দেবাশিসদার কেসে। তারপর এমন ঘেঁটে গেছিলাম, ওই ব্যাপারটা মাথাতেই নেই।"

"আচ্ছা। তুমি বুঝি একটার বেশি দুটো কেস একসঙ্গে মাথায় রাখতে পারো না?"

আমি খোঁচাটা ধরতে পারলেও না বোঝার ভান করলাম।

"বিশ্বজিতের কী হয়েছে স্যার?"

"সেদিনের পর থেকে বিশ্বজিৎ নিখোঁজ।"

"সে কী!"

"পুলিশ যখন কাউকে কাজে লাগায় তখন তার সেফটির ব্যবস্থাও করে। তোমরা সাধারণ মানুষদের ব্যবহার করো, কিন্তু ভাবো না সে ধরা পড়লে কী হবে। এবার কী করব বলো। কল রেকর্ডে দেখাচ্ছে লাস্ট কল তোমার সঙ্গেই হয়েছিল।"

"পনেরো দিন ধরে যে নিখোঁজ, তার এতদিন পরে খোঁজখবর? আর তাও চন্দননগর পুলিশে?"

"ভালো প্রশ্ন। আগে দ্বিতীয়টার উত্তর দিই। বিশ্বজিতের বাড়ি চন্দননগরের বোড় পঞ্চাননতলায়। তাই কেস আমাদের কাছে এসেছে। আর প্রথম প্রশ্নের জবাব ঠিকঠাক এখনও পাইনি। বিশ্বজিতের বাবা নেই। মা পাগল। এক বন্ধু থাকে বিশ্বজিতের সঙ্গে। এতদিন সেই ওর মায়ের খেয়াল রেখেছিল। কিন্তু বিশ্বজিতের গায়েবের খবর এতদিন সে কেন পুলিশে জানায়নি তার কোনও সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি এখনও।"

"তাহলে পুলিশে রিপোর্ট করল কে?"

"ওদের বাড়ির সামনে একটা বইয়ের দোকান আছে। তার মালিক বিশ্বজিতের বন্ধু। একসঙ্গে আড্ডা দেয়। বিশ্বজিৎকে ফোনে পাচ্ছে না, বাড়িতেও ঢুকতে বেরোতে দেখছে না। সেই বন্ধুও কিছু বলতে পারছে না দেখে দোকানদার ছেলেটাই গতকাল পুলিশে জানিয়েছে।"

"বিশ্বজিতের ফোন ট্র্যাক করা যাচ্ছে না?"

"নাহ। সিম খোলা। এখন একমাত্র কোনও নেটওয়ার্ক এরিয়াতে এসে ফোনে ওয়াই-ফাই কানেক্ট করলেই ট্র্যাক করা যাবে। তাও তো করছে না। কোম্পানি থেকে কললিস্ট চেক করে দেখি লাস্ট কল তোমাকেই। দোকানদার

জানাল সেদিন একটু তাড়াতাড়িই দোকান থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়েছিল বিশ্বজিৎ। বলছিল শরীর খারাপ লাগছে। বেশ কবার চোখে মুখে জল ছিটিয়েওছিল। দেখে মনে হয়েছিল আচমকা কিছুতে একটা ভয় পেয়েছে। এমনকি সামনের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে চোরের মতো পালিয়েছিল। পরদিন থেকে আর দেখা নেই। একটা ফোন এসেছিল পরের দিন মালিকের কাছে। মোবাইল নম্বর থেকে। বিশ্বজিতের। সে বলে সে নাকি নতুন কাজ পেয়ে গেছে। আর এই কাজ করবে না। মালিক বলে পাওনা বুঝে নিতে। সেও বলে সময়মতো আসবে। ব্যস! সেই শেষ।"

"সেই নম্বরটা পেয়েছেন?"

"পেয়েছি।"

"ট্র্যাক করেছেন?"

"দরকার নেই। চেনা নম্বর।"

"কার?"

"তোমার। এই দ্যাখো", বলে অফিসার নিজের মোবাইলে একটা স্ক্রিনশট দেখালেন। সেখানে জ্বলজ্বল করছে আমার মোবাইল নম্বর।

আমার হতভম্ব অবস্থা দেখে হেসে ফেললেন অফিসার।

"আরে ভয় পেয়ো না। এটা ফেক নম্বর। কোনও পাইরেটেড অ্যাপ দিয়ে নম্বর জেনারেট করে কল করেছে। আমরা তোমার কললিস্ট চেক করেছি। তোমার নম্বর থেকে এমন কোনও ফোন যায়নি। কিন্তু মুশকিল হল কেউ তোমাকে ফাঁসাতে চাইছে। জড়াতে চাইছে। কেন?"

"সে তো আমিও বুঝতে পারছি না। শুধু আমি কেন, আপনিও তো আছেন। আচ্ছা, আমি একবার বিশ্বজিৎকে ফোন করে দেখব?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"করতে পারো। লাভ নেই বিশেষ। আমরা অনেকবার ট্রাই করেছি। কমিশনারেটে টিম বসে আছে। সিগন্যাল পেলেই ট্র্যাক করবে।"

আমি পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে এমনিই বিশ্বজিতের নম্বরটা ডায়াল করলাম। আমাকে আর অফিসারকে চমকে দিয়ে বিশ্বজিতের কলার টিউন বেজে উঠল, "ইয়ে দিল তনহা কিঁউ রহে!" বাজতে বাজতে থেমে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা হোয়াটসঅ্যাপ ঢুকল বিশ্বজিতের নম্বর থেকে। বাংলা অক্ষর। কিন্তু ভাষা আমার অজানা। লেখা "হামচুপামুহাফ।"

অফিসারকে দেখাতে উনিও আমার মতোই অবাক। এর মানে কী রে বাবা!!

"আবার ফোন করো তো", অফিসার বললেন।

করলাম। আবার ফোন বেজে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোন বেজে উঠল অফিসারের।

"হ্যাঁ হ্যাঁ। ট্র্যাক করতে পেরেছেন? বাহ। কোথায়? বিধান সরণি? আচ্ছা। আপনারা স্পেসিফিক লোকেশান জানান, আমি যাচ্ছি।" বলেই আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিও যাবে নাকি হে?"

"আপত্তি নেই। তাহলে বাইকটা এখানেই রেখে যাই?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের গাড়িতে চলো।"

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে মুখার্জি নিজে বসলেন। আমি পিছনে। সেই সেদিনের মতো। আমার কী মনে হল, খানিক গুগল খুলে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। অফিসার বলেই যাচ্ছিলেন, "কী মুশকিল বলো দেখি। বিধান সরণি কি আর একটুখানি জায়গা? আর ওই শব্দটারই বা মানে কী? তোমাকে আচমকা পাঠালই বা কেন?"

আমি ততক্ষণে একটা আলোর রেখা দেখতে পেয়েছি।

"স্যার, আমি বোধহয় জানি আমাদের কোথায় যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"১৩/১ বিধান সরণী। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উলটো দিকের বাড়ি।"

"কীভাবে বুঝলে?"

"বিশ্বজিতের পাঠানো মেসেজ। হামচুপামুহাফ।"

"মানে কী এর?"

"দেখুন স্যার, গুগলের এই আর্টিকেলটায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা লেখার উল্লেখ করে বলা হচ্ছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'সঞ্জীবনী সভা' স্থাপন। সভার বিবরণ জ্যোতিবাবুর বানানো এক সাংকেতিক ভাষায় লেখা হত। সেই সাংকেতিক ভাষায় সেই সভার নামটির উচ্চারণ ছিল 'হামচুপামুহাফ'। কলকাতার ঠনঠনিয়ায় এক পোড়ো বাড়িতে এই গুপ্ত সভা বসত। কিশোর রবীন্দ্রনাথও সভ্যদের একজন ছিলেন। এই সভা যখন বসত, টেবিলে একটি মড়ার খুলি রাখা থাকত। খুলিটির চোখের কোটরে বসানো হত দুটি মোমবাতি। খুলিটি মৃত ভারতবর্ষ ও মোমবাতি দুটি ছিল ভারতের প্রাণসঞ্চার ও জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে তোলার সংকেত! সভা আরম্ভ হত বেদমন্ত্র পাঠ করে।"

"স্ট্রেঞ্জ! এ তো পুরো ফ্রিম্যাসনদের সভার মতো! বাংলায় এমন সভার কথা আগে শুনিনি তো!"

"ফ্রিম্যাসন কারা?"

"ও বাবা! সে অনেক গল্প। দেবাশিসদার থেকে গল্প শুনতাম। আমাদের পার্ক স্ট্রিটেও এঁদের অফিস আছে। যাই হোক। আসল কথায় এসো। এ থেকে কী বোঝা গেল?"

"হ্যাঁ স্যার, সেই কথাতেই আসছি। এই বাড়িটার ঠিকানা কেউ কোনও দিন জানায়নি। এতটুকু জানা গেছে, সেটা ছিল এক পোড়োবাড়ি, উপর নিচ ভিতর সমস্তটা খালি ছিল। 'কলিকাতা দর্পণ' বইতে রাধারমণ মিত্র প্রমাণ করছেন, এই বাড়ি ছিল ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়ি। ১৮৮০ সালের পর থেকে এখানে লোক বাস করতে শুরু করে। আরও পরে এটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্যারাকবাড়ি হয়। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু থেকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সবাই এই বাড়িতে থেকে গেছেন।"

"সে বাড়ির এখন কী দশা?"

"আবার পোড়োবাড়ি হয়ে গেছে। নতুন ঠিকানা ১৩/১ বিধান সরণি। হেরিটেজ বিল্ডিং-এর তকমা নেই। যে-কোনো দিন ভেঙে দিয়ে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং উঠল বলে।"

মুখ দিয়ে চিকচিক করে একটা আওয়াজ করলেন অফিসার, "কিন্তু এই বাড়িতে বিশ্বজিৎ কী করছে? তার চেয়েও বড়ো কথা, একটা সামান্য কাপড়ের দোকানের কর্মচারী এতসব ইতিহাস ভূগোল জানল কীভাবে?"

"এক্ষুনি জেনে যাব স্যার। প্রায় এসেই গেছি।"

ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি পেরিয়ে গাড়ি এসে থামল বিরাট একটা পোড়ো বাড়ির সামনে। ড্রাইভার গাড়িতেই রইল। আমরা দুজন নামলাম। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। রাস্তার ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে। গেট বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। দোতলা বাড়ি। কিছু জানলায় এখনও কিছু খড়খড়ি আছে। দেওয়াল জায়গায় জায়গায় ভাঙা। চুন সুরকির পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে গেছে। ভিতরে জঙ্গল। প্রাচীর বেয়ে বট অশ্বত্থের চারা শিকড় চারিয়েছে। কর্পোরেশনের বুলডোজার না ভাঙলেও অবহেলাই একে একদিন মেরে ফেলবে নিশ্চিত। কিন্তু বিশ্বজিৎ কোথায়?

"আর-একবার ফোন করো তো", অফিসার বললেন।

"ফোন বেজে চলেছে। ধরছে না কেউ", বলতে না বলতেই বাড়ির ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল। যান্ত্রিক শব্দ। রিংটোনের। কোথাও একটা ফোন বাজছে। আমি কেটে দিতেই আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল।

অফিসার মুখার্জি আমার দিকে তাকালেন। দুজনেই এক কথাই ভাবছি।

"আবার করো।"

ফোন অন রেখেই রিংটোনের শব্দ অনুসরণ করে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। এটা আগে পোর্টিকো ছিল। ভেঙে পড়েছে। সেটা পেরিয়ে একটা বড়ো হলঘর মতো। তার এককোণে অপেক্ষাকৃত ছোটো একটা ঘর। হয়তো এখানেই বসত সেই সভা। এখন সেই ঘরের দিকেই আমরা যাচ্ছি। সেখান থেকেই মোবাইলের রিংটোনের আওয়াজ ভেসে আসছে। অফিসারের এক

হাতে হাই পাওয়ারের টর্চ। অন্য হাত কোমরের বেল্টে আটকানো সার্ভিস রিভলভারে। আগে থেকেই কেমন একটা লাগছিল আমার, সেটা আরও স্পষ্ট হচ্ছিল। একটা গন্ধ। পচা গন্ধ। পচা মাংসের। ওই পোড়োবাড়িতে কোনও হাওয়া ঢোকে না। তাই গন্ধটা থমকে আছে। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। আর তারপরই বিশ্বজিৎকে দেখতে পেলাম। ঘরের ঠিক

মাঝখানে শুয়ে আছে। গোটা দেহটা পচে ফুলে উঠেছে। চারিদিকে ডাঁশ মাছি উড়ছে ভনভন করে। পরনে একটুকরো সুতো নেই। ঠিক দেবাশিসদার মতো। পা দুটো দুপাশে ছড়িয়ে ত্রিভুজের দুটো বাহু তৈরি করেছে। দুই পায়ের ফাঁকে যে অঙ্গটা থাকার কথা সে জায়গাটাও কেউ নিপুণ হাতে কেটে নিয়েছে। বাঁ হাত পাশে ছড়িয়ে আছে। ডান হাত ভাঁজ করে বুকের উপরে রাখা, যেখানে হৃৎপিণ্ড থাকে। ঠিক তার নিচেই ছুরি দিয়ে চিরে কে যেন একটা ত্রিভুজ এঁকে তলায় লিখেছে, NO। অফিসারের টর্চের আলো গিয়ে পড়ল বিশ্বজিতের মুখে। যে জায়গায় চোখ থাকার কথা ছিল, সেই জায়গায় দুটো অন্ধকার গর্ত। মুখ হাঁ করা। কিন্তু মুখ থেকে কী যেন একটা বেরিয়ে আছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল। তাও একটু ঠাহর করতে বুঝলাম কে যেন বিশ্বজিতের কাটা অঙ্গটা জোর করে পুরে দিয়েছে ওরই হাঁ করা মুখে।

শৈলচরণ সান্যাল। দেবাশিস গুহর পর এবার বিশ্বজিৎ দে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ— রমণপাষ্টি

একটা সরু ঘামের ধারা নেমে আসতে শুরু করল তারিণীর কপাল থেকে, চিবুক বেয়ে। বাইরে গরম হাওয়া বইছে। টেবিলে রাখা জমানো মাখন গলে গলে পড়ছে পিরিচের ওপরে। কিন্তু তারিণীর ঘামের কারণ সেই গরম না। যে নাম আর কোনও দিন শুনবে বলে সে ভাবেনি, আজ আচমকা শুনে সে যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। সাহেব এই নাম জানলেন কী করে? সেই রাতে সেই ঘরে তো বাবু প্রসন্নকুমার আর তারিণী ছাড়া তৃতীয় কোনও মরমানুষ ছিল না!

ফ্রিম্যাসন সংঘের সঙ্গে তারিণীর যোগাযোগ ইদানীং একেবারেই কমে এসেছিল। বরং শৈলর যাতায়াত বেড়েছিল। শেষ যে সামান্য সুতোটুকু লেগেছিল, তাও বাবু প্রসন্নকুমার দত্তের জন্য। হাটখোলার দত্তবাড়ির এই বাবু বৃদ্ধ হয়েছেন। আগের মতো সময় দিতে পারতেন না। তার উপরে বহুমূত্র রোগ তাঁকে একেবারে কাবু করে ফেলেছিল। শেষের দিকে প্রায় শয্যাশায়ী থাকতেন। নাতি গোপালচন্দ্র ডাক্তার। সে সাধ্যমতো চেষ্টা চালাচ্ছিল তাঁকে সুস্থ রাখার।

তারিণীর বেশ মনে আছে সেই রাতের কথা। গত বছর বর্ষাকাল। সারা

দিনমান বৃষ্টিতে কলকাতা শহর যেন বড়ো একটা পুকুরের রূপ নিয়েছে। তারিণীর অফিসে জল ঢুকবে ঢুকবে। শৈল তখন সবে তারিণীর সঙ্গে এসে থাকতে শুরু করেছে। তবে সে রাতে শৈল ছিল না। কোথাও গেছিল। এই বৃষ্টিতে ফেরার সম্ভাবনা কম। তারিণী রাতে ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেয়ে শুরু পড়বে ভাবছে। এমন সময় দরজায় বেশ জোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ। দরজা খুলে দেখে এক দামি ওয়েলার দাঁড়িয়ে তার অফিসের সামনে। এ গাড়ি সে চেনে। কোচোয়ান জানাল বাবু প্রসন্নকুমারের শেষ অবস্থা। তিনি তারিণীকে তলব করেছেন। এ ডাক উপেক্ষা করা যায় না।

প্রসন্নকুমারের চাকর পথ দেখিয়ে বৈঠকখানা থেকে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে চলল। বিরাট বাড়ি। আগাগোড়া বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, গালচে, মখমল আর সাদা পাথরের সামগ্রীতে ভরা। তারিণীর চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। শোবার ঘরে খান দুই ইটের উপরে বসানো উঁচু খাট। ওঠার জন্য সামনে দুই ধাপ কাঠের সিঁড়ি। বাবু প্রসন্নকুমার গায়ে দামি আলোয়ান দিয়ে শুয়ে আছেন। চোখ দুটি বোজা। মাথার কাছে উঁচু জলচৌকিতে জলের গেলাস, নানা রঙের ওষুধের বোতল, পিকদানি আর পাট করা গামছা। বিছানার নিচে পিতলের বেডপ্যান ঢাকা দেওয়া। মাথার কাছে চিবুক অবধি ঘোমটা টেনে এক মহিলা পাখার বাতাস করছিলেন। তারিণীদের দেখেই শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চাকর প্রসন্নকুমারের কাছে গিয়ে কানে কানে কী যেন বলল। প্রসন্নকুমার চোখ মেললেন। বড়ো দুর্বল সেই দৃষ্টি। এদিক ওদিক চেয়ে যেন তারিণীকেই খোঁজার চেষ্টা করলেন। তারিণী পাশে এসে দাঁড়াল। তাঁকে দেখতে পেয়ে একটু হাসার চেষ্টা করলেন যেন। খুব ক্ষীণস্বরে বললেন, "এসো হে আমার চুঁচুড়ার ব্রাদার"।

চাকর বিছানা থেকে একটু দূরে একটা কাঠের চেয়ার এনে দিল। তারিণী বসতেই প্রসন্নকুমার হাত নেড়ে ঘরের সবাইকে বেরিয়ে যেতে বললেন। চাকরটাও বেরিয়ে গেলে প্রসন্নকুমারের তারিণীর দিকে ফিরে শুলেন, "খুব অসুবিধায় ফেললাম, তাই না? আমি জানি। কিন্তু আমার আর বেশি সময় নেই। এদিকে এই খবর এমনই যা না বলে মারা গেলে মরেও শান্তি পাব না।"

"কী হয়েছে আপনার?"

"দীনবন্ধু, কেশবচন্দ্র থেকে বঙ্কিমবাবু সবাই যে রোগে মারা গেছেন, সেই বহুমূত্র রোগের একেবারে চরম পর্যায় আমার দেহে। এই জীর্ণ দেহ এখন পরিত্যাগের সময় এসেছে। সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারি না।

ঘন ঘন শয্যাত্যাগ করি। জল খাই। শৌচাগারে যাই। ইদানীং মূত্রনালীতে বড়ো একটা স্ফোটক হয়েছে। বড়ো কষ্ট হে, বড়ো কষ্ট।"

তারিণী অপেক্ষায় ছিল কখন প্রসন্নবাবু কাজের কথায় আসেন। সে ছদ্ম মনোযোগ দেখিয়ে মাথা নেড়ে যাচ্ছিল।

"বঙ্কিমবাবু এককালে আমাদের সংঘের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।"

এটা তারিণীর কাছে নতুন খবর। সাহিত্যসম্রাট নিজে ফ্রিম্যাসনদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এ কথা ঘুণাক্ষরেও সে টের পায়নি। প্রসন্ন তার মুখ দেখে মনের ভাব বুঝলেন। "গুপ্ত সমিতির বৈশিষ্ট্যই হল তার অনেক কথাই গুপ্ত থাকে। সদস্যরাও সব জানে না। বঙ্কিমের প্রথম চাকরি সাব ডেপুটি হিসেবে ১৮৫৮ সালে। তখন থেকে ১৮৭৯ অবধি সব সরকারি রিপোর্টে তাঁর নামে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ১৮৭৯-এ অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিন তিনি হুগলীতে ছুটিতে ছিলেন। সেই সময়ই আমাদের সংঘ থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল।"

"কেন?"

"সরকারের উচ্চপদে আসীন ক্ষমতাশালী মানুষরা চিরকাল আমাদের কাজে আসেন। আমি নিজে বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে আমাদের আদর্শ বোঝাই, উদ্দেশ্য বোঝাই। বঙ্কিম আমাদের সদস্য হতেও রাজি হন। প্রায় সেই সময়ই তিনি আনন্দমঠ লিখছিলেন। তুমি আনন্দমঠ পড়েছ?"

তারিণী মাথা নেড়ে জানাল সে পড়েনি।

"ম্যাসনিক লজে প্রথমবার ঢোকার সময় তোমায় কী কী প্রশ্ন করা হয়েছিল মনে আছে?"

"আজ্ঞে আছে। তোমার উদ্দেশ্য কী? আলোকপ্রাপ্ত হওয়া। তোমার পণ কী? আমার জীবন। তুমি কী ত্যাগ করবে? আমার সর্বস্ব। এমন সব।"

"বাহ। এবার দ্যাখো আনন্দমঠের একেবারে শুরুতেই বঙ্কিমবাবু ঠিক এই কথাগুলোই লিখেছেন", বলে খাটের পাশে থেকে লাল মলাটের একটা বই তারিণীর হাতে তুলে দিলেন। তারিণীর চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। অবিকল সেই কথাগুলোই লেখা!

"এর পরেই বঙ্কিমের ভাগ্য বদলাতে শুরু করে। ১৮৮২ সালে বঙ্গদর্শনে এই লেখা প্রকাশ পেলে সরকারি রিপোর্টে তাঁর নামে বেশ খারাপ খারাপ কথাই লেখা হয়। এই রিপোর্ট আর কোনও দিন ভালো হয়নি। সারাজীবন ডেপুটি হয়েই থেকেছেন তিনি, তাও তৃতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণিতে। জীবনের একেবারে শেষে যখন তিনি স্বেচ্ছাবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন, তার পরেই তাঁর

রিপোর্ট ভালো হয় ও প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। আমাকে নিজে তিনি বলেছেন আনন্দমঠ তাঁর জীবনের অভিশাপ।"

"আপনি এই কথা বলতে আমায় ডেকেছেন?"

তারিণীর গলায় বোধহয় একটা বিরক্তির ছাপ টের পেয়েছিলেন প্রসন্নকুমার। বললেন, "এটা না বললে যে কারণে তোমায় ডাকা সেটা বুঝতে পারবে না। আপাতভাবে আমাদের সংঘের সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করলেও সংঘ তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। আমরা হাত ধরলে হাত ছাড়ি না। সংঘে ঢোকা সহজ। বেরোনো অসম্ভব, তা তুমি জানো। তবে জীবনের একেবারে শেষদিকে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন বেরোল। বঙ্কিমবাবুর নতুন সামাজিক উপন্যাস আসছে। নাম রমণপাষ্টি। একমাত্র আমিই বুঝলাম এই ডাক শুধু আমার জন্যেই।"

"কীভাবে?"

"পাষ্টি বোঝো? পাশা খেলার বোর্ড। আমাদের ম্যাসনিক স্কোয়ারকে মজা করে বঙ্কিম নাম দিয়েছিলেন রমণপাষ্টি। এ নাম আমি ছাড়া আর কেউ জানত না।"

তারিণী ম্যাসনিক স্কোয়ার জানে। একটা বর্গক্ষেত্রের মধ্যে নটা খোপ কেটে ১ থেকে ৯ এমনভাবে লেখা, যাতে যেদিক থেকেই যোগ করা হোক না কেন যোগফল পনেরো হয়। এই পনেরো হল ফ্রিম্যাসনদের স্বর্গীয় সংখ্যা।

"তারপর?"

"একদিন এক সন্ন্যাসী সেজে আমি গেলাম বঙ্কিমবাবুর বাড়ি। প্রথমে তো দারোয়ান ঢুকতেই দেবে না, আমি বাড়ির সামনের গলিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খানিক বাদেই নাতিদের নিয়ে বঙ্কিম বেরোলেন বিকেলের হাওয়া খেতে। আমায় দেখেই চিনতে পারলেন। সসম্মানে নিয়ে গেলেন নিজের শোবার ঘরে। তারপর এক অদ্ভুত তথ্য দিলেন।"

"কী তথ্য?"

"আমাদের সংঘের বিলাতে যে ভাগটি আছে তার মধ্যে নাকি একদল চরমপন্থীর আগমন হয়েছে। তারা আমাদের মতো যিশুর দেখানো শান্তির পথ ছেড়ে হিংসার রাস্তা ধরেছে। তাদের উদ্দেশ্য যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা দখল করা। আমাদের সংঘের মধ্যেই থেকে নিজেদের মতো এক উপসংঘ চালু করেছে তারা। রোমান প্যাগান আদর্শে দীক্ষিত এই উপসংঘ প্রচণ্ড নির্মম ও চরমপন্থায় বিশ্বাসী। কিন্তু তারা কারা, ঠিক কী করতে চায়, সব আমাদের অজানা। ব্রিটিশ পুলিশ এটুকু জানতে পেরেছে, তাদের মূল ঘাঁটি নাকি এখন
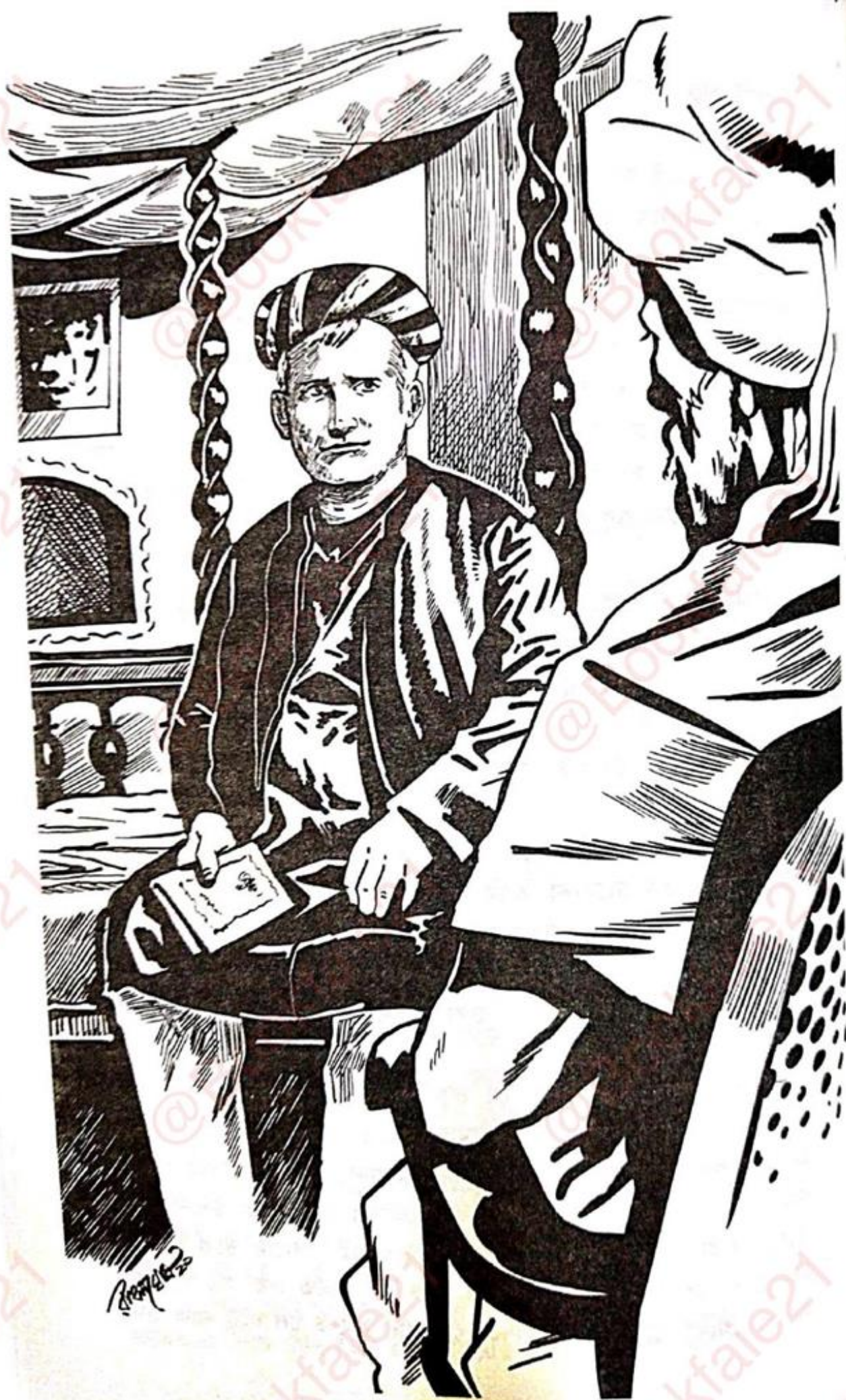
এই দেশে। একেবারে অশরীরীর মতো কাজ চালায় তারা। গুপ্ত সমিতির মধ্যে গুপ্ত সমিতি। বুঝতে পারছ?"

উত্তর না দিয়ে উপরে নিচে মাথা নাড়ল তারিণী। এতক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন প্রসন্নকুমার। হাত বাড়িয়ে জল চাইলেন। তারিণী গেলাস এগিয়ে দিতে এক ঢোঁক জল খেয়ে বললেন, "বেশি খেতে ভয় পাই। ঘন ঘন পেচ্ছাব পায়। যা বলছিলাম, পুলিশের কাছে মাত্র দুটো খবর আছে। তার একটা আবার অর্থহীন। বঙ্কিমবাবু কীভাবে জেনেছেন আমায় জানাননি। এক, এই উপসমিতির গোপন নাম জাবুলন। আর দুই, কোনও প্রেতাত্মা এদের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।"

"প্রেতাত্মা?"

"প্রেতাত্মা বলেননি অবশ্য। বলেছিলেন ভূত। সে তো একই হল।"

মাথা চুলকায় তারিণী। "কিন্তু এত বছর বাদে আমাকে এসব বলার মানে কী?"

"দ্যাখো তারিণী, ড্রিসকল সাহেবের কাছে তোমার প্রচুর সুখ্যাত আমি শুনেছি। আমি এটাও জানি, তুমি পাঁচকান করবে না। আমি এত বছর গোপনে এই জাবুলনদের খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার সেই স্বাস্থ্যও নেই। সত্যি বলতে কী, বুদ্ধিও নেই। তবে কিছু তো আঁচ পাই। বুঝতে পারছি সংঘের মধ্যেই এরা দারুণভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কিন্তু প্রকাশ্যে এদের নাম কেউ করে না। এদের মিটিং কোথায় হয় কেউ জানে না। তবে এটা বুঝেছি ভয়ংকর কিছু একটা করতে চলেছে এরা। আর সেটা খুব তাড়াতাড়ি। তেমন কিছু হলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। শুনেছি রমণপাষ্টিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করছে এরা। খোপের নয়টা সংখ্যা আসলে এদের গ্র্যান্ডমাস্টার, মাস্টার আর সাতজন সিক্রেট মাস্টারের। বড়ো কিছু করতে গেলে এই নয়জন একত্রে রমণপাষ্টির দান দেয়। যার নম্বর আসে তাকে নিজের জীবন দিয়ে খেলা শুরু করতে হয়। কয়েকবছর আগে নাকি এই খেলা শুরু হয়ে গেছে। খেলা শেষে কী হয় সেটাও কেউ জানে না। বঙ্কিমবাবু সরকারি আমলা, ওঁর কাছে এসবের খবর থাকত।"

"বঙ্কিমবাবুর সেই বই?"

"সে আর লেখা হল কোথায়? বিজ্ঞাপন প্রকাশের কিছুদিন পরে তো বহুমূত্রে মারাই গেলেন। তারিণী, একমাত্র তুমিই পারো এদের খুঁজে বার করতে।"

"আপনি পুলিশকে জানাচ্ছেন না কেন?

"কী জানাব? আমার হাতে কোনও প্রমাণ আছে? শুধু সন্দেহের বশে এভাবে কিছু করা যায় নাকি? আর..." বলে গলা খাদে নামিয়ে প্রসন্নকুমার বললেন, "পুলিশেও যে ওদের লোক লুকিয়ে নেই তার কী প্রমাণ? না হে। এই কাজ তোমাকেই করতে হবে। একা। গোপনে। ভয়ানক এক বিপদ ঘনিয়ে উঠছে। মুশকিল হল সেটা কী কিংবা কীভাবে আসছে সে বিষয়ে কিচ্ছু জানি না।"

সেই রাতে বাড়ি ফিরে অবধি কাউকে কিচ্ছু বলেনি তারিণী। প্রসন্নকুমার আর মাসখানেক বেঁচেছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অবধি অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি। তারিণী চেষ্টা করেছে খোঁজ নেবার। কিন্তু এ যেন অদৃশ্য কাচের তৈরি এক দেওয়াল। কোনও দিক থেকেই কোনও সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে এই গোটা ব্যাপারটা বৃদ্ধ প্রসন্নকুমারের মনের আজগুবি খেয়াল ভেবে প্রায় ভুলেই গেছিল তারিণী। আজ সাইগারসন সাহেবের মুখে নামটা শুনে তাই হকচকিয়ে উঠল।

সাইগারসন বুঝলেন এ নাম তারিণীর পরিচিত। তারিণীও কিছু লুকাল না। ঠিক যেমনটা হয়েছিল, তেমনিভাবে বলল সাইগারসনকে। আঙুলের ডগাগুলো এক করে, চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন সাহেব। হঠাৎ কেউ দেখলে ভাববে সাহেব হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। প্রিয়নাথ হতবাক। এসব নিয়ে তার কোনও ধারণাই ছিল না। তারিণীর বলা শেষ হল। ঘরে তিন-চারটে মৌমাছি কোথা থেকে ঢুকে পড়েছে। তার গুনগুন ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। সাইগারসন চুপচাপ তাদের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন। প্রথম কথা তারিণীই বলল, "সাহেব, সুদূর লন্ডন থেকে এই জাবুলনের খোঁজে আপনি এ দেশে এসেছেন। আপনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে কিছু বেশি জানেন। যদি একটু খোলসা করে বলতেন..."

সাইগারসন উত্তর না দিয়ে উঠে গিয়ে ডাইনিং টেবিলের একপাশে রাখা একতাড়া ছাপা কাগজ হাতে নিলেন। তাতে লাল হরফে লেখা, 'কনফিডেনশিয়াল'।

"এই তথ্য প্রকাশ পেলে মাননীয় ইংরেজ বাহাদুর অবধি বিপদে পড়তে পারেন। তবে আপনাদের ওপর আমার ভরসা আছে। আর তথ্য গোপন রাখলে একত্র তদন্ত সম্ভব না। দয়া করে পড়ে দেখুন।" বলে সাইগারসন কাগজের তাড়াটা প্রিয়নাথ আর তারিণীর মাঝে রেখে দিলেন। খুব আলগোছে। যেন কোনও শক্তিশালী বোমা। এক্ষুনি ফেটে যাবে।

(এই অংশটিতে ব্রিটিশ সরকারের গোপন সেবা বিভাগের তরফ থেকে যে গোপন নথি প্রস্তুত করা হয়েছিল তার প্রয়োজনীয় অংশ প্রায় অবিকল প্রকাশ করা হল। মূল নথিটি ইংরাজিতে লেখা। যদিও এখানে তার ভাষান্তর করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নথিটির উৎস বিশেষ কারণে গোপন রাখা হচ্ছে। পাঠকরা মার্জনা করবেন)

This Document is the property of Her Britannic Majesty's Government

Printed on November, 1895

CONFIDENTIAL

(On Her Majesty's Secret Service)

THE PAST AND PRESENT OF FREEMASONS IN BRITISH EMPIRE

Memorandum prepared by Mr. M. Holmes

বিষয়— ফ্রিম্যাসন

সদস্যরা মানুন বা নাই মানুন ফ্রিম্যাসন অবশ্যই এক গুপ্ত সমিতি, যার কিছুটা এঁরা প্রকাশ করেন আর অনেকটাই একান্ত গোপনীয়। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে প্রায় ১০০০০-এর কাছাকাছি ফ্রিম্যাসন আছেন, যাঁদের মধ্যে বড়োজোর ১০০০ জন নিজেদের ফ্রিম্যাসন বলে স্বীকার করেন। এই অদ্ভুত গুপ্তসমিতির সব সদস্যই আবশ্যিকভাবে পুরুষ। শুরুতে নৈতিকতা, আদর্শ, ভ্রাতৃত্ববোধের

আদলে গড়ে উঠলেও ধীরে ধীরে ম্যাসনিক লজগুলো নানা গোপন কাজকর্মের আস্তানা হয়ে উঠেছে। যদিও এঁরা দাবি করেন পৃথিবীর শুরুতে আদমের সময় থেকে এই ম্যাসনদের উৎপত্তি, কিন্তু আধুনিক ম্যাসনদের শুরু স্কটল্যান্ডে। এর আগে প্রাচীন রোম ও মিশরেও নাকি এঁরা ছিলেন। এঁদের শুরু হয়েছিল...

(এখানে এরপর চার পাতা জুড়ে ফ্রিম্যাসনদের উৎপত্তি, ইতিহাস ও ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূল কাহিনিতে অপ্রয়োজনীয়বোধে তা বর্জিত হল)

১৮৭৭ সালে আমাদের বিভাগ অদ্ভুত এক তথ্য আবিষ্কার করে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের প্রায় প্রতিটি স্তরের কর্মচারীর কেউ না কেউ (কখনও একাধিক কর্মচারী) সরাসরি বা গোপনে ফ্রিম্যাসনদের সঙ্গে যুক্ত। শুধু তাই নয়, তারা ফ্রিম্যাসনদের থেকে নানা উৎকোচ গ্রহণ করে যে-কোনোরকম পাপকাজ করতেও পিছপা হয় না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এই ধরনের দুর্নীতির শুরু করেন ইন্সপেকটর জন মেকলিজন নামে এক পুলিশ অফিসার। তিনি নিজে ম্যাসনিক লজের সদস্যই ছিলেন না, তখনকার বেশ কিছু বিখ্যাত ও কুখ্যাত মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। বিখ্যাতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসন, বেডলামের চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক এলি হেনকি (জুনিয়র), অভিনেতা হেনরি আরভিং প্রভৃতি। মেকলিজনের আমলে ইয়ার্ডের সেরা সব গোয়েন্দা— জর্জ ক্লার্ক, উইলিয়াম পামার, নাথানিয়েল ড্রুস্কভিচ— সবাই গোপনে ফ্রিম্যাসন ছিলেন বা তাঁদের সাহায্য করতেন। মেকলিজন, ক্লার্ক আর পামার মিলে বড়ো কিছু এক ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত করেন। তার আভাস পেয়েই সরকার তাঁদের বরখাস্ত করেছিলেন। এলি হেনকিকে বেডলামের ডিন পদ থেকে বরখাস্ত করে সাধারণ চিকিৎসকের পদে আসীন করা হয়। তিনি ফ্রিম্যাসনদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে বেডলামেই ছাত্র পড়ানোতে মন দেন। স্টিভেনসন ও আরভিং-এর ওপরেও নজর রেখে দেখা হয়েছে। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। গতবছর স্টিভেনসনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। গত বছর ৩ ডিসেম্বর বিকেলে তাঁর বাড়িতে এক অপরিচিত অতিথি দেখা করতে আসেন। রাতে ডিনারের সময় ওয়াইনের বোতল খুলতে গিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, "এই বোতলে কী আছে?" এক ঢোক খেয়েই চিৎকার করে ওঠেন, "আমায় কি অন্যরকম লাগছে?" আর তারপরেই চেয়ারে ঢলে পড়েন। এই মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটিত হয়নি, কারণ মদ পরীক্ষা করে ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা কিছুই পাননি। শুধু তাঁরাই নন, একজন বেসরকারি গোয়েন্দা (নাম উহ্য রাখা হল) সেই মদ পরীক্ষা করে জানিয়েছেন কোনও চেনা রাসায়নিকের অস্তিত্ব নেই তাতে।

উইলিয়াম পামার আমাদের গোপন সেবা বিভাগের চোখ এড়িয়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে যান এবং হুগলীতে আশ্রয় নেন। ব্রিটিশরা ভারতে বাণিজ্য স্থাপনের অনেক আগেই ওলন্দাজরা তাদের ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ওই দেশে বাণিজ্য করত। তারা হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ডাচদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ফ্রিম্যাসনদের সদস্য। বিশেষ করে তাদের গভর্নর জি ভার্নেৎ হুগলীর ওলন্দাজ ও চন্দননগরের ফরাসিদের নিয়ে বৃহত্তর ফ্রিম্যাসন সংঘ গঠন করেন। ১৭৬৩ সালে তিনিই ওলন্দাজদের গির্জাটি সম্পূর্ণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সংঘ ছিল একেবারেই অহিংস ও ভ্রাতৃত্বভাবাপন্ন। ধীরে ধীরে বেশ কিছু ইংরেজ ব্যক্তিও ওলন্দাজদের সংস্পর্শে এসে এই সংঘের সদস্য হন। তাঁদের মধ্যে ইংরেজ আইনজ্ঞ উইলিয়াম হিকিও ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল চুঁচুড়ায় অবস্থান করেছিলেন। আর যেসব ইংরেজ অভিজাতরা...

(এখানে একটি লম্বা তালিকা আছে। কোন কোন ইংরেজ রাজপুরুষ চুঁচুড়ার ওলন্দাজ ফ্রিম্যাসনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তাঁদের নাম ও বর্ণনা সহ)

উপবিষয়— জাবুলন

১৮৮৬ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের বিভাগে একটি গোপন সূত্রে খবর আসে যে ইংল্যান্ডের ফ্রিম্যাসনদের মধ্যে নতুন একটি শাখা মাথা চাড়া দিয়েছে। শাখাটি এতই সতর্ক যে ফ্রিম্যাসনদের বেশিরভাগই এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত নন। জাবুলন শব্দটির অর্থ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য জানা গেছে। কারও মতে ইনিই প্রথম সলোমনের মন্দির থেকে তাঁদের উপাস্য দেবতা জিহোবার বাণী উদ্ধার করেন। কারও মতে ইনি স্বয়ং জিহোবা। তবে এরা অন্য ফ্রিম্যাসনদের মতো নিরীহ বা শুধু জ্ঞানচর্চা কিংবা সৌভ্রাতৃত্বে আগ্রহী নয়। এদের লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। মতের দিক থেকেও বাকি ফ্রিম্যাসনদের ঔদার্য এদের মধ্যে নেই। এদের উদ্দেশ্য একটাই। সারা বিশ্বে জাবুলনদের আধিপত্য স্থাপন করা।

ফ্রিম্যাসনদের এই শাখাটি দলের অভ্যন্তরে ১৮৮০ নাগাদ প্রথম মাথা চাড়া দেয়। কিন্তু তাদের বিশেষ সমর্থক ছিল না। ১৮৮৫ সালে এমন কিছু একটা ঘটে যার ফলে জাবুলন গোষ্ঠী পালে হাওয়া পায়। দলের মধ্যে, এমনকি দলের বাইরের অনেকেই তাদের এই চরমপন্থী আদর্শ সমর্থন করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে লন্ডন শহরের বিখ্যাত মানুষরাও ছিলেন। কিন্তু এই গোষ্ঠীর গোপনীয়তা এতই বেশি যে যখনই আমাদের বিভাগের থেকে জাবুলন বিষয়ে কোনও খোঁজ করার চেষ্টা হয়েছে, প্রতি ক্ষেত্রে তদন্তের ফলস্বরূপ কেউ না কেউ খুন

হয়েছেন। জাবুলনদের খুনের পদ্ধতি মধ্যযুগীয়। তারা যাকে অপরাধী মনে করে তার সারা শরীর ধারালো অস্ত্র দিয়ে ফালাফালা করে কেটে পুরুষ হলে তাঁর যৌনাঙ্গটি ছেদ করে দেয়, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে তাঁর গর্ভাশয়টি দেহের বাইরে এনে কেটে পাশে রেখে দেয়। আদিম ম্যাসনিক আচরণে সর্বোচ্চ শাস্তির প্রতিবিধান এমনই। কিন্তু আজ অবধি কোনও আধুনিক ম্যাসন এই পদ্ধতি অনুসরণ না করলেও জাবুলন গোষ্ঠী আবার এই জঘন্য আচরণকে ফিরিয়ে আনতে চলেছে।

উপ-উপবিষয়— জাবুলনদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের পদক্ষেপ

পোর্লক ছদ্মনামধারী এক ব্যক্তির থেকে পাওয়া চিঠিতে প্রথম জানা যায় লন্ডনে এই জাবুলনদের নানারকম শয়তানি পরামর্শ দিচ্ছেন সেনাবাহিনীর এক অধ্যক্ষ। নাম প্রফেসর জেমস মরিয়ার্টি। ১৮৮৮ সালের শরতে হোয়াইটচ্যাপেলের পাঁচজন মহিলা দেহোপজীবিনীর কাছে এক গোপন তথ্য আসে। আমাদের বিশ্বাস সেই তথ্যে সরাসরি ইংরেজ সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের বিভাগ থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের আগেই নৃশংসভাবে তাঁদের খুন করে এই গোষ্ঠী। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা ১৮৮৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর লন্ডনের সেন্ট্রাল এজেন্সিতে খুনের দায় নিয়ে একটা চিঠিও পাঠিয়েছিল। তলায় সই ছিল— জ্যাক দ্য রিপার। কিন্তু আমাদের স্থির বিশ্বাস, এই রিপার কোনও ব্যক্তি নয়, দল। খুনের মোডাস অপারেন্ডি অনেকটা এক হলেও একেবারে এক নয়। একাধিক মানুষের দ্বারা খুনগুলো হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা লন্ডনের সেরা কনসালটিং ডিটেকটিভের পরামর্শ নিয়েছি। তিনি এবং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেকটর লেস্ট্রেড ও টোবিয়াস গ্রেগসন একই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এই সবকিছুর পিছনে মাথা যে প্রফেসর, তাঁকে আইনি পথে ধরাছোঁয়া যাচ্ছিল না। আইনি পথে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব না দেখে আমরা এক বেসরকারি গোয়েন্দার সাহায্য নিই। তিনি মরিয়ার্টিকে ভুয়ো চিঠি লিখে রাইখেনবার্গ জলপ্রপাতের ধারে নিয়ে যান।

মরিয়ার্টি সমস্যা সমাধান হলে আমরা ভেবেছিলাম জাবুলনরা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তখনই পোর্লকের থেকে আবার খবর আসে বেডলাম হাসপাতালের কিছু ডাক্তার তলায় তলায় জাবুলনদের সদস্য হয়েছেন। চিকিৎসক, বিশেষ করে শল্যচিকিৎসকরা যে এই দলে থাকতে পারে সে সন্দেহ আমাদের হোয়াইটচ্যাপেল খুনের সময় থেকেই ছিল। এত নিপুণভাবে

মানবদেহ অন্য কেউ কাটাছেঁড়া করতে পারে না। এই বেডলামের চিকিৎসক প্রাক্তন ফ্রিম্যাসন এলি হেনকি (জুনিয়র)-এর ছাত্র রিচার্ড হ্যালিডে ভারতে পালিয়ে আসা বৃদ্ধ উইলিয়াম পামারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ১৮৯২ সালে হ্যালিডে আর তার সৎভাই ম্যাজিশিয়ান হ্যারি জনসন ভারতে যাত্রা করলে আমরা এক বিশ্বস্ত গোয়েন্দাকে ভারতে পাঠাই ও মহারানির কর্মচারীদের সাহায্য নিয়ে হ্যালিডেকে নিরস্ত করি।

হ্যালিডে ও জনসনের মৃত্যুর পরে প্রায় তিন বছর জাবুলনদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমরা ভেবেছিলাম এই গোষ্ঠী অন্য গোপন সমিতির মতো শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ইদানীং ভারতে আমাদের গুপ্তচর বিভাগ জানিয়েছে জাবুলনরা নাকি ভয়ানক কোনও এক পরিকল্পনা করছে। এদের মাথা কে, কারাই বা এর মদত দিচ্ছে, এই বিষয়ে সঠিক কিছুই জানা যাচ্ছে না। তবে একটা শব্দ বাতাসে ঘুরছে, 'অন্তিম সমাধান', 'ফাইনাল সলিউশান'। সেটার প্রকৃতি কী, বা কেমন করে সেটা করা যাবে, সে বিষয়েও আমাদের বিভাগ সম্পূর্ণ অন্ধকারে। ইদানীং ভারতবর্ষে কিছু নেটিভ বিপ্লবী গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়েছে। তারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে। জাবুলনদের সঙ্গে এদের যোগাযোগের সম্ভাবনাকেও আমরা খতিয়ে দেখছি।

ইদানীং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আচমকা, অযাচিত দাঙ্গার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। তবে এবার জাবুলনের লক্ষ্য আরও বড়ো। আরও নৃশংস। আমাদের বিভাগের বিশ্বাস এবারের লক্ষ্য "গণহত্যা, মাস মার্ডার।" সেটাই এরা কীভাবে করতে চলেছে, শেষ সমাধানের সঠিক মানেই বা কী, ইত্যাদি সরেজমিন তদন্ত সরকারি স্তরে করায় বিভিন্ন অসুবিধা হতে পারে। আমি তাই স্বয়ং মহারানিকে অনুরোধ করছি গতবার আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য যে বেসরকারি গোয়েন্দাটিকে পাঠানো হয়েছিল, তাঁকেই আবার ভারতে পাঠানো হোক। প্রয়োজনে নিজের হাতে আইন তুলে নেবার ক্ষমতাও যেন তাঁকে প্রদান করা হয়।

এই রিপোর্ট এখানেই শেষ হল।

আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য
মাইক্রফট হোমস,
সেক্রেটারি, ডায়োজেনিস ক্লাব।

মধ্যখণ্ড— সংযোগ

গণপতির কথা

১।

গণপতির খুব ভয় করছে। জীবনে প্রথমবার। শিরশিরে একটা অনুভূতি মেরুদণ্ড বেয়ে চারিয়ে যাচ্ছে সারা দেহে। অবশ করে দিচ্ছে গণপতির সমগ্র চৈতন্যকে। যে ডাকের ভয় সে এতদিন সকাল সন্ধে করছিল, অবশেষে সেই ডাক এসেছে। সে জানে এই ডাকে সাড়া দিতেই হবে। ভাবত বছর চারেক আগে যা ঘটেছে তার সবই এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। কিন্তু অন্ধকার অমানিশার মতো, ভয়াবহ প্রেতের মতো নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে আবার তা ফিরে এসেছে। ঠিক চল্লিশ মাস পরে। যেমনটা কথা ছিল। তার হাতে ধরে থাকা পাতলা রঙিন কাগজে যা লেখা আছে সে জিনিসের মর্ম উদ্ধার করা সাধারণের কর্ম না। সে জিনিস সাধারণের জন্যও না। কিন্তু গণপতি জানে রমণপাষ্টির যে খেলা চল্লিশ মাস আগে শুরু হয়েছিল, এখন তা একেবারে শেষ চরণে এসে গেছে নিশ্চয়ই। নইলে এই ডাক আসত না। তার আর কিচ্ছু করার নেই। যে মিথ্যাকে এতকাল মনের গহনে চাপা দিয়ে রেখে ভেবেছিল চিরতরে শেষ করে দিতে পেরেছে, তা যেন কোন অদ্ভুত জাদুবলে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। পিন্ডারী বাবার সহকারী সেই অদ্ভুতদর্শন ছেলেটার মতো বড়লাটের মৃত ভাই আবার কবর থেকে জেগে উঠেছে। যাকে প্রথমবার সে দেখেছিল ছোট্ট প্রায়ান্ধকার এক ঘরে, মোমবাতির আবছা আলোতে। আর শেষবার নিজের হাতে তার ছিন্নভিন্ন দেহ শুইয়ে দিয়েছিল চিনাপট্টিতে এক অন্ধকার ল্যাম্পপোস্টের তলায়...

লালমোহন মল্লিকের বাড়ির বাইরে এক ঘরে গণপতির থাকার ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা। এই পাঁচদিন সেখানে থেকেই জাদু দেখানোর কথা। ছোট্ট ঘরখানি। একখানি খাটিয়া আর আলনা ছাড়া আর বিশেষ আসবাব নেই। সেই

খাটিয়ার ওপরেই একদিকে কাত করে রাখা ডোয়ার্কিনের বেলো হারমোনিয়াম। মন ভালো থাকলে গণপতি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরে। বেশিরভাগ গানই মজার গান। তবে সবসময় গায় না। ইদানীং হাইকোর্টের উকিল চন্দ্রমোহন সেনের বড়ো ছেলে হীরালালের সঙ্গে গণপতির ভাব হয়েছে। সে এলেই আবদার করে গান শোনানোর। বয়সে ছোটো হীরালালের বায়না ফেলতে পারে না গণপতি। হীরালালের সবচেয়ে প্রিয় দেশলাইয়ের গান। কয়েক বছর হল বিদেশ থেকে এ জিনিস আমদানি হয়ে নেটিভদের মন জয় করেছে। দরাজ গলায় গণপতি গায়—

নমামি গন্ধকগন্ধ মুণ্ডটি গোলালো,
সর্ব্বজাতি প্রিয়দেব গৃহ করো আলো।
নিদ্রিতের গুপ্তচর পাচিকার প্রাণ,
লম্বাদাড়ি কাবুলির শিরে যার স্থান।

শুধু হীরালাল কেন, গণপতির গান শুনতে ভিড় জমায় চাকর সহিসরাও। গানের মাঝে মাঝে মজার মজার গল্প বলে গণপতি। কিছু তার নিজের চোখে দেখা। কিছু লোকমুখে শোনা। কিন্তু গল্প বলার ভঙ্গিটি বড্ড মধুর। সে আসর জমিয়ে বসলে কারও সাধ্য নেই সেখান থেকে ওঠে। গান করতে করতে একটা মজার ম্যাজিক দেখায় গণপতি। সবাই দ্যাখে তার মুখ বন্ধ। কিন্তু গান চলছে আগের মতোই। সবার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায়। আওয়াজ আসছে কোথা থেকে? জিজ্ঞেস করলে গণপতি উত্তর দেয় না। রহস্য করে হাসে। তার লক্ষ্মীট্যারা চোখে অদ্ভুত এক কৌতুক তিরতির করে কাঁপে। ঠোঁট না নেড়ে কথা বলার এই কৌশল তাকে শিখিয়েছিলেন বৈদ্যনাথধামের পিন্ডারী বাবা। সেও এক অদ্ভুত কাহিনি।

বাড়ি থেকে পালিয়েছিল গণপতি। তখন সে ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র। স্কুলফেরতা বাড়ি আসার পথে দ্যাখে পথের ধারে একজায়গায় বেজায় ভিড়। লাল চেলি পরা জটাধারী এক সাধু রাস্তার ধারে কাপড় পেতে নানা অদ্ভুত জিনিস দেখাচ্ছেন। ছোটো থেকেই লেখাপড়ার চাইতে এসবে গণপতির আগ্রহ বেশি। সেও জুটে গেল দঙ্গলে।

সাধুর সঙ্গে অল্পবয়সি, বছর ষোলো-সতেরোর এক ছেলে। কুচকুচে কালো গায়ের রং। সামনের দাঁতদুটো একটু উঁচু। সাধু হিন্দিতে কথা বলছে, সেও উত্তর দিচ্ছে হিন্দিতে।

— বেটা তাকত হ্যায়?

—হ্যায়

—হিম্মত হ্যায়

—হ্যায়

—খেল কো জানতে হো

—হ্যাঁ

—তব দিখাও খেল।

বলেই বাবা পাশে খুঁড়ে রাখা এক গর্তে ছেলেটাকে পুঁতে, মাটি চাপা দিয়ে, পা দিয়ে বেশ চেপেচুপে শক্ত করে তার উপরে কিছু তুলসীর বীজ ছড়িয়ে দিয়ে মন্ত্র পড়ে জানালেন এবার এক ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে গাছ গজাবে। তারপর চলল আরও সব আজব কিসিমের জাদু। মরা মাছকে জ্যান্ত করা, মুখ থেকে বিদ্যুতের মতো আলো বার করা, হাতের উপরে জ্বলন্ত অঙ্গার রেখে হোম করা, জলের মধ্যে আগুন জ্বালানো। অবশেষে সাধু জানালেন এবার তিনি তাঁর ওই সঙ্গী ছেলেটাকে ডাকবেন। ছেলেটার আত্মা কবরের মধ্যে থেকে জবাব দেবে। সন্ধ্যা হয় হয়। আত্মার নাম শুনে সবাই আরও একটু ঘন হয়ে দাঁড়াল। সাধুবাবা সকলকে বললেন, "আপনারা কেউ বাত করবেন না।" তারপর তিনি খুব জোরে লখনকে ডাকলেন, "আরে এ লাখান"

যেন অনেক দূর থেকে আওয়াজ এল, "বোলিয়ে জি পিন্ডারী বাবা"

সবাই অবাক হয়ে দেখল বাবাজি হাসি হাসি মুখে বসে আছেন। উত্তর আসছে যেন আকাশ থেকে। খানিক কথাবার্তা চলার পর বাবাজি আর-এক কীর্তি করলেন। একটা লম্বা তলোয়ার নিয়ে সোজা মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। তলোয়ার বাঁটসুদ্ধ ধীরে ধীরে ঢুকে গেল পেটের ভিতরে। সেই শূন্য থেকে ভূতের আওয়াজ বলে উঠল, "আপলোগ সামনে যা কর ইস তলোয়ার কো আহসাস কিজিয়ে।" কেউ যায় না। সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। সাধুও হাঁ করে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে বসে আছেন। দেহ স্থির। নিশ্চল। যেন পাথরের মূর্তি। পেটের কাছে তলোয়ারের ডগাটা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট। কিন্তু সেটা হাতে ধরার সাহস কারও নেই। গণপতির কী যেন হয়ে গেল। গুটিগুটি পায়ে পেটের কাছে উঁচিয়ে থাকা তলোয়ার স্পর্শ করতেই পিন্ডারী বাবা চিৎকার করে বলে উঠলেন, "সাব্বাস বেটা।" সবার সঙ্গে গণপতিও অবাক হয়ে দেখল কী অদ্ভুত এক জাদুমন্ত্রবলে গোটা তলোয়ারটা বাইরে বেরিয়ে বাবার হাতে চলে এসেছে এক মুহূর্তে। তিনি গণপতির দিকে চেয়ে হাসছেন। সবাই বিস্ময়ে তালি দিতেও ভুলে গেছে। অবাক হবার তখনও কিছু বাকি। সাধু দেখালেন পাশের মাটিতে

এর মধ্যেই গজিয়ে গেছে প্রচুর সবুজ তুলসীচারা। হাওয়ায় লকলক করছে। বাবা এক-একটি করে চারা সবার হাতে তুলে দিলেন। তবে বিনে পয়সায় না। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এই দান নাকি ঠাকুরের ভোগে লাগবে। দেখতে দেখতে চারা শেষ। সবাই চারাগুলো মাথায় ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ছেলেটার কী হল? যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে মাটি খুঁড়ে ছেলেটাকে বার করে আনলেন পিন্ডারী বাবা। সেও নির্বিকার মুখে সব সরঞ্জাম গুটিয়ে সবার কাছে হাত পাততে লাগল। কেউ পয়সা দিল। কেউ দিল না। এর আগেও অনেক বাবাজি আর মাদারির খেলা দেখেছে গণপতি। কিন্তু এমনটা এই প্রথম। সে অপেক্ষা করতে লাগল কখন ভিড় হালকা হয়। হতেই সোজা বাবাজির পা জড়িয়ে ধরল। সে বাবাজির চেলা হতে চায়। সেও হবে আর বাবাজিও করবেন না। বললেন, "তু বড়া ঘর কা লেড়কা আছিস বেটা। এ খেল বহুত মুশকিল কা খেল আছে। ইন্দরজি নে ইস জাল কো বানায়া থা। ফির ইস খেল কো দিখাতে থে রাজা ভোজ অউর রানি ভানুমতী। তেরা কেয়া খেয়াল হ্যায় জো তু দো দিন মে ইসকো শিখ যায়েগা? ঘর যা। ইস কে লিয়ে সবকিছু ছোড়না পড়তা হ্যায়। তুঝসে না হো পায়েগা বেটা..."

জেদ চেপে গেছিল গণপতির মনে। এক সপ্তাহের মধ্যেই বাড়ি ছাড়ল সে। সঙ্গে বন্ধু মণীন্দ্রনাথ লাহা। গণপতি তাকে ডাকে প্যাদনা বলে। পিন্ডারী বাবা আর তাঁর সঙ্গী সেই ছোকরা সেদিনের পর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। অনেক খুঁজেও গণপতি তাঁদের সন্ধান পেল না। শেষে কিছু মাদারির সঙ্গী হয়ে কয়েকরকম খেলা রপ্ত করল দুজনে। নেহাত মামুলি খেলা। পেট চলে না তাতে। প্যাদনা হাল ছেড়ে দিল। ঠিক করল জাদুকর যখন হওয়া হল না, সাধুই হয়ে যাবে। কিন্তু বাড়ি ফিরবে না। প্রথমেই গেল তারাপীঠ। সেখানে সাধক বামাখ্যাপা তাকে প্রায় দূর দূর করেই তাড়িয়ে দিলেন। স্রোতে কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে গণপতি পৌঁছাল বৈদ্যনাথধাম, আর সেখানেই একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে তার ভাগ্য বদলে গেল চিরকালের মতো।

গঙ্গার ঘাটে বসে জাদু দেখাচ্ছিল একদিন। এভাবেই পেট চালাতে হয় এখন। আপাত সহজ জাদু, কিন্তু যারা দ্যাখে চমকে যায়। পিন্ডারী বাবাও দেখিয়েছিলেন। মুখ থেকে আগুনের হলকা বার করা। এই তামাসা দেখাবার আগে মুখে কিছুটা আকরকোরা বচ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চিবাতে হয়। সেই চিবানো রস মুখের সব জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাখিয়ে নিলে আগুনে মুখের কোনও ক্ষতি হয় না। মাদারি এমনটাই শিখিয়েছিল। সেদিন জাদু শুরু করতেই

আচমকা পেটের ডানদিকে একটা ব্যথা শুরু হল। প্রথমে গা করেনি গণপতি। ধীরে ধীরে ব্যথা বাড়তে লাগল। যেন গরম লোহার একটা শিক কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে পেটে। ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। মুখে আগুনজ্বলা নারকেলের লুটি ঢোকাতেই গণপতি টের পেল ভয়ানক কোনও ভুল হয়েছে। আগুনের তাপে জ্বলে যাচ্ছে মুখ। আগুনের শিখার বদলে গলগল করে একগাদা বমি করে ফেলল গণপতি। চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা সরে গেল ঘেন্নায়। গণপতির মনে হল সে এবার মারা যাবে। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার ঠিক আগে কেউ তাকে ধরে নিল। বড্ড চেনা একটা মুখ। কুচকুচে কালো চেহারা। সামনের দাঁতদুটো উঁচুমতন। গণপতির মনে হল স্বয়ং দেবদূত এসেছে তাকে বাঁচাতে। কোনও দিন ভাবতেও পারেনি এই মুখ একদিন চরম অভিশাপের মতো তাকে তাড়া করে বেড়াবে ক্রমাগত। এখন গণপতি তার নাম জানে।

লখন।

২।

টানা চারদিন জ্বরে ছটফট করেছিল গণপতি। মুখ পুড়ে খাক। কিচ্ছু খেতে পারছে না। পিন্ডারী বাবা পরম যত্নে কর্পূরের সঙ্গে নানা জড়িবুটি মিশিয়ে গণপতির মুখে প্রলেপ লাগিয়ে দিতেন। দিনে তিনবার করে খাইয়ে দিতেন গলা সুজি। ঠিক হতে প্রায় দিন দশেক লাগল। বাবা সরাসরি গণপতিকে প্রশ্ন করলেন, সে কেন তাঁর পিছু নিয়েছে? সত্যি কথাই বলল গণপতি। সে জাদুকর হতে চায়। শিষ্য হতে চায় পিন্ডারী বাবার। কিন্তু পিন্ডারী বাবা শিষ্য নেন না। যদি কিছু শেখার হয়, গণপতিকে বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকেই শিখতে হবে। কিন্তু লখন? লখনের কথা উঠলেই বাবা কথা ঘুরিয়ে নেন। একদিন শুধু ভুলে বলে ফেলেছেন, "ও কোই নর নেহি হ্যায় বেটা। ও পাক্কা যমরাজ আছে। উসকে সাথ তেরা কেয়া?" অনেক প্রশ্ন করেও এর বেশি কিছু জানতে পারেনি গণপতি। বাবা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। লখনের হাবভাবও খানিক অদ্ভুত। সেও বাবার শিষ্য, কিন্তু বাবার আজ্ঞাবহ না। সে নিজের ইচ্ছেমতো চলে। মাঝে মাঝে কোথায় চলে যায় কে জানে? তিন-চার দিন ফেরে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করলেও বাবা উত্তর দেন না। লখনকে আজ অবধি একটা কথা বলতে শোনেনি গণপতি। যে কেউ ভাববে ও বুঝি বোবা।

ঘুম থেকে কাকভোরে উঠে গণপতিকে বাবার জন্য স্নানের জল নিয়ে আসতে হয়। সেই জল গরম করতে হয় কাঠকুটো জ্বেলে। বৈদ্যনাথধাম থেকে

তারা তখন নেমে এসেছে হরিদ্বারে। হর-কি-পৌরি ঘাটের ব্রহ্মকুণ্ডের পাশেই এক মন্দিরের ধারে তাদের আস্তানা। বাবার বয়স হয়েছে। সরাসরি গঙ্গায় নামেন না। স্নান সেরে কিছু ফলাহার করতে না করতে ঘাটে লোকজন জমতে শুরু করে। গণপতিরাও নিজেদের কাজে লেগে যায়। লোকে বলে সমুদ্রমন্থনের সময় গরুড় যখন অমৃতভাণ্ড নিয়ে যাচ্ছিল তারই এক ফোঁটা এই ঘাটে চুঁইয়ে পড়ে। এই ঘাট তাই বড়ো পবিত্র। আর এখানে আসা মানুষরাও আসেন সবকিছু বিশ্বাস করতে, মেনে নিতে। বাবা সেই সুযোগই নেন। ঘাটের পাশেই ত্রিশূল পুঁতে উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়তে থাকেন। ভিড় জমে যায় তাঁর চারপাশে। তখন শুরু হয় আসল খেলা।

দর্শকদের চোখের সামনে পাত্রের গঙ্গার জল রং বদলায়, কাঠের গোলা বাবাজির কথামতো গড়িয়ে গড়িয়ে এদিক ওদিক যায়, লম্বা সাদা পালক বাক্সের মধ্যে ঢুকেই হয়ে যায় ছটফটে একটা গোলা পায়রা। দর্শকদের অবাক ভাব মিটতে না মিটতে গণপতি বাবার সামনে এনে দেয় জ্বলন্ত কাঠকয়লা ভরা একটা লোহার কড়াই। সবার সামনে, যেন সুমিষ্ট কোনও ফল, এইভাবে বাবাজি একের পর এক সেই কয়লা খেয়ে চলেন। দুই হাতের করতলে তুলে নেন জ্বলন্ত দুই আংরা। তারপর হা হা করে হাসতে হাসতে সেগুলো নিয়েই জাগলিং দেখিয়ে চলেন, যেন নির্দোষ দুখানি আপেল।

গণপতি এই খেলার কায়দা শিখে নিয়েছে। ঘাটের পশ্চিম পাড়ে এক আঠালো গাছ আছে। এমন গাছ আগে কোনও দিন দেখেনি সে। এখানকার লোকেরা সে গাছের কাছে ঘেঁষে না। বাবার কাছে শুনেছে এই গাছের নাম ইস্টোরাক্স। রাতের বেলা চুপিচুপি তাকে এই গাছের আঠা নিয়ে আসতে হয়। খেলা দেখানোর আগে বাবা তাঁর জিভে আর মুখের দুইপাশে ভালোভাবে এই আঠা মাখিয়ে নেন। হাতের তালুতে মাখেন ঘৃতকুমারীর ডাঁটা আর ওল পেষাই করে। পেষাই অবশ্য গণপতিকেই করে দিতে হয়। বাবা খেলা দেখানোর জন্য কোনও টাকা নেন না। তাঁর আসল আয় ওষুধে। বিভিন্ন পেটের রোগের ওষুধ, বাতের তেল, সান্ডার তেল আর সবচেয়ে বেশি যার বিক্রি সেই শিলাজিৎ। সব পুরুষই মনে মনে জোয়ান হতে চায়। বাবা বলে চলেন, "আপলোগ ইতনে মেহনত করকে পয়সা কামাতে হো পর আপনে জওয়ানি কে উপর আপনে কভি ধ্যান দিয়া? কভি সোচা আপকি বিবি আপসে খুশ হ্যায় কে নেহি? না-খুশ বিবি মতলব পরায়া মর্দ। মেরি বাত মানো, ইয়ে লে যাও হিমালয় কা আসলি শিলাজিৎ। ইয়ে দুধ মে মিলা কর পিলো ফির অ্যায়সা খেল খেলো কে বিবি

ভি পুছেগি, "ওয় মেরি জান, তুমনে আজ কেয়া খায়া?" সবাই হেসে ওঠে। কেউ শিলাজিৎ কিনতে এগোয় না। বড়োজোর দাঁত ব্যথা বা কান কটকটের ওষুধ বিক্রি হয় কিছু কিছু। বেলা বাড়ে। ভিড় হালকা হয়ে যেতে থাকে। এবারেই যেন শূন্য ফুঁড়ে উদয় হয় কিছু মানুষ। রোগা ক্ষয়াটে চেহারা থেকে তেল ঘি খাওয়া মাড়োয়ারি। বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে জেনে নেয় নিয়মকানুন। চোরের মতো হাত পেতে পাতায় মোড়া শিলাজিৎ নিয়েই গেঁজেতে ঢুকিয়ে ফ্যালে। আর ফেলেই প্রায় দৌড়ে পালায়। কুলকাঠের ছাই আর গাবের আঠা দিয়ে তৈরি এই শিলাজিৎ কাজ না করলেও লজ্জায় কেউ অভিযোগ জানাতে আসবে না। যতক্ষণ বাবা তাঁর খেলা দেখান, প্রায় অদৃশ্যের মতো ভিড়ে মিশে থাকে লখন। বাবার জাদুতে যখন সবাই আচ্ছন্ন, সবার অলক্ষে চলে তার হাতসাফাইয়ের কাজ। কারও গলার হার, গেঁজের টাকা, আঙুলের আংটি। কাছেই শেঠ বনওয়ারি দাসের গদি। তিনি প্রায় সিকিভাগ দামে এই চোরাই মাল কিনে নেন।

লখনকে নিয়ে একটা অস্বস্তি রয়ে গেছে গণপতির মধ্যে। ও কথা বলে কম। ছায়ার মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে মনে হয় বাবাও যেন ওকে একটু সমঝে চলেন। লখন সব জাদু জানে। কিন্তু দেখায় না। জাদু দেখানো যেন ওর উদ্দেশ্য না। সবসময় অন্য কিছু ভাবছে। গণপতি আসার পরে বাবার চ্যালার কাজ পাকাপাকি গণপতিই করত।

একদিন রাতে বাবা গণপতিকে বন্ধনের জাদু শেখাচ্ছিলেন। হাতে হ্যান্ডকাফ আর দড়ি বেঁধে হাতের মোচড়ে কীভাবে মুক্ত হতে হবে। গণপতির সামান্য ভুলে হাতে হ্যান্ডকাফ প্রায় কেটে বসে গেছিল। বাবাজি যতই চেষ্টা করেন খোলার ততই লোহার হ্যান্ডকাফ আরও এঁটে বসে। বাবাজি প্রথমে গা করেননি। বলছিলেন "কোশিশ কর বেটা", আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। শেষে গণপতি ব্যথায় প্রায় চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তখন বাবাজি হাত লাগালেন। কিন্তু ততক্ষণে লোহার আংটা হাতে চেপে বসে গেছে। নড়াতে গেলেই হাত ভেঙে যাবে। চাবি দিয়েও খোলা যাচ্ছে না। বাবাজি বললেন, একটাই উপায় আছে। গণপতিকে হাত সামনে টানটান করে হামাগুড়ি দেবার মতো বসতে হবে। গণপতি বসার চেষ্টা করার আগেই আচমকা কোথা থেকে উদয় হল লখন। তার হাত ধরে সামান্য মোচড়ে এমন করে হাতটা হাতকড়া থেকে বার করে দিল যেন অভিজ্ঞ শাঁখারি বাড়ির বউদের হাত থেকে চুড়ি খুলে নিচ্ছে। সেদিন পিন্ডারী বাবার মুখের সেই অবাক চাউনি ভুলতে পারেনি গণপতি।

সেদিন গভীর রাতে কালঘুমে ধরেছিল গণপতিকে। কিছুতেই চোখ মেলতে পারছিল না। ঘুমের মধ্যে শুধু টের পাচ্ছিল বহু মানুষের কথাবার্তা। নড়াচড়া। তার অঙ্গ অসাড়। কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করছে। খুব আবছা লখনের গলা শুনতে পাচ্ছিল সে। একদল লোকের সঙ্গে লখন কথা বলছে। বাকিদের মুখে কথা নেই। তারা যেন চুপ করে শুনে যাচ্ছে লখনের কথা। মাঝে মাঝে লখনের গলা চড়ছে। আবার খাদে নেমে যাচ্ছে। গভীর কোনও শলাপরমর্শ চলছে সবাই মিলে। বাবাজি কোথায়? তিনিও কি ঘুমে কাতর? লখন কী বলছে গণপতি তা বুঝতে পারছে না। তবে এটুকু পরিষ্কার, লখন চোস্ত ইংরাজিতে কথা বলছে। এমন ইংরাজি খাঁটি সাহেব ছাড়া কারও মুখে শোনেনি গণপতি। তার চোখ ঘুমে ঢলে এল। তারপর আর কিছু মনে নেই...

জ্ঞান ফিরল ঠান্ডা জলের স্পর্শে। গঙ্গার ঠান্ডা জল বারবার এসে তার পা ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মাথা ব্যথায় ফেটে পড়ছে। একটু সাড় পেতেই বুঝল কেউ তাকে ঘাটের ধারে ফেলে রেখে গেছে। এখন ভোররাত। পুব আকাশ ফরসা হব হব করছে। আর একটু পরেই একে একে পুণ্যার্থীরা ভিড় জমাবে ঘাটে। অতিকষ্টে হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল গণপতি। দুই হাতে বিষ ব্যথা। উঠে বসতেই পায়ে শক্ত মতো কী যেন ঠেকল। আর-একটা পা। ডান পা। লোমশ। এই পা সে চেনে। প্রতি রাতে এই পা ঘণ্টাখানেক টিপে দিলে তার ঘুমের অনুমতি মিলত। কিন্তু এখন এই পা বেয়ে চ্যাটচ্যাটে তরল গড়িয়ে পড়ছে। রক্ত। আকাশে ধীরে ধীরে আলো ফুটছে। পিন্ডারী বাবা ঘাটে চিৎপাত হয়ে শুয়ে। চোখদুটো খোলা। আকাশের দিকে তাকানো। বুকের পাঁজর থেকে নিচ অবধি সরাসরি দেহটা দুফালা করে দিয়েছে কেউ বা কারা। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে হর-কি-পৌরির ঘাটে। বাবার পাশেই রাখা সেই তলোয়ারটা, যেটা খেলাচ্ছলে প্রায়ই পেটে ঢুকিয়ে দেন তিনি। এবার সেটা তাঁকে বধ করেছে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল গণপতি। তার খালি গায়ে, পরনের খাটো ধুতিতে রক্তমাখা। দুই হাতে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধেছে। ভোর হয়ে গেছে। এবারে সবাই এসে তাকে এভাবে দেখতে পাবে। এখন উপায়?

"হাজতে যাবি, না আমাদের কথা শুনবি?" পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন এল ঘাটের একধার থেকে। ঘাটের পাশের মন্দিরের দেওয়ালের আড়াল থেকে অশরীরীর মতো বেরিয়ে এল লখন। তার সঙ্গে দুই ছোকরা সাহেব, যাদের গণপতি আগে কোনও দিন দেখেনি।

১।
চেয়ারে বসে ঠকঠক করে কাঁপছিল ছেলেটা। ধবধবে ফর্সা। নিখুঁত কামানো গাল। একটু ভালো করে দেখলেই চোখে পড়বে প্লাক করা ভুরু, জেল দেওয়া লম্বা চুল, ঠোঁটে ছোঁয়ানো হালকা লিপস্টিক। সেই ঠোঁট এখন দাঁতে চাপা। ছেলেটার সামনের দাঁতটা ভাঙা। সস্তার গোলাপি টিশার্টে লেখা "অ্যাচিভার"। জিনসের প্যান্টের হাঁটুর জায়গাটা ছেঁড়া। অস্থির হয়ে পা নাচাচ্ছে ছেলেটা। প্রায় তার নাকের ডগায় উলটোদিকে আর একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছেন অমিতাভ মুখার্জি। শান্ত। নিশ্চল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ছেলেটার দিকে। ছেলেটা সোজা তাকাতে পারছে না। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুড়িয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে, আবার চোখ সরিয়ে নিচ্ছে মেঝের দিকে। চোখের হালকা আইলাইনার জলে ভিজে লেপটে গেছে। দুই-একবার হাতের পিছন দিয়ে মোছার চেষ্টা করেছিল। এখন আর করছে না। অমিতাভ মুখার্জি আবার সেই প্রশ্নটা করলেন, যেটা এর আগে বার তিনেক করেছেন।

"বললাম তো তোর কিছু হবে না। তোর নামও কেউ জানতে পারবে না। এবার বল বিশ্বজিৎকে খুন হতে হল কেন? তুই করিসনি জানি। সে ক্ষমতা তোর নেই। কিন্তু কারা করতে পারে?"

কথা হচ্ছিল বিশ্বজিতের বাড়িতে ওরই শোবার ঘরে বসে। পাশের ঘরে ওর পাগল মা ঘুমাচ্ছে। তাই অফিসারের গলার আওয়াজ একেবারে খাদে। চেয়ারে বসা ছেলেটাই বিশ্বজিতের বন্ধু। ওর মায়ের খেয়াল এতদিন এই ছেলেটাই রাখছিল। বিশ্বজিৎ পনেরো দিন ধরে নিখোঁজ। তাও সে তার কোনও খোঁজ করেনি। পুলিশে খবর দেয়নি। কেন? সেই উত্তর খুঁজতেই মর্গে বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে রাত আড়াইটায় আমি আর অফিসার মুখার্জি বিশ্বজিতের বাড়িতে। দরজা খুলে আমাদের দেখে একটু চমকেই গেছিল ছেলেটা। কিন্তু পালাবার চেষ্টা করেনি। বিশ্বজিৎ খুন হয়েছে শুনে খানিক হাউহাউ করে কাঁদল। তারপর এই দশা। অফিসার পকেট থেকে ডায়রি বার করেছেন। অন্য হাতে পেন।

"তোর নাম কী বল আগে।"

ছেলেটা কী যেন বলল মিনমিন করে। শোনা গেল না।

"স্পষ্ট করে বল।"

"জি রামানুজ। রামানুজ তিওয়ারি।"

আমার আগেই মনে হয়েছিল ছেলেটির চেহারায় অবাঙালি ভাব আছে। এবার নিশ্চিত হলাম।

"বিহারি?"

"নেহি জি। ইউ পি।"

"ইউ পি-র কোথায়?"

"বেনারস।"

"বাংলা বুঝিস তো?"

"হাঁ।"

"এখানে এলি কীভাবে?"

"কামের ধান্দায়।"

"কী কাজ করিস?"

আবার চুপ। অফিসার আবার ধমকে উঠলেন, "কি রে? আমি কি সারারাত বসে থাকব নাকি এখানে?"

"ছিবড়ির কাম।"

এটাই ভেবেছিলাম। গোয়েন্দাগিরির লাইনে আসার পরে এই লাইনের বেশ কিছু কোড ওয়ার্ড বুঝি। ছিবড়ি মানে এরা পুরোপুরি পুরুষ কিন্তু পেটের তাগিদে হিজড়ার পেশা গ্রহণ করেছে। সাধারণত সমকামী বা উভয়কামী ছেলেরাই এই পেশায় আসে।

অফিসারও দেখলাম এটা জানেন। হালকা একটা হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে। তারপর বললেন, "এই বিশ্বজিৎ কি তোর পারিক?"

পারিক মানে পুরুষ বন্ধু, পার্টনার।

রামানুজ মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

"বিশ্বজিতের সঙ্গে আলাপ কী করে হল?"

ভাঙা ভাঙা হিন্দি আর বাংলা মিশিয়ে রামানুজ যা বলল তার অর্থ, ছোটো থেকেই সে আকুয়া, মানে দেহে পুরুষ আর অন্তরে নারী। এইজন্য স্কুলে সবাই তাকে বহেনজি, ভাবিজি বলত। বাবা ছিলেন ব্যাংকের দারোয়ান। সারারাত ডিউটি দিতেন। সকালে এসে পড়ে পড়ে ঘুমাতেন। ছেলের এই মেয়েলিপনা দুচোখে সহ্য করতে পারতেন না তিনি। বেল্ট খুলে মারতেন আর বলতেন, "মর্দ বন শালে!" সবার সামনেই ছেলেকে বলতেন, "ছক্কা" আর "আটঠা"। একদিন রামানুজ আর সহ্য করতে পারেনি। বাবা সেদিন প্রচণ্ড মারছিলেন। হাতের সামনে জলের কুঁজোটা ছিল। সোজা সেটা উঠিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল বাবার

মাথায়। বাবা উলটে পড়ে গেল। তারপর বেঁচে রইল না মরল সে জানে না। বাড়ি থেকে পালিয়ে সোজা কলকাতায়। ট্রেন ধরে কলকাতায় আসার সময়ই তার সঙ্গে শিউলির সঙ্গে দেখা হয়। শিউলি আর তার দলবল ট্রেনে ট্রেনে তালি বাজিয়ে টাকা নেয়। শিউলিও আগে ছেলে ছিল। এখন ছিন্নি করে খোজা হয়েছে। মেয়েদের মতো শাড়ি পরে। ফলস বুক লাগায়। শিউলির আগে অন্য নাম ছিল। গুরুমা-র দলে নাম লিখিয়ে শিউলি নাম হয়েছে। আগের নাম নাকি মুখে আনতে নেই। রামানুজ ভিড়ে গেল ওদের সঙ্গে। কিন্তু ও ছিন্নি করেনি। আর করেনি বলেই ছেলেমেয়ে হলে ঢোল বাজিয়ে ওর যাওয়া মানা। ওর নাকি পোস্টিং ট্রাফিক সিগন্যালে। সস্তার সালোয়ার কামিজ পরে। দুই হাতে সবুজ লাল রংবেরঙের চুড়ি। গাড়ি সিগন্যালে দাঁড়ালেই দুই হাতে ফটাক ফটাক তালি মেরে আবেদন করে, "আরে কিছু দে কে যাও রাজা... মেরে সালমান খান।" টাকা না দিলে গালাগাল আর দিলে হাতটা আলগা করে মাথায় ছুঁইয়েই পরের খদ্দের ধরতে দৌড়াতে হয়। রাত বাড়লে শুরু হয় পুলিশের উৎপাত। তখন তাদের খুশি করতে হত। সিগন্যালের পাশেই হাইওয়ের ধারে অনেকটা খোলা জায়গা আর ঝোপজঙ্গল। রাত বাড়লে সেখানেই যেতে হত রামানুজকে। সঙ্গে সেই রাতের ডিউটিতে থাকা পুলিশ। কখনও সেটা এক রাতে তিন-চারবারও। পুলিশ পয়সা দেয় না। সিগন্যালে দাঁড়াতে দেয় এই অনেক।

দিনের রোজগারের তিন ভাগ নেয় গুরুমা। এক ভাগ থাকে রামানুজের কাছে। এভাবে বছর পাঁচ-ছয় চলার পরে একদিন আচমকা হাওড়া স্টেশনে বিশ্বজিতের সঙ্গে দেখা। বিশ্বজিৎই ওকে দেখে এগিয়ে এসেছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল। ও তখন একটা দোকান থেকে দশ টাকার শুকনো প্যাটিস কিনে খাচ্ছে। যেন হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছে এমনভাবে সোজা তাকিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বিশ্বজিৎ বলেছিল, "নাগিন হয়ে বিলার কাজ করছিস কেন? আমার সঙ্গে যাবি নাকি? ভাগ্য ঘুরে যাবে।" নাগিন হল হিজড়ে সমাজে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে হিজড়েরা, আর বিলা মানে সবচেয়ে কুৎসিতদর্শন, পুরুষালি হিজড়ে। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে আগে কোনও দিন ভাবেনি রামানুজ। সেই প্রথম ভাবল। বিশ্বজিৎ দশ মিনিটের মধ্যে ওকে বুঝিয়ে দিল ওর মতো সুন্দরী হিজড়ার একজন স্থায়ী পারিক না থাকা লজ্জার। বিশ্বজিৎ নিজে ডবলডেকার, তার ছেলেমেয়ে দুই-ই চলে। প্রায়ই খিদিরপুরে হিজড়া খোলায় যায়। এখন ওর বাড়ি ফাঁকা। থাকার মধ্যে পাগল মা। রামানুজ চাইলে ওর সঙ্গে থাকতে পারে। হিজড়া সমাজে একজন স্থায়ী পারিক পাওয়া ভাগ্যের

ব্যাপার। সে আর না করেনি। গুরুমা-ও তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। ছাড়ার আগে গলায় পরিয়ে দিয়েছিল একগাছি সোনার হার। যেন মেয়ে বিদায় হচ্ছে। সেই থেকে বিশ্বজিতের সঙ্গেই আছে রামানুজ। ঘরের বউয়ের মতো।

"কতদিন হল?"

"ছে-সাত মাহিনা তো হোবে।"

"ছে না সাত?"

রামানুজ হাতের কড় গুনে কীসব হিসেব করে বলল, "জি সাত।"

"পাড়ার লোক কিছু বলত না?"

"বলত। মেরে সামনে। ও বহুত গুসসেওয়ালা আদমি থা। সব ডরতে থে উসসে।"

"কেন?"

"নেহি পতা। উসকে সাথ বড়ে বড়ে নেতাদের জান পেহচান ছিল।"

"পনেরো দিন হল বিশ্বজিৎ নিখোঁজ। পুলিশকে খবর দিসনি কেন?"

"বিশ্বজিৎ নে হি মানা কিয়া থা। লাস্ট যেদিন বাড়িতে এল। সিধা দোকান থেকে এল। আঁখ লাল। ডরা হুয়া। যেইসে কোই ভূত দেখ লিয়া হো। আমাকে এসে বলল, জানু, তুই আমার মাকে দেখিস। আমি পালাচ্ছি। আমাকে ফোন দিবি না। খোঁজ করবি না। করলেই ওরা আমাকে মেরে ফেলাই দিবে। জান লিয়ে লিবে। তু শুধু মায়ের খেয়াল রাখিস। আমি চলে আসব। ওয়াপস। কবে জানি না।"

"তুই জিজ্ঞেস করিসনি কাকে এত ভয় পাচ্ছে?"

"কিয়া থা। বোলা কি কোই ভূত থা, যো আব জাগ উঠা হ্যায়। ও সবকো খা যায়েগা। আমি সোচলাম পাগল হো গয়া লেড়কা। যানে সে পহলে পকেট সে একঠো কাগজ নিকালকে মুঝে দিয়া অউর কহা ইসকো সামহালকে রাকখো।"

"কোথায় সে কাগজ?"

চোখ মুছতে মুছতেই উঠে গেল রামানুজ। ফিরে এল ভাঁজ করা রুলটানা একটা খাতার পাতা নিয়ে। সেই পাতায় ব্লু ব্ল্যাক কালিতে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা, "হিলির ভূতকে জাগানোর সময় এসেছে। রমণপাষ্টি খেলা শুরু। আমি প্রথম দান দিয়েছি। এবার তোমার পালা।"

নিচে প্রেরকের নাম লেখা নেই। দরকারও নেই। এই কাগজ, এই কালি, এই হাতের লেখা আমার বড্ড চেনা...

দেবাশিস গুহ। আর কেউ হতেই পারে না।

২।

মুখার্জির মুখ দেখেই বুঝলাম আমার মতো উনিও হাতের লেখা চিনেছেন। না চেনার কিছু নেই। দেবাশিসদার এক নম্বর চ্যালা বলে কথা। তবে এ লেখার মানে কতটা বুঝেছেন তা জানি না। বার কয়েক জোরে জোরে লেখাটা পড়লেন। তারপর মাথা উঠিয়ে রামানুজকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই লেখার মানে কী?"

খুব স্বাভাবিকভাবেই রামানুজ জানাল সে বাংলা পড়তে পারে না, তাই মানে জানা সম্ভব না। অফিসার এবার ঘুরলেন আমার দিকে। "তুমি কিছু বুঝতে পারছ?"

"হিলির ভূত শব্দটা আমি আগে শুনেছি।"

"শুনেছ? কোথায়?"

"অনেক পুরোনো একটা বাংলা নাটকে।"

"নাটক?"

"হ্যাঁ। বটতলার নাটক। শৈলচরণ সান্যাল নামে একজনের লেখা..." বলতে না বলতে অধীশদার কথাগুলো মনে পড়ে চমকে উঠলাম। "শুধু খুন না, রিচুয়ালিস্টিক খুন। সারা দেহ ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে চিরে দেওয়া। অণ্ডকোশ কেটে নেওয়া হয়েছে। সে এক বীভৎস ব্যাপার।" অবিকল একইভাবে খুন হয়েছেন দেবাশিসদা আর কিছুক্ষণ আগে বিশ্বজিৎ। এই দুজন আবার একে অপরকে চিনতেন। দেবাশিসদা হিলির ভূতকে জাগানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন বিশ্বজিৎকে। জাগাতে গিয়েই কি সে মরল? রমণপাষ্টি কেমন খেলা? কীভাবে সেই খেলার প্রথম দান দিলেন দেবাশিসদা? সেই দানের সঙ্গে কি তাঁরও মৃত্যু জড়িত? ভাবতে গেলে গোটা ব্যাপারটা আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একশো বছর আগের ইতিহাস যেন অবিকল নিজেকে রিপিট করছে।

"বিড়বিড় করে কী বলছ? পরিষ্কার করে বলো।"

অফিসারের কথা শুনে বুঝলাম মাঝে বেশ কিছুক্ষণ নিজের চিন্তায় ডুবে গেছিলাম। সব খুলে বললাম তাঁকে। শুধু কীভাবে সেই নাটকটা পেলাম সেটা বাদে। কারণ তা বলতে গেলে আবার ডিরেক্টরের গোটা গল্প ফাঁস করতে হয়। টেমারলেন পেলাম না। উত্তরাধিকার সূত্রে একটাই দামি জিনিস পেয়েছি, সেটার কথা বলতে মন চাইল না। অফিসারও দেখলাম "নাটক কোথা থেকে পেলে" জিজ্ঞেস করলেন না। গোটাটা খুব মন দিয়ে শুনে বললেন, "তুমি একবার নিজে ভালো করে নাটকটা পড়ো। আমাকেও দেখিয়ো। আর এখন বাড়ি চলো। তোমায় ছেড়ে দিয়ে আসছি। প্রায় ভোর হতে চলল। কালকে

বেলার দিকে একবার তোমার অফিসে যাব। ফোন করো। দ্যাখো এর মধ্যে কোনও খবর জোগাড় করতে পারো কি না।"

রামানুজকেও বলে আসা হল, সে যেন এই মুহূর্তে বিশ্বজিতের বাড়িতেই থাকে। তার আধার কার্ডের ছবি তুলে নিলেন অফিসার। তারও একটা ছবি। পালালে কাজে আসবে। তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম ও পালাবে না। পালানোর হলে এতদিনে পালাত। হয়তো কোথাও একটা ভালোবাসা রয়ে গেছে বুকের ভিতরটাতে। নইলে দুইবেলা পারিকের পাগল মায়ের সেবা কেউ করে না। অফিসার নিজের গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। তখন প্রায় ভোরের আলো ফুটবে ফুটবে করছে। বিছানায় শুয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছি। ঘুম আসছে না। বারবার বিশ্বজিতের লাশটা চোখের সামনে ভাসছে। আর দেবাশিসদারটাও। দুটো খুনের মধ্যে যে কোনও কমন লিঙ্ক আছে, তা বুঝতে গোয়েন্দা হবার দরকার নেই। তারিণীচরণ থাকলে হয়তো আমার চেয়ে তাড়াতাড়ি কেস সমাধান করে দিত। আমার জায়গায় তারিণী থাকলে কী করত? সূত্র বলতে তো কয়েকটা শব্দ। হিলি, ভূত, রমণপাষ্টি, শৈলচরণ, প্রিয়নাথ। ব্যস! আর প্রিয়নাথ যে এই কেস নিয়ে কিচ্ছু লিখে যাননি সে কথা তো অধীশদা বললেনই।

'দারোগার দপ্তর' বইটার দুই খণ্ড খাটের পাশেই বইয়ের র‍্যাকে রাখা ছিল। গতবার বইমেলায় 'পুনশ্চ'-র স্টল থেকে কিনেছিলাম। কিছু পাব ভেবে না, এমনিই ঘুম আসছিল না বলে আলগোছে বইয়ের প্রথম খণ্ডটা হাতে তুলে নিলাম। রয়াল সাইজের মোটা বই। সাতশো পাতার উপরে। খয়েরি মলাটে দুখানা ডুয়েল পিস্তলের মতো পিস্তল আঁকা। একদম শুরুতে লেখা ভূমিকা আগেই পড়া ছিল। সত্যি বলতে কী, 'প্রিয়নাথের শেষ হাড়' নিয়ে অফিসারকে যে জ্ঞানটা দিয়েছিলাম, সেটা এই ভূমিকা পড়েই। কিন্তু নানা কাজে আর এগোতে পারিনি। আজ আবার ভূমিকাটা দেখতে গিয়ে শেষে চোখ আটকে গেল। সম্পাদক অরুণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি মোক্তারপাড়া, চন্দননগর, হুগলী। আবার চন্দননগর! কিন্তু আসল চমকটা অপেক্ষা করছিল পরের পাতায়। সূচিপত্রে। একের পর এক কাহিনি। আর কী দারুণ সব রোমাঞ্চকর নাম! "যমালয় ফেরতা মানুষ", "অদ্ভুত হত্যা", "আসমানী লাস"। কিন্তু এসব কিচ্ছু না। আমার চোখ যেন আঠার মতো আটকে গেল পাতার শেষের দিকে। ৩১৭ পাতা থেকে শুরু হচ্ছে এক কাহিনি। দুই পর্বে। চলেছে ৩৪৪ পৃষ্ঠা অবধি। কাহিনির নাম— "ইংরেজ ডাকাত (হিলি ও ওয়ার্ণার নামক দুই দস্যুর অদ্ভুত বৃত্তান্ত)।

৩।
পড়া যখন শেষ হল ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। একটা আশার আলো দেখা গেছে। যদিও জানি না সেটা আদৌ কোনও কাজের কিছু হবে কি না। অমিতাভ মুখার্জিকে ফোন করে তাঁকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অরুণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি নিশ্চিত, তাঁর বইতে যা আছে তিনি তার থেকেও বেশি কিছু জানেন। এই লেখার সঙ্গে তখনকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকার কাটিং, টীকা ইত্যাদি আছে। সেগুলোর সোর্স নিয়েও কথা বলতে হবে। পড়ে যতটুকু বুঝেছি এ এক ভয়ানক জটিল কেস। তাই যে সামান্য ক্লু-টুকু পাওয়া গেছে, সেটাকে ছাড়া যাবে না। ল্যাপটপ টেনে ফেসবুকে খুঁজতেই অরুণ মুখোপাধ্যায়কে পেলাম। সোস্যাল মিডিয়ার এই এক সুবিধে। প্রোফাইল দেখে নিশ্চিত হলাম ইনিই তিনি। কিন্তু আমি ফ্রেন্ডলিস্টে নেই। মেসেজ করলেও কবে দেখতে পাবেন জানি না। চট করে মনে পড়ল রজতকাকুর কথা। রজত চক্রবর্তী। চন্দননগরেই থাকেন। বাবার এককালের বন্ধু। এখন রিটায়ার করে লেখালেখি করেন। উনি নিশ্চিত জানবেন ভদ্রলোকের ফোন নম্বর। কাকুকে ফোন করতে প্রথমেই খানিক বকা খেলাম এতদিন খোঁজ না নেওয়ার জন্য। তারপর কী করছি জিজ্ঞেস করলেন। গোয়েন্দাগিরি করছি শুনে একটু অবাক হলেন ঠিকই, কিন্তু তারপর "বাঃ বাঃ" বলে বেশ উৎসাহই দিলেন। ঠিকই ভেবেছিলাম। রজতকাকুর কাছেই অরুণবাবুর ফোন নম্বর পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। সময় নষ্ট করা যাবে না। ভদ্রলোক বিকেলের দিকে যেতে বললেন। ভালোই হল। এর মধ্যে অফিসার মুখার্জির সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নেওয়া যাবে। আর হ্যাঁ। এবার সারা শরীর জুড়ে ক্লান্তি নামছে। কয়েক ঘণ্টা ঘুম দরকার...

বেলা ঠিক আড়াইটায় অফিসারের এসইউভি-টা বাড়ির তলায় এসে দাঁড়াল। গাড়িতে ফুল দমে এসি চালানো। উঠতেই ঠান্ডা হাওয়ায় হালকা কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিতে না দিতেই অফিসার পিছন ফিরে বললেন, "এবারে বলো দেখি। এই হিলির ভূত কী জিনিস?"

"হিলির ভূত কী তা জানি না। তবে হিলিকে চেনা গেছে। প্রিয়নাথের দারোগার দপ্তরে এদের নিয়ে দুই পর্বের কাহিনি আছে। ১৮৮০-র দশকের শেষের দিকের ঘটনা। ওয়ার্নার নামে এক সাহেব ছিলেন ডালহৌসির সিঙ্গার কোম্পানির ম্যানেজার। প্রচুর বেতন, সম্মান সবই আছে। কলকাতার

সাহেবসুবোদের ক্লাবে তাঁর নিত্য যাতায়াত। একদিন তিনি উত্তেজিত হয়ে পুলিশের কাছে এসে জানালেন তাঁর কোম্পানির দোকানের তালা ভেঙে প্রায় সাত হাজার টাকা আর বেশ কিছু গয়না চুরি গেছে। তখনকার দিনে এই টাকা অনেক টাকা। পুলিশ তদন্ত করে বুঝল দোকানের মেইন গেটে যে চাবস তালা লাগানো ছিল, সেটা ভাঙা হয়নি। খোলা হয়েছে। আর সেই স্পেশাল তালার চাবি একজনের কাছেই আছে। ওয়ার্নার। এত কাঁচা কাজ কেউ করবে বলে পুলিশ বিশ্বাস করেনি। ওয়ার্নারের পিছনে খোচর লাগল। দেখা গেল সম্প্রতি সে কলিঙ্গবাজারে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আর ইউরোপীয় বেশ্যাদের ঘরে ঘন ঘন যেত। এদেরই একজনের হাতে সোনার বালা দেখে পুলিশের সন্দেহ হল। সে জানাল এই বালা ওয়ার্নারই তাকে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও কিছু গয়না পার্সেল করে ওয়ার্নার বোম্বেতে তার মায়ের কাছেও পাঠিয়েছে। পুলিশ ওয়ার্নারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ওয়ার্নার বারবার জানায় সে কিছু জানে না। এমনকি যে রাতে ঘটনাটা ঘটেছিল তার স্মৃতিও কিছুমাত্র নেই। ওয়ার্নারের মতো হাইপ্রোফাইল মানুষকে ধরতে পোক্ত প্রমাণ লাগে। কিন্তু বোম্বেতে সেই পার্সেল ট্র্যাক করার আগেই ওয়ার্নারকে কেউ খবর দিয়ে দেয়। ওয়ার্নার পালায়। এক বছর তার কোনও পাত্তা নেই। এক বছর বাদে রেঙ্গুনের জেলে এক কয়েদিকে নিয়ে যেতে গিয়ে ইংরেজ পুলিশ অফিসার ওয়ার্নারকে আচমকা রেঙ্গুনে দেখতে পান। ওয়ার্নার সেখানে নিজের নামেই চাকরি জুটিয়ে দিব্যি আছে। অফিসার কলকাতায় এসে ঘটনাটা জানান। ওয়ার্নারের নামে ওয়ারেন্ট বার হয়, তাকে রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এনে বিচার করা হয়। বিচারে ওয়ার্নার আবার বলতে থাকে তার কিছুই মনে নেই। শেষ অবধি তার চার বছরের জেল হয়।"

এটুকু বলে ব্যাকপ্যাকের বোতল থেকে একটু জল খাবার জন্য থামতেই অফিসার বলে উঠলেন, "এ তো ওয়ার্নারের কথা। হিলি কোথায়?"

"জানতাম আপনি ঠিক এটাই বলবেন। এইবার হিলির এন্ট্রি হচ্ছে। ওয়ার্নারকে হরিণবাড়ি জেলে রাখা হলে সেখানে তার সঙ্গে হিলির দেখা হয়। হিলি কীভাবে জেলে এল সে আর এক ঘটনা। হিলি ছিল পেশায় সৈন্য। ওয়ার্নারের মতো হোয়াইট কলার জবের লোক না। প্রকৃত যোদ্ধা। সারা গায়ে গুলির নিশান। ব্রিটিশ সেনার হয়ে মিরাটে পোস্টিং ছিলেন। একদিন আচমকা নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কেন তা কেউ জানে না। লুকিয়ে আবার ফিরে যান ইংল্যান্ডে। সেখানে হিলিরও এক অন্ধকার জীবন শুরু হয়। প্রিয়নাথের ভাষায়,

তিনি 'ডাকাইতি ব্যবসা আরম্ভ করেন'। শুধু ডাকাতি না। খুনও। বিলাতে কোনও এক নামকরা ডিটেকটিভ, যাঁর নাম প্রিয়নাথ লেখেননি, তার পিছনে পড়ে যায়। ফলে হিলি আবার ভারতে পালিয়ে আসে।

প্রথমে বোম্বাই ও পরে কলকাতায় এসে নামজাদা এক হোটেলে থাকত। আর রাতে চলত অবাধে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি। শেষে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিটের এক বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে হিলিকে আয়া জাপটে ধরে। সেও আয়াকে এক লাথিতে মাটিতে শুইয়ে যা করল, তা একমাত্র সুপারম্যানই করতে পারে। দাঁড়ান, আমি প্রিয়নাথের লেখাটার ছবি তুলে এনেছি। এই জায়গাটা শুনুন একটু, 'পুলিশও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছাদের উপর গমন করিলে সে সেই ছাদের উপর হইতে এক লম্ফে অন্য আর একটি বাড়ির ছাদের উপর গিয়া পতিত হইল... সকলে মিলিয়া কেবল 'চোর চোর' বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। আর সেই চোরও লম্ফে লম্ফে দুই তিনটি বাড়ী অতিক্রম-পূর্বক অন্য আর একটি বাড়িতে গমন করিল'। তাহলেই বলুন, সুপারম্যান নয়তো কী!"

"তারপর?"

"তারপর পুলিশের সন্দেহ হল এই সেই হোটেল। কারণ তার আশেপাশের থেকেই চুরি হচ্ছে রোজ। মজার ব্যাপার পাহারাওয়ালা কমিটি তৈরির কথা হলে তাতে যাঁরা যোগ দিলেন, তাঁদের মধ্যে স্বয়ং হিলিও ছিল। কিন্তু বিধি বাম। হিলি তার চুরির সব সামগ্রী হোটেলের ঘরেই রাখত। একদিন আচমকা সেই ঘরে তল্লাশি হলে হিলি বমাল ধরা পড়ে। ১৮৮৮-তে তারও বিচার হয়ে জেল হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। তখন যাকে বাঙালিরা হরিণবাড়ি জেল নামে ডাকত। জেলে হিলি আর ওয়ার্নারকে একই সেলে রাখা হয়, যেহেতু দুজনেই ইউরোপিয়ান। দুজনে মিলে পালাবার প্ল্যান করে। কিন্তু যন্ত্রপাতি নেই। তাই অসুস্থতার ভান করে দুজনেই ভরতি হয় হাসপাতালে। সেখানে সবার চোখের আড়ালে তালা ভাঙার জন্য লোহার তার, ধারালো স্ক্যালপেল চুরি করে জেলে নিয়ে আসে। ১৮৮৯ সালের ৫ মার্চ দুজনেই জেল থেকে পালায়। দারোগা প্রিয়নাথ তাদের ধাওয়া করে কীভাবে শুশুনিয়া পাহাড় থেকে গ্রেপ্তার করেন সে এক রোমহর্ষক কাহিনি। আর বললাম না। পড়ে দেখবেন। কিন্তু আমার কয়েকটা খটকা আছে।"

"কী খটকা?"

"প্রিয়নাথ কাহিনির একেবারে শেষে জানাচ্ছেন, হিলি-ওয়ার্নারকে ধরে

প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলেই রাখা হয়। কিন্তু কলকাতাবাসী ইংরেজরা হিলিকে নিয়ে ভীত ছিলেন। তাই তাকে বোম্বাইতে নিয়ে যাবার প্ল্যান করা হল। ট্রেনে নিয়ে যাবার সময় নাকি হিলি চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ তাকে ধরে আনে। কিন্তু আজ সকালেই নেট ঘাঁটতে গিয়ে সমাচার চন্দ্রিকার একটা খবর চোখে পড়ল। তাতে লেখা, পুলিশ যাকে ধরে এনেছিল সে 'হিলির ন্যায় দেখিতে হইলেও হিলি নয়।' সে নাকি বারবার বলছিল তাকে পুলিশ অকারণে ধরে এনেছে। হিসেব মেলানোর জন্য। সেই মুজতবা আলির পঁয়তাল্লিশ নম্বরের কেস। ওয়ার্নার কিছু বলেনি যখন, তার মানে হিলি জেলের বাইরে থাকলে তার কিছু সুবিধে নিশ্চয়ই হত। সন্দেহ আরও বাড়ে যখন দেখি ওয়ার্নারকে এই দেশে রাখা হলেও হিলিকে বিলাতে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। কেন? প্রিয়নাথ নিজেও লিখছেন, "সেই স্থানে গমন করিয়া হিলি কী রূপে দিনপাত করিতেছে সে সংবাদ আমরা পাই নাই।" কিন্তু নাটের গুরু ওয়ার্নার জেল থেকে মুক্ত হয়ে বাকি জীবন ভদ্রভাবে কাটিয়েছেন সে উল্লেখ প্রিয়নাথের লেখায় আছে। তাহলে কি ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হিলি মারা গেছিল? না ফেরার হয়ে গেছিল? না এমন কিছু করেছিল যা প্রিয়নাথ সহ গোটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তখন চেপে গেছিল? সেটাই জানতে হবে। আর জানতে পারলে হিলির ভূতকে খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে না।

চন্দননগর আর কতক্ষণ, অমিতাভবাবু?"

৪।

বাড়িতেই ছিলেন অরুণবাবু। আমি আসব বলা ছিল, কিন্তু সঙ্গে পুলিশ আসবে এটা তিনি আশা করেননি। সদালাপী, অমায়িক মানুষ। বাঁশবেড়িয়ার কোনও এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অবসরে চলে গবেষণা আর লেখালেখির কাজ। ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় বসে আর সময় নষ্ট না করে সোজা কাজের কথায় চলে এলাম। মুশকিল হল কেসের ব্যাপারে সমস্তটা বলা অনুচিত, এদিকে না বললেও যে সাহায্যের জন্য আমরা এসেছি, তার গুরুত্ব বোঝানো যাবে না। তাই আগেই অফিসারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছিলাম স্থান আর পাত্রের নামগুলো উহ্য রেখে ঘটনাটা বলব। প্রায় আধঘণ্টা লাগল আমার বলতে। শেষ হতেই অরুণবাবু যেন দারুণ চিন্তায় ডুবে গেলেন। খানিক অন্যমনস্কভাবে কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বোলালেন। তারপর "দাঁড়ান আপনাদের একটা জিনিস দেখাই" বলে উঠে চলে গেলেন ভিতরের ঘরে। গেলেন তো গেলেনই।

আসার আর নাম নেই। প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছি, এমন সময় আবার ঘরে ঢুকলেন তিনি। হাতে একটা ধুলো পড়া ফাইল। ফাইল পাশে রেখে কথা শুরু করলেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, "অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন, যে প্রশ্ন আজ আপনার মনে জেগেছে, ঠিক সেটাই চোদ্দো বছর আগে বই সম্পাদনার সময় আমার মনেও জেগেছিল। বইতে সব লেখা যায় না। লেখা উচিতও নয়। কিন্তু প্রিয়নাথ আর তাঁর কেস নিয়ে আমিও বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। ব্যাপারটা সাদা চোখে যতটা সরল লাগে ততটাও না। হিসেবমতো দারোগার দপ্তরে শুধু প্রিয়নাথের অভিজ্ঞতার কথাই থাকা উচিত। মানে তেমনটাই হওয়ার কথা। হচ্ছিলও। ১৮৯১ থেকে শুরু হয়ে ১৮৯৫ অবধি প্রিয়নাথের সবকটা গল্পই মৌলিক। কিন্তু বদল এল পরের বছর থেকে। এইটা দেখুন।" বলে অরুণবাবু একটা পাতলা জেরক্স করা কাগজের তাড়া আমার হাতে তুলে দিলেন। অরিজিনাল দারোগার দপ্তরের থেকে ফটোকপি করা। কাহিনির নাম "পিতৃশ্রাদ্ধ"। সেটা দেখতে না দেখতেই আরও একটা একইরকম কাহিনি আমায় দেখতে দিলেন অরুণবাবু। নাম "বাঁশী"। কিন্তু এগুলো দেখে আমি কী করব? যেন আমার মনের কথাই বুঝতে পেরে মৃদু হেসে অরুণবাবু বললেন, "এগুলো আপনাকে পড়তে হবে না। আমি পড়েছি। দুটোই অবিকল দুই বিলাতি কেসের বঙ্গীকরণ। প্রথমটার নাম 'মাসগ্রেভ রিচুয়ালস' আর দ্বিতীয়টা অনেকেই জানেন, 'স্পেকেলড ব্যান্ড'। আর দুই ক্ষেত্রেই গোয়েন্দা একজনই।"

"শার্লক হোমস!" পাশ থেকে বলে উঠলেন অফিসার মুখার্জি।

"একেবারেই তাই। শুধু তাই নয়, ১৮৯৬-এর পর থেকে প্রিয়নাথের দারোগার দপ্তরে হোমসের একটা বড়ো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। কাহিনিতে প্রিয়নাথের নিজের চালচলনও যেন অনেকটা হোমসের মতো। কোনও কারণে উনি হয়তো ওই সময় নিবিড়ভাবে শার্লক হোমসের চর্চা করে থাকবেন। আরও একটা ব্যাপার। যেটা আপনি বলছিলেন। এই ১৮৯৫-৯৬ সময়কালে কলকাতায় অদ্ভুতভাবে একের পর এক জাতিদাঙ্গা বাধতে থাকে। মূলত ঘটনাগুলো ঘটত কলকারখানায়। আমার কাছে সেসব পেপারকাটিংও আছে। সেই কেসে প্রিয়নাথ জড়িয়ে পড়েন। তারপর ধরুন শৈলচরণের খুন। সেটাও। এমন সব রোমাঞ্চকর কেসের কথা বাদ দিয়ে তিনি কেন হোমসের গল্প নিয়ে মাতলেন সেটাই আমার কাছেও আশ্চর্যের। আমি নিশ্চিত ওই ঘটনাগুলো লিখলে সেটা দারোগার দপ্তরের সেরা কাহিনিদের মধ্যে ঠাঁই পেত।"

"আচ্ছা এমনও তো হতে পারে কেসগুলো, যাকে বলে ক্লাসিফায়েড। মানে

একান্ত গোপনীয়। ফলে চাইলেও প্রিয়নাথ এ নিয়ে কিছু লিখতে পারেননি।"

"হতেই পারে। কিন্তু আমি নিজে পারমিশান বার করে কলকাতা পুলিশের আর্কাইভ খুঁজেছি। সেখানেও কিচ্ছু নেই। কেউ যেন বড়ো একটা কাঁচি হাতে বসে কলকাতার ইতিহাসের গোটা একটা অধ্যায় মুছে ফেলে দিয়েছে।"

"কিন্তু কেন?"

"নো আইডিয়া। হয়তো কিছুই না। আমরা শূন্যে তাজমহল বানাচ্ছি। কিন্তু আরও একটা সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো এমন কিছু ঘটেছিল, যার প্রমাণ ইংরেজ সরকার রেখে যেতে চায়নি।"

"হিলি আর ওয়ার্নারকে নিয়ে কিছ বলুন। মানে প্রিয়নাথ যা লিখেছেন তার বাইরে।"

"একটা কথা প্রিয়নাথ লিখে যাননি। মানে তখনকার কলকাতায় লেখা মুশকিল ছিল। হিলি আর ওয়ার্নার পরস্পরকে চিনত না। কিন্তু চেনার পর কোনও দিন একে অন্যের বিরুদ্ধে যায়নি। বরং একসঙ্গে কাজ করেছে। হিলির সেই তথাকথিত পালিয়ে যাওয়া নিয়েও ওয়ার্নার নীরব। এই বন্ধুতা নেহাত অমূলক ছিল না। দুজনের মধ্যে একটা কমন ফ্যাক্টর ছিল। দুজনেই ছিল, যাকে পাক্কা সাহেবরা ব্যঙ্গ করে বলতেন, হাফ ব্লাড, এইট আনাস বা কান্ট্রি বর্ন।"

"মানে?

"মানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। বর্ণসংকর। ভারতীয় কলোনিয়ালিজমের সবচেয়ে অবহেলিত, উপেক্ষিত, নিগৃহীত জাতি। না ঘরকা, না ঘাটকা। ইংরেজরা তাঁদের ব্রিটন বলে মানে না। ভারতীয়রাও সামাজিক অবরোধ তুলে দিয়েছে। বেচারারা তবে যায় কোথায়? তাই তাঁদের একমাত্র কাছের মানুষ ছিলেন আরও একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। আর কেউ না। এভাবেই হিলি আর ওয়ার্নারের ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রথম যখন ইংরেজরা এ দেশে আসে, তখন আসতেন মূলত পুরুষরাই। ফলে দেশীয় রমণীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা চলত। সাহেবরা ভালোও বাসতেন সেইসব দেশি বিবিদের। উইলিয়াম হিকি আর তাঁর দেশি বিবি জমাদারনির কথা তো বিখ্যাত। তাঁদের সন্তানদের পিতৃত্ব স্বীকারেও তাঁদের বাধা ছিল না। সন্তানরা বিলেতে গিয়ে পড়াশুনো করতেন। ছেলেরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতেন, মেয়েরা ভালো সাহেব বর জুটিয়ে বিয়ে-থা করে সুখে সংসার পাততেন। মোটামুটি ১৭৮৬ সাল অবধি অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সুদিন চলেছিল। তারপরেই ওঁদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল,

ইংরেজ সরকার চিন্তায় পড়লেন। আসলে তো ওঁরা ভারতেরই লোক, এদিকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, অস্ত্রে বলীয়ান। যদি কোনও দিন নেটিভদের সঙ্গে হাত মেলায় তো বিপদ।"

"বলেন কী? তারপর?"

"তারপর আবার কী? আইন করে তাঁদের বিলাতে পাঠানো বন্ধ হল। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। অসামরিক চাকরিতেও অধিকার সংকুচিত হল। তারপর এল মারাঠা যুদ্ধ, আর মহীশূর যুদ্ধ। নিজেদের স্বার্থে আবার অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হল। কিন্তু তাঁরা আর আগের সম্মান পেলেন না। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময়ও কিন্তু এঁরা ইংরেজদের হয়েই লড়েছেন। তবু মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার নিয়েই তাঁদের টাইট দেওয়া শুরু করলেন। সেনাবাহিনীতে তাঁদের পদোন্নতি হত না। চাকরিতেও না। মাইনে ছিল একই পদের পাক্কা সাহেবদের থেকে ২০-২৫ টাকা কম। মিরাটের সেনাবাহিনী থেকে হিলির পালানোর এটাই কারণ বলে কেউ কেউ মনে করেন।"

"লন্ডনে হিলির গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জানা যায়?"

"সেই চেষ্টাও করেছি। লন্ডনের টাইমস পত্রিকার কিছু কাটিং আছে আমার কাছে। এই যে", বলে বেশ কিছু প্রিন্ট আউট বার করে দেখালেন। "লন্ডনে গিয়ে হিলি প্রথমে বেডলাম মানসিক হাসপাতালে কাজ নেয়। সেখানে ডাক্তার-গবেষক এলি হেনকি জুনিয়রের গবেষণাগারে সাফাইয়ের কাজ করত। কিন্তু বেশিদিন ভালো থাকা তার কপালে নেই। সে জুটে গেল এক ডাকাত দলের সঙ্গে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তার পিছনে লাগল। হিলি আবার পালিয়ে ভারতে এল। শুধু হাতে না। কিছু একটা চুরি করে। সেটা যে কী, পত্রিকা জানায়নি। শুধু লিখেছিল, "a thing of notable value"। এটা নিয়ে আর কোথাও কিছু পাইনি। এমনকি প্রিয়নাথের দপ্তরেও না। হিলি প্রথমে কলকাতায় আসে। কিন্তু পরে জানা যায় কলকাতায় হোটেলে থাকার আগে সে এক রাতে গঙ্গা পেরিয়ে হুগলী গিয়েছিল। কী কাজে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা নেই। তারপর কী হল সে তো আপনি জানেন। প্রিয়নাথ লিখেই গেছেন।"

"হিলি কি সত্যিই পালাতে পেরেছিল? না ধরা পড়েছিল?"

"দেখুন আপনার মতো আমারও উৎস এই পুরোনো কাগজ আর লেখা। যা ডকুমেন্টেড নেই, তা আমি বলি কী করে? তবে হিলির এই দেশের লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। প্রিয়নাথ তাকে পাকড়াও করলেও সে প্রকাশ্যে প্রিয়নাথের

বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা করে। প্রিয়নাথ নিজেই সেটা লিখেছেন। হিলির পরের জীবন নিয়ে অনেক খুঁজেছি। পাইনি। অনেক বছর বাদে আবার হিলির নাম শুনে সত্যিই যেন মনে হচ্ছে হিলির ভূত ফিরে এল", বলেই মুচকি হাসলেন অরুণবাবু। আমার হাতে হলুদ ফাইলটা দিয়ে বললেন, "আজকাল অন্য ধরনের লেখাপড়া করি। এটা আপনি নিয়ে যান। পুরোনো কিছু দারোগার দপ্তরের কপি আছে। খবরের কাগজের কাটিং আছে। যদি কাজে লাগে।"

এরপর আর কিচ্ছু করার নেই। ধন্যবাদ দিয়ে উঠে আসা ছাড়া। উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় কী একটা মনে পড়ায় অরুণবাবু বললেন, "ও হ্যাঁ। আর-একটা জিনিস", বলেই আবার ভিতরে ঢুকে গেলেন। বেরোলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হাতে একটা পৃষ্ঠা।

"প্রিয়নাথের রিটায়ারমেন্টের পরে তিনি নিয়মিত ডায়রি লিখতেন। তাঁরই এক ডায়রিতে শেষ দুটো পাতায় তাঁর লেখা সব দারোগার দপ্তরের হদিশ আছে। নাম সহ। ২০৫টাই। কিন্তু মজার ব্যাপার, এই লিস্টে একটা নাম বেশি আছে। দেখুন। ২০৬ নম্বর দিয়ে। আমি হলফ করে বলতে পারি এটা হয় লেখা হয়নি, আর হলেও পাণ্ডুলিপি থেকে আলোর মুখ দেখেনি। আপনি তো গোয়েন্দা। দেখুন না মশাই, যদি এই পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে পান। দারুণ একটা ডিসকভারি হবে তাহলে।"

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাম। ঘাড়ের কাছ থেকে অমিতাভ মুখার্জিও উঁকি দিলেন। ২০৫ নম্বরের কাহিনির নাম "নামকাটা সেপাই", আর তার ঠিক নিচেই প্রথমবার দেখলাম শব্দটা। আবার দেখলাম। এই শব্দের মানে কী? কাগজে লেখা আছে—

২০৬। নীবারসপ্তক

লখনের কথা

১।

১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাস। সদ্য সিমলা থেকে সপরিবারে কলকাতায় বদলি হয়েছেন সাহেব সিভিলিয়ান উইলিয়াম সেটন। সামনেই বড়দিন। তাই কেনাকাটা করতে একটা ল্যান্ডো চেপে তিনিও এসেছিলেন মেমসাহেবের সঙ্গে। আগে এখানে দুটো বাজার পাশাপাশি ছিল। সাহেবদের জন্য ফেনউইক বাজার আর নেটিভদের কলিঙ্গবাজার। কিন্তু নেটিভদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি

করে বাজার করতে সাহেবদের ঘোর আপত্তি। কিছুদিন আগে তাই কলকাতা কর্পোরেশন ফেনউইক বাজার ভেঙে শুধু সাহেবদের জন্য নতুন এক বাজার বানিয়েছেন। তাতে এক ছাদের নিচে নিত্য প্রয়োজনীয় সবজি ফল ফুল মাংস স্টেশনারি বইপত্র থেকে পোশাক জুতো ব্যাগ উপহার সামগ্রী সব সমস্ত কিছুই পাওয়া যাবে। নেটিভদের সঙ্গেও আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। বাজারের এক গালভরা নাম রাখা হয়েছে, ভিক্টোরিয়ান গথিক মার্কেট কমপ্লেক্স। কিন্তু মুখে মুখে সাহেবরা একে নিউ মার্কেট বলে থাকেন। কলকাতায় এসে বড়দিনের বাজারের জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা হয় না। ফেরার পথে একটা মুশকিল হল। কর্পোরেশনের একদল কুলি বিনা রেজিস্ট্রেশানে মাল বইছিল। তাদের সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান করা কুলিদের ঝামেলা বেঁধে এখন মারামারির পর্যায়ে গেছে। পুলিশ তেমন কিছু করছে না, বা করতে পারছে না। সেটন সাহেব কলকাতায় নতুন। তিনি ভয় পেলেন। সহিসকে বললেন অন্য পথ ধরতে। সহিস একটু অনিচ্ছাতেই পাশের কলিঙ্গবাজারের গলি ধরল।

উপরতলার ইংরেজরা এই রাস্তা এড়িয়েই চলতেন। যদিও রাতের অন্ধকারে এখানে সাহেবসুবোদের আনাগোনার কমতি ছিল না। কলকাতার একমাত্র ইউরোপিয়ান বেশ্যাদের কুঠি এই রাস্তায়। সেটন সাহেব এসব কিছুই জানতেন না। জানলে হয়তো গলিতে ঢোকার আগে দুবার ভাবতেন। ঢুকে দেখেন এক জায়গায় প্রচুর নেটিভ পুরুষ মহিলা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। গাড়ি একচুল এগোতে পারছে না। কী ব্যাপার দেখার জন্য সাহেব নিজেই ল্যান্ডো থেকে নেমে পড়লেন। রাস্তা জুড়ে এক প্রকাণ্ড চেহারার মানুষ খেলা দেখাচ্ছে। পরনে কেবল একটা টকটকে লাল ধুতি। মাথায় জটা। লোকটির সামনে দুটো বেতের ঝুড়ি। একটা ছোটো। একটা অপেক্ষাকৃত বড়ো। ছোটো ঝুড়ি থেকে মাথা বার করে প্রায় সোজা হয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মিশমিশে কালো একটা কেউটে সাপ। মাঝে মাঝে জিভ বার করছে। লোকটা সাপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মন্ত্রের মতো বলে যাচ্ছে, "লাগ-লাগ-লাগ-লাগ ভেলকি লাগ। লাগ বললে লাগবি, ছাড় বললে ছাড়বি। ভাটরাজার দোহাই রে বাবা। ভাটরাজার দোহাই।" সাহেব কথাগুলো না বুঝলেও অবাক চোখে লোকটাকে দেখছিলেন। এমন জিনিস তিনি আগে কোনও দিন দেখেননি। পাশে ততক্ষণে সহিস এসে দাঁড়িয়েছে। সে অল্প ইংরাজি জানে। সাহেবকে বুঝিয়ে দিল এরা বেদে। সাপের খেলা দেখায়। জাদু দেখায়। বেদে ততক্ষণে মন্ত্র বদলে ফেলেছে। নিজের হাতকে সাপের ফণার মতো দোলাচ্ছে সাপের সামনে, সাপের মাথাও

দুলছে তালে তালে। প্রায় গানের মতো অদ্ভুত বোলে লোকটা বলে চলল—

প্রথমে জুড়িলাম মাতা সয় ব্রাহ্মণী

ফুঁক দিতে ওগো মাতা বিষ নৈল পানি।

তা বাদে জুড়িলাম মাতা রক্ত রোহিণী।

সভা পানে চাইতে সাপের বিষ হৈল পানি।

বলেই হাতে অদ্ভুত এক ঝাড়া মারল। আর মারতেই সেই ফণা তোলা সাপ বাধ্য শিশুর মতো মাথা গুটিয়ে ঢুকে গেল বেতের ঝুড়িতে। সবাই তালি দিয়ে উঠল। নিজের অজান্তেই তালি দিলেন সেটন সাহেবও। বিষধর সাপ মানুষের কথা শুনছে। আশ্চর্য! কিন্তু আসল চমক ছিল এর পরেই। ঠিক পাশেই ছোট্ট একটা ইজের পরে দাঁড়িয়ে ছিল বছর আটেকের একটা বাচ্চা ছেলে। কুচকুচে কালো গায়ের রং। সামনের দাঁতদুটো উঁচুমতন। চোখদুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। বেদে তাকে বড়ো ঝুড়িতে ঢুকতে বলল। সে ঢুকবে না। বেদে যতবার বলে, সে মাথা নেড়ে না করে। শেষে বেদে রেগেমেগে একগাছা মোটা দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল ছেলেটাকে। সে বারবার হাত পা ছুড়ে বাধা দিতে চাইল। পারল না। এবারে বেদে জোর করেই তাকে ঢুকিয়ে দিল বড়ো বেতের ঝুড়িটায়। বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করল। ঝুড়ির ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে সেই কান্না। বেদে বড়ো একটা হাঁ করে নিজের পেটের ভিতর থেকে বের করে আনল লম্বা একটা তলোয়ার আর তীব্র রাগ আর ঘৃণায় সেই তলোয়ার বিঁধিয়ে দিতে লাগল ঝুড়ির গায়ে। শিশুটির আর্ত চিৎকারে গোটা গলি কেঁপে উঠল। ঝুড়ির গা বেয়ে বেরিয়ে এল তাজা লাল রক্ত। এতটা সহ্য করা সেটনের পক্ষে অসম্ভব। তিনি প্রায় কিছু না ভেবেই ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে বেদের হাত চেপে ধরলেন। বেদে চমকে তাঁর দিকে তাকাল। সে বোধহয় সাহেবকে দেখবে বলে ভাবেনি। তার চোখে ভয়। কিছু বোঝার আগেই সেটনের আপারকাট তাকে ধরাশায়ী করল। ঠিক সেই সময় রিনরিনে গলায় কে যেন বলে উঠল, "প্লিজ স্যার, প্লিজ।" সেটন অবাক হয়ে দেখলেন ভিড়ের মধ্যে থেকেই এক কিশোরী মেয়ে এসে তাঁর হাত চেপে ধরেছে। মেয়েটার দুই চোখে জল। চারিদিকে হাততালি দেওয়া নেটিভরা চুপ। তারাও বুঝতে পারছে না কী করবে। আর সাহেবকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিয়ে সেই মেয়েটার ঠিক পাশেই যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে সেই বাচ্চা ছেলেটা। অক্ষত। নিশ্চুপ। হতভম্ব সেটনকে আরও চমকে দিয়ে মেয়েটা আবার স্পষ্ট ইংরেজিতে বলল, "ইটস জাস্ট এ ম্যাজিক ট্রিক স্যার।" বেদে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার

হাতে লম্বা একটা বাঁশ। সেটনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সেই মেয়ে তরতর করে উঠে গেল বাঁশ বেয়ে। বাঁশের মাথায় তীক্ষ্ণ লোহার ছুরি। অদ্ভুত ব্যালান্সে সেই ছুরিতে নাভি ঠেকিয়ে বনবন করে ঘুরতে লাগল সে।

ফেরার আগে মেয়েটার হাতে দুটো সিক্কা টাকা গুঁজে দিয়েছেন সাহেব। দুটো মিষ্টি কথাও বললেন। মেয়েটার চুলের রং লালচে। ত্বক গোলাপি। চোখের মণি কটা। এ মেয়ে নেটিভ হতেই পারে না। কথা বলে সাহেব বুঝলেন এর মা কলিঙ্গবাজারের ইউরোপীয় বেশ্যা। ইদানীং আয় প্রায় নেই। তাই ছেলেমেয়েকে বেদের দলে ভিড়িয়েছে। হ্যাঁ, ওই নিকষ কালো শিশুটি নাকি এই মেয়েটির ভাই। হতেই পারে অবশ্য। সেটন ভাবলেন। এদের বাবার ঠিক আছে নাকি?

ল্যান্ডোতে ফেরার পথে সারাক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন সেটন। মেমসাহেব বারবার জিজ্ঞেস করাতেও উত্তর দিলেন না। সেই রাতে তাঁর ঘুম এল না। বারবার চোখে ভাসতে লাগল মেয়েটার মুখ, হাসি, সদ্য যৌবনের কুঁড়ি ধরা শরীর। এমন রমণীরত্ন বেশিদিন কলিঙ্গবাজারের মতো জায়গায় থাকলে অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁর উচিত এই মেয়েকে উদ্ধার করে নিজের আশ্রয়ে আনা। শুধু গিন্নিকে জানানো যাবে না। তাঁর বাবা নামজাদা সিভিলিয়ান। সেটনের অফিসের বড়োকর্তা। শ্বশুরের জোরেই এত দ্রুত উত্থান হয়েছে সেটনের। কিন্তু তা বলে কি তিনি উপোসি থাকবেন?

সেটন সেই রাতেই ঠিক করে নিলেন তাঁকে কী করতে হবে। কী যেন নাম বলেছিল মেয়েটা নিজের? মারিয়ানা। আর ওর ভাইয়ের নাম ল্যানসন। তবে ওই নাম খেলা দেখাতে গেলে নাকি চলে না। বেদে ওদের হিন্দু নাম দিয়েছে। ময়না আর লখন।

২।

গভীর ঘুমের দেশে মাঝে মাঝে কারা যেন এসে সাড়া দিয়ে যায়। লখন বুঝতে পারে না। শুধু আবছা ভেসে আসে কাদের যেন চিৎকার। প্রায় প্রতিদিন। স্বপ্নে। সেই কবেকার কথা। কিন্তু যেন সদ্য ঘটেছে। পরের দিন নববর্ষ। কলিঙ্গবাজারের ইউরোপিয়ান বেশ্যাপাড়া নিজেদের মতো সেজবাতি আর আলোয় সেজেছে। কিছু চিনা আর ইহুদি মহিলাও থাকে এখানে। তারাও যোগ দিয়েছে এই উৎসবে। লখনের মায়ের অসুখ সেদিন খুব বাড়াবাড়ি। জ্বরটা কিছুতেই কমছে না। বছর দু-এক আগেও সন্ধে হতে না হতে মায়ের ঘরে লোক ঢুকত। বহুদিন পরে বন্দরে আসা সাহেব নাবিক, জাহাজ-পালানো

মাতাল। তাদের ডেরা লালবাজার আর বউবাজারের পাঞ্চহাউস। সারাদিন সেখানে বসে মদ টানে আর সন্ধ্যা হতেই সোজা চলে আসে কলিঙ্গবাজারে। এদের নিয়ে কলিঙ্গবাজারের বেশ্যারা রীতিমতো ভয়ে থাকে। একে তো দরজা বন্ধ করে যথেচ্ছ অত্যাচার করে, তায় আবার অনেক সময় পয়সাও ঠেকায় না। সন্ধ্যা হবার আগেই লখনের মা জেনি তাদের দুই ভাইবোনকে পাশের এক ঘরে ঢুকিয়ে দরজা আটকে দিত। লখনের কানে আসত মায়ের অসহায় চিৎকার, অচেনা পুরুষ গলায় অশ্রাব্য গালিগালাজ। মারের শব্দ। দিদি মারিয়ানা তার দুই কানে হাত চেপে ধরত জোরে। তাতেও কাজ হত না। ফিরে যাবার সময় এদের কেউ টাকা দিত। কেউ দিত না। কিচ্ছু করার নেই। কার কাছে নালিশ করবে? আর তারপরেই কলিঙ্গবাজারের সবচেয়ে সুন্দর বেশ্যা বিবিজান খুন হল। মার্কিন জাহাজের নাবিক ফ্র্যাঙ্ক রাসেল তাকে ভোগ করে টাকা না দিয়েই চলে যাচ্ছিল। সে বাধা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পিস্তল বার করে সে বিবিজানের মাথায় গুলি করে। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে কিছু লেখালেখি হলেও পুলিশ তাদের রিপোর্টে অনিচ্ছাকৃত খুন দেখিয়ে রাসেলকে ছেড়ে দেয়।

সেদিন থেকেই জেনি ঠিক করেছে এই ব্যবসা ছেড়ে দেবে। বিবি তার মেয়ের চেয়ে কিছু বড়ো। মেয়ের মতোই তাকে স্নেহ করত সে। এদিকে জেনির দেহেও রোগ বাসা বেঁধেছে। জ্বর আসে প্রায়ই। পেচ্ছাপে জ্বালা। যোনিপথ দিয়ে রক্ত গড়ায়। কোমরের পর থেকে ব্যথায় অসাড়। তবু জেনি কাউকে জানায়নি। এ দেশে চৌদ্দ আইনের জোরে পুলিশ জানতে পারলেই ধরে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। আর পরীক্ষার নামে ডাক্তার নিজের সুখটি করে নেবে। অকারণে মুচড়ে ধরবে স্তন। যোনি পরীক্ষার নামে নিজের লালসা মেটাবে। সঙ্গে আছে উৎপীড়ন। বেশ্যা যত কাঁদে, পুরুষ ডাক্তার তত মজা পায়। ভয়ে এই পাড়ার কেউ কেউ চন্দননগরে ফরাসিদের ডেরায় পালিয়েছে। জেনির সে উপায় নেই। পারমিট মেলেনি।

জেনি অসুস্থ হতেই ঘরে লোক নেওয়া বন্ধ করল। পেটে টান পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আর ঠিক সেই সময়ই একদিন প্রায় ভগবানের মতো দেখা দিল বাবুলাল। বাবুলালের পুরো নাম কেউ জানে না। বাবুলাল বেদে। হাতসাফাই আর সাপের খেলা দেখায়। কলিঙ্গবাজারের মুখটাতে এসে ডুগডুগি বাজালেই সবাই এসে জড়ো হয়। মাসে একবার তো আসেই। মারিয়ানা আর ল্যানসন বড্ড ভালোবাসে তার খেলা দেখতে। কিন্তু সে রাতে সে এসেছিল একা। হাঁফাতে হাঁফাতে জেনির দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। দরজায় ধাক্কা শুনে জেনি

প্রথমে দরজা খোলেনি। ভেবেছিল কোনও মাতাল-দাঁতাল হবে। পরে ভাঙা গলায় "হেল্প মি। হেল্প মি" শুনে দরজা খুলতেই তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল বাবুলাল। তাকে পুলিশে তাড়া করেছে। রয়্যাল নেভির এক পাঁড় মাতাল নাবিক তার পোষা সাপকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। রাগে বাবুলাল মাথা ঠিক না রাখতে পেরে সাহেবের বুকে মেরেছে এক ঘুসি। আর তাতেই সাহেব অক্কা পেয়েছে। বাবুলাল জানে পুলিশ তাকে খুঁজতে এ পাড়ায় আসবে না। এ পাড়ায় নেটিভ লোকের আনাগোনা কম।

টানা ছয়মাস ঘরবন্দি ছিল বাবুলাল। তার কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত ছিল। সেই টাকাতেই সংসার চলত। ল্যানসনের জীবনে সেই ছয়মাস প্রায় স্বপ্নের মতো। বাবুলাল তাদের শেখাল ভানুমতীর খেল, বেদের বিদ্যা। হাত থেকে টাকা উড়ানো, ঝুড়ির ভিতর থেকে অদৃশ্য হওয়া, পালককে পায়রা বানানো, আরও কত কী। মারিয়ানাও শিখত সঙ্গে সঙ্গে। একটা বাঁশের উপরে ছুরির ডগায় কী করে নিজেকে ব্যালেন্স করে রাখা যায়। পেটে শুধু আগে থেকেই বেঁধে নিতে হবে লোহার একটা পাত। পাতের মাঝে একটা ফুটো। লোকে যাতে বুঝতে না পারে, সেই পাতের উপরে পেঁচিয়ে নিতে হবে লাল শালু। দুপুর হতেই জেনি গুনগুনিয়ে তাদের পড়ে শোনাত বাইবেল। কালো মলাটের সেই পুরোনো বাইবেল আর খয়েরি চামড়ায় মোড়া একটা হাতে লেখা পুরনো ডায়রি। এই ছিল জেনির সম্বল। এই ডায়রি কাউকে ধরতে দিত না সে। বলত একদিন এই ডায়রি আমাদের হাল ফেরাবে। কীভাবে? কেউ জানে না।

ছয়মাস হতে না হতে একদিন লোকটা এল। বাবুলালের খোঁজে। ঘরে থেকে থেকে বাবুলালের চেহারা ভেঙে পড়েছে। সারারাত ঘুমাতে পারে না কাশির চোটে। জেনি আদা গোলমরিচ ফুটিয়ে দেয়। অল্প আরাম হয়। লোকটা বাবুলালের খবর কীভাবে পেল কে জানে? দরজা খোলা পেয়ে সোজা ঢুকে এল জেনিদের ঘরে। বাবুলাল বিছানায় বসে ছোট্ট লখনকে হাতসাফাইয়ের খেলা দেখাচ্ছিল। ঢুকেই বাবুলালকে বলল, "কি গুরুদেব? ভালোই তো গা ঢাকা দিয়ে আচ? সবাই ভাবচে তুমি বুঝি পুলিশের গুলিতে মরেচ। আমি তো জানি তুমি সেই বান্দা নও।"

অস্বাভাবিক মোটা। দাড়িগোঁফ কামানো। পরনে ফতুয়া। গলার স্বরে কী একটা ছিল, লখন চোখ ফেরাতে পারছিল না লোকটার থেকে। বাবুলাল খুব ধীরে ধীরে বলল, "তোকে এই ঠিকানা কে দিল রে হরিরাম?"

"দিতে হয় নাকি? খুঁজে নিতে হয়।"

"কোনও ঝামেলায় পড়েছিস নাকি?"

"হ্যাঁ। চুরির। এক গয়নার দোকানে। পুলিশের নতুন এক দারোগা এইয়েচে। পিয়নাথ না কী যেন নাম। ব্যাটা হাড় জ্বালিয়ে মাচ্চে। তোমার একানে ঠাঁই হবে তো বলো।"

"জেনিকে বলে দেকচি। কিন্তু আগে বল খাবি কী? জেনির ঘরে লোক আসে না। আমার জমানো ট্যাকা শেয। তার উপরে তুই। পুরোনো বিদ্যে কিচু মনে আচে? না চুরির নেশায় ভুলে মেরেচিস?"

"কী যে বলো গুরুদেব। সব জানি।"

"বটে? তবে হাতের এক ঝটকায় এই হরতনের তিরির উপরে চিড়েতনের এক্কাটা নিয়ে আয় দেকি।"

হরিরাম নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাঁ হাতে তাসের বাণ্ডিলটা ধরে একটা ঝাড়া মারতেই ভিতর থেকে চিড়েতনটা টুক করে উপরে এসে বসে পড়ল।

"সাব্বাস বেটা! এক কাজ কর তবে। এই ছেলেমেয়ে দুটোকে আমি নিজের হাতে শিক্ষে দিয়েচি। তোকে যেমন দিয়েচিলাম। তুই ভোল পালটে ফেল। সাধুর বেশ নে। সাহেবরা আর নেটিবরা সাধুদের গায়ে হাত দিতে দশবার ভাবে। চম্পক ওঝার কাচে যা। বড়বাজারের পিছনে থাকে। একখান সাপ জোগাড় করে নে। বিষদাঁত দেকে নিস। হপ্তা দু-এক দাড়ি বাড়িয়ে খেলা দেকানো ধর। আর এই দুটোকে নিস। আমার নতুন চ্যালা।"

সাধু সেজে হরিরাম নতুন নাম নিয়েছিল পিন্ডারী বাবা। লোকের সামনে কথা বলত ভাঙা হিন্দিতে। দেশের বাড়ি হুগলী জেলার তারকেশ্বরের ভাণ্ডারহাটি গ্রাম। হরিরামই ল্যানসনের নাম দিয়েছিল লখন। সে রাম আর তার সঙ্গী লখন। হরিরাম আসার কিছুদিনের মধ্যেই বাবুলাল ঘুমের মধ্যে মারা গেল। সন্ন্যাস রোগ। বলেছিল সবাই। বাবুলাল মারা যেতেই হরিরাম বাড়ির মুরুব্বি হয়ে বসল। কথায় কথায় জেনিকে গালাগাল দিত। মারত। লখন ছাড় পেত না। ময়নাও না। দুধ দেওয়া গোরুর চাট খেতে বাধ্য ওরা। তাও একরকম চলছিল। সব বদলে গেল নববর্ষের সেই আগের রাতে।

দিদির বুকের কাছে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে ছিল সে। আচমকা দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়ল একগাদা লোক। কিছু সাহেব। কিছু নেটিভ। লখন এদের কাউকেই চেনে না। ঢুকেই একটানে উঠিয়ে নিল ময়নাকে। প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিল দুজন মিলে। তার মায়ের আর দিদির চিলচিৎকারে ঘর ভরে গেছে। লখন বুঝতে পারছে না কী করবে। সে দৌড়ে গিয়ে কামড় বসিয়ে দিল

একজনের পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে জোর লাথি। বুক ফেটে যাবে যেন। দিদি চিৎকার করে হাত পা ছুড়ছে। অন্ধকার ঘরে শুধু দুই একটা ঢাকা লণ্ঠনের ঝলকানি। সেই আলোতেই লখন দেখতে পেল তিনটে সোমত্ত সাহেব তার দিদিকে একটা বড়ো বস্তায় পুরে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে। ঘরের এক কোনায় মা গোঙাচ্ছে। তার উপরে হামলে পড়েছে দুজন নেটিভ। দুজনেই একেবারে ল্যাংটো। মায়ের চিৎকার বাড়তে বাড়তে ফেটে গিয়ে ফ্যাসফ্যাসে। লখনের বুকের ব্যথা বাড়ছে। লখন অজ্ঞান হয়ে গেল।

সেই রাতের পর হরিরামকেও কেউ দেখেনি। বন্ধ দরজার খিল কে খুলেছিল তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবু পুলিশ অভিযোগ নেয়নি। বেশ্যার আবার ধর্ষণ হয় নাকি? বেশ্যার মেয়েকে কে অপহরণ করবে? নিজেই পালিয়েছে কারও সঙ্গে। এর উপরে যা শোনা যাচ্ছে, কিছু সাহেবও নাকি ছিল সে রাতে। সায়েবে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। কে ঘাঁটাতে যাবে? তাও এক বেশ্যার কথা শুনে? মারিয়ানা চলে যাবার পরে জেনি কেমন একটা পাগল মতো হয়ে গেল। সারাদিন একা একা কথা বলে। বিড়বিড় করে। বাইবেলের পাতা ওলটায়। রাত হলেই বারবার করে দরজার খিল আটকায়।

জেনিদের ঠিক পাশেই লিলির কুঠি। লিলি বয়সে মারিয়ানার চেয়ে কিছু বড়ো। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। বড্ড ভালোবাসত মারিয়ানাকে। তার ঘরে এক বড়োলোক সাহেব যাতায়াত করতেন। লিলি তার সাহেবকে জেনিদের কথা বলে। সাহেব খোঁজ নিয়ে জানান সিটন নামে কোনও এক সিভিলিয়ান নাকি মারিয়ানাকে নিয়ে উঠিয়েছেন চন্দননগরে নিজের ভাড়া করা বাগানবাড়িতে। সিটনের হাত অনেক উঁচু। পুলিশের বাবার ক্ষমতা নেই সেখানে হাত দেয়। লিলির অনুরোধেই সাহেব নিজে মিশনারি জেমস থবর্নের কাছে সুপারিশ করে অনাথদের স্কুল ক্যালকাটা বয়েজে লখনকে ভরতি করে দেন। এই সাহেব লখনের জীবনটা ঠিক কীভাবে বদলে দিলেন সেটা বুঝতে বুঝতে লখনের আরও দশ বছর সময় লেগেছিল।

সাহেবের নাম জেকব ওয়ার্নার।

৩।

টানা সাত বছর ক্যালকাটা বয়েজে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল ল্যানসনের। শুরুতেই ভরতি হয় জুনিয়র শ্রেণিতে বালি বিভাগে। এখানে ছাত্রদের প্রাচীন প্রথামতো বালির উপরে অক্ষর শিখতে হত। কিছুদিনের মধ্যেই ল্যানসন

জ্যামিতি, অঙ্ক আর ইংরাজিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে। তার মূল সমস্যা ছিল দুটো। এক, তার গায়ের রং। দুই, তার ঠিকানা যে কলিঙ্গবাজার, তা কীভাবে যেন ফাঁস হয়ে গেছিল। জেনির অসুখ বেড়েছে। এখন প্রায় বিছানাতেই থাকে। তবে সামান্য কিছু সেলাইয়ের কাজ করে সংসার চালিয়ে নেয়। ল্যানসনের পক্ষে লেখাপড়া চালানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু পড়াশুনোয় তার উৎসাহ দেখে স্বয়ং জেমস থবর্ন তাকে মাসে দুই টাকা জলপানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ক্লাসে পাক্কা সাহেবরা একদিকে আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা অন্যদিকে বসত। একে অপরের সঙ্গে মিশত না। ল্যানসনের অবস্থা আরও করুণ। ইউরেশিয়ানরাও তাকে এড়িয়ে চলে। ক্লাসের একেবারে শেষে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে সে। তাতেও রেহাই নেই। প্রায় অকারণেই "ব্ল্যাকি" আর "বাস্টার্ড" শব্দ দুটো তার নামের প্রতিশব্দ হয়ে উঠল। ক্লাসে লালমুখো ইংরেজ সাহেব গ্রিফ ইংরাজি পড়াতেন। ল্যানসনকে দেখলেই তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে উঠত। সাহেব ক্লাসে এসেই জোরে জোরে গ্রে-র কবিতার বই কিংবা বেকনের প্রবন্ধ থেকে কিছুটা পড়ে শোনাতেন। তারপরেই পড়া ধরতেন। ইংরেজ ছাত্রদের সাত খুন মাফ। ইউরেশিয়ানদের পান থেকে চুন খসলেই সাহেব মস্ত বাঁটওয়ালা এক কাঠের ফেরুল দিয়ে তাদের হাতে জোরে জোরে মারতেন। আঘাতে হাত ফেটে রক্ত পড়ত। সবচেয়ে বেশি মার খেত ল্যানসন। গ্রিফের হাতে ফেরুল আর বেতের বাড়ি তার বাঁধা ছিল। তাকে পিটিয়ে অদ্ভুত এক পাশবিক আনন্দ পেতেন সাহেব। পিটিয়েই যেতেন, যতক্ষণ না তিনি হাঁফিয়ে যান। ল্যানসন কিছু বলত না। মুখ বুজে থাকত। স্কুলে তার তিন-চারটি বন্ধু হয়েছিল। তাদের সবাই নিচু জাতের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। অনাথ। প্রায় সবারই বাবা এই দেশে সেনা হিসেবে এসেছিলেন। তারপর হিন্দু বা মুসলমান মায়ের গর্ভে তাদের জন্ম দিয়েই আবার দেশে ফিরে গেছেন। সাহেব কলকাতায় এদের সবাই ডাকে চি চি বলে। কারও মা এখন হাসপাতালে আয়ার কাজ করে, কেউ ইংরেজ বাড়ির গভর্নেস, আবার কেউ এখনও অন্য কোনও সাহেবের রক্ষিতা হয়ে আছে। এই বন্ধুদের মধ্যে ল্যানসনের সবচেয়ে কাছের ছিল বনি। বনি নিজের সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলত না। ওইটুকু বয়সেই অদ্ভুত এক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে। কেন জানি না ল্যানসনের উপরে বনির স্নেহদৃষ্টি ছিল। বনির দলের তিন-চারজন অফ পিরিয়ডে প্রায়ই একত্র হয়ে কী যেন আলোচনা করত। অদ্ভুত ভাষায়। সে ভাষা ল্যানসন কোনও দিন শোনেনি। শুধু ঠোঁট নড়ত। মুখের কোনও বিকৃতি নেই। গ্রিফ সাহেব যখন গলার শির ফুলিয়ে মিলটনের

কবিতা আবৃত্তি করছে, বনির দল নির্বিকার মুখে শুধু ঠোঁট নেড়ে নিজেদের কথা চালিয়ে যেত। একেবারে পিছনে বসে থাকা লখনের পক্ষে সেসব কথা বোঝা সম্ভব না। তবে দীর্ঘদিন ধরে খেয়াল করে ল্যানসন বুঝেছে প্রতি মাসের সাত তারিখ এদের আলোচনা যেন একটু বেশিই বেড়ে যায়। একটা অস্থির ভাব। ক্লাসে মন নেই। একটা উত্তেজনা যেন চারিয়ে আছে সবার মধ্যে। ক্লাস শুরু হত ভোরে। দুপুরে শেষ হবার পরেও অন্যদিন সবাই খানিক স্কুলের লাইব্রেরিতে কাটিয়ে যেত। কিন্তু ওই একদিন বনির দলবল ক্লাস শেষ হতেই পড়ি কি মরি করে ছুট লাগাত কোথায় যেন।

ল্যানসনকে যেমন ওরা ব্ল্যাকি বলে ডাকত না, তেমন নিজেদের আলোচনায় ঢুকতেও দিত না কখনও। ক্লাসের শেষে লাইব্রেরি রুমে বসে বনি, মিলার, ডেভিড আর থিওন মিলে একত্রে পড়াশুনো করত। একই টেবিলে। রোজ। ল্যানসন ঠিক পাশের টেবিলেই বসে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব শব্দ কানে এসে যায়, "লজ", "মাস্টার", "আর্টিফিসার", "মার্সেনারি।" ল্যানসন এসবের মানে জানে না। একটু কান খাড়া করে শুনতে গেলেই কেউ না কেউ বুঝে ফ্যালে। সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে ওঠে "কাওয়ান", আর প্রায় ম্যাজিকের মতো সবাই একসঙ্গে একেবারে কেজো কথা আর ক্লাসের পড়াশুনোর কথা বলতে থাকে।

স্কুলের সপ্তম বছরে বনিদের দলে ল্যানসনের ঢুকে যাওয়াটা একেবারে ম্যাজিকের মতো। হেন্ডারসন সাহেব ছিলেন অঙ্কের মাস্টার। যেমন ভালো পড়ান, তেমন কড়া। তাঁর হোমওয়ার্কে ফাঁকি দেওয়া যেত না কোনওমতে। বনি তাঁর প্রিয় ছাত্র। ক্লাসে এসে হোয়েওয়েলের মেকানিকস কিংবা ফেল্পসের অঙ্ক বই থেকে কিছু অঙ্ক টুকে দিতেন বোর্ডে। সব শেষে 'ফর স্পেশাল স্টুডেন্টস' লিখে আরও খান দুই অঙ্ক। সবাই জানত এই স্পেশাল স্টুডেন্ট কে? বনি আর তার বন্ধুরা ছাড়া কারও সাধ্য ছিল না সেই অঙ্কে হাত দেবার। আর-একজন পারত। ল্যানসন। কিন্তু সে কোনও দিন কাউকে বলেনি। পরের দিন হেন্ডারসন বোর্ডে সেই অঙ্ক কষে দিলে ল্যানসন শুধু মিলিয়ে নিত নিজের কপির সঙ্গে। হেন্ডারসন বনিদের কপি দেখে মৃদু হেসে বনিকে বলতেন বোর্ডে এসে অঙ্ক কষে দিতে।

সেদিন লাইব্রেরিতে বসে ল্যানসন সবে হেন্ডারসনের স্পেশাল অঙ্ক কষে উঠতে যাবে, এমন সময় বনির উত্তেজিত গলা কানে এল।

"এভাবে হতেই পারে না। ভুল অঙ্ক। ইউক্লিডের থিয়োরির সঙ্গে তো একেবারেই মিলছে না!"

বাকি তিনজনও গালে হাত দিয়ে বসে। থিওন পালকের কলম কানে ঢুকিয়ে চুলকাচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই অঙ্কের মাথামুন্ডু উদ্ধার করা তাদের কম্ম না। ল্যানসনের হাসি পেল। বার্কলের জ্যামিতির বইতে একেবারে শেষের দিকে এই ধরনের কিছু সমস্যার কথা আছে। নিশ্চিতভাবে এরা সেই বই পড়েনি। শুধু পাঠ্যে থাকা ইউক্লিডের প্রথম ছটা খণ্ড আর এগারো নম্বরটা পড়েছে। হেন্ডারসন একবার বার্কলের কথা বলেছিলেন ক্লাসে। কিন্তু ওই বই থেকে অঙ্ক দেবেন এটা ল্যানসনও ভাবতে পারেনি। বনিদের পিছনের তাক থেকে বই বার করার ছলে খুব ধীরে ল্যানসন বলল, "এটার উত্তর ইউক্লিডের থিয়োরিতে হবে না। ল্যামবার্টের সূত্র ব্যবহার করতে হবে। চতুর্ভুজের তিনটি কোণ সমকোণ আর অন্যটা সূক্ষ্মকোণ। খেয়াল কর।"

চমকে উঠে চারজনেই তাকাল ল্যানসনের দিকে। বনি খানিক স্থিরভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে হাতের খাগের কলমটা ছুড়ে দিয়ে বলল, "দেন ডু ইট।"

পরের দিন ক্লাসে নিতান্ত অনিচ্ছাতেও হেন্ডারসনের কাছে খাতা নিয়ে যেতে হল ল্যানসনকেই। বনিরা খুব সম্ভব হেন্ডারসনকে কিছু বলেছিল। তিনি একবার ভুরু তুলে ল্যানসনকে দেখে ডেকে নিলেন বোর্ডে। নিখুঁতভাবে অঙ্কটা কষে দেবার পর শুধু পিঠে হাত রেখে বললেন, "ওয়েল ডান।"

এরপর থেকে বনিরাই ল্যানসনকে ডেকে নিতে থাকল নিজেদের সঙ্গে। প্রায়ই বনি তাকে নানারকম ছোটো ছোটো লিফলেট দিত। গোপনে। অনামা লেখকদের এইসব পুস্তিকায় লেখা থাকত কীভাবে এই দেশে অ্যাংলোদের ব্যবহার করছে ইংরেজ সরকার। কতটা ঘেন্না পুষে রেখেছে নেটিভরা তাদের জন্য। ল্যানসন বারবার জিজ্ঞেস করেছে, বনি কোথা থেকে এসব পায়? বনি বলেনি। এড়িয়ে গেছে। বলেছে সময় হলেই বলবে।

সময় হল।

সেদিন কলিঙ্গবাজারে ঢোকার মুখেই অচেনা এক লোককে দেখতে পায় ল্যানসন। এই পাড়ার নিয়মিত খদ্দের না। তখন সন্ধে নেমে এসেছে। রাস্তার ধারে ছোট্ট হালুইকরের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে লোকটা ফিসফিস করে লিলির সঙ্গে কী যেন কথা বলছে। সন্দেহ হতে ল্যানসন পাশেই একটা পাকুড়গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। লিলি তো কোনও দিন ঘরের বাইরে বেরোয় না! অবাক হয়ে সে দেখতে পেল লিলি সম্পূর্ণ অচেনা সেই লোকটাকে তার হাত থেকে সোনার বালা খুলে দেখাল। লোকটা হাতের কাগজের সঙ্গে

সেই বালা মিলিয়ে নিল। তারপর লিলিকে একটা ফটো দেখাল। লিলি ঘাড় নাড়তেই হেসে লোকটা লিলির হাতে কটা টাকার নোট গুঁজে দিল। লিলিও হাসিমুখে গলির ভিতর ঢুকে গেল।

ল্যানসন লোকটাকে চেনে না। বালাটা চেনে। গতকালই লিলি তার মায়ের কাছে এসে বালাটা দেখিয়ে গেছে। তার সোহাগের সাহেব ওয়ার্নার নাকি এটা দিয়েছে। ল্যানসনও দেখেছে বালাটা। হাতে নিয়ে। তাই ভুল হবার উপায় নেই। তাহলে এই লোকটা এখানে কী করছে? লিলিই বা তাকে বালাটা দেখাল কেন? ল্যানসন লোকটার পিছু নিল। মোড় ঘুরে নিউ মার্কেট পেরিয়েই যখন একদল লাল পাগড়ির কাছে গিয়ে লোকটা কী যেন বলতে লাল পাগড়ি লম্বা স্যালুট ঠুকে তার জন্য পালকি ডেকে দিল, তখন আর সন্দেহ রইল না। ওয়ার্নারের পিছনে পুলিশ লেগেছে।

ল্যানসন বেইমানি করতে পারবে না। যে ওয়ার্নারের জন্য আজ সে পড়াশুনো করতে পারছে, জলপানি পাচ্ছে, সে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে, এ হতেই পারে না। আজ বুধবার। প্রতি শুক্রবার লিলির ঘরে আসে ওয়ার্নার। তার আগেই তাকে সাবধান করতে হবে। কিন্তু সে ওয়ার্নারের ঠিকানা জানে না। শুক্রবার স্কুলে গেল না সে। বিকেল হতে না হতে দাঁড়িয়ে রইল গলির একেবারে মুখে। বেরোবার সময় সে দেখে এসেছে লিলির বাড়ি ঘিরে ফেলেছে একদল সাদা পোশাকের পুলিশ। আজ ওয়ার্নারের রেহাই নেই।

সন্ধে হতেই গলি থেকে একটু দূরে একটা ফিটন এসে থামল। দরজা খুলে গেল। ভিতরে ওয়ার্নার। একা। হাতে একটা বাক্স। ওয়ার্নার বাক্স থেকে কিছু একটা বের করার চেষ্টা করছে। ল্যানসন যেন বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছে, এভাবে গাড়ির পাশে গিয়ে স্পষ্ট কিন্তু চাপা উচ্চারণে বলে উঠল, "ডিঙুর।" এই পাড়ায় আসা যাওয়া করে, কিন্তু এই শব্দের মানে জানে না, তা হতে পারে না। কলকাতার একেবারে নিচুতলায় থাকা হিজড়ে আর বেশ্যাদের কাছে এই শব্দের একটাই মানে, 'পুলিশ'। এই বার্তা অস্বীকার করার ক্ষমতা ওয়ার্নারের নেই। সে দ্রুত দরজা বন্ধ করে গাড়ি ছোটাতে বলল।

পরের সোমবার ক্লাস শেষ হতেই বনি ল্যানসনকে বলল, "একটু অপেক্ষা করে যাও। হেন্ডারসন সাহেব ডেকেছেন।" ল্যানসন অবাক। আজ হেন্ডারসনের ক্লাস ছিল না। তিনি কাউকে ডাকেন বলেও শোনা যায়নি। তবে কি সে কোনও গর্হিত অপরাধ করে বসল? বনিই নিয়ে গেল হেন্ডারসনের কামরায়। ওকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল। হেন্ডারসন একটা মোটা বইতে মুখ

ডুবিয়ে বসে ছিলেন। ল্যানসনকে দেখেই হাসলেন, "কাম ইন মাই বয়।"

"আপনি ডেকেছিলেন স্যার?"

"হ্যাঁ। বসতে পারো।"

ল্যানসন তবুও দাঁড়িয়ে রইল।

"তোমায় একটা কথা জানানো প্রয়োজন। প্রয়োজন কেন, কর্তব্য। আমার বন্ধু ওয়ার্নার নিরাপদে এই দেশ ছেড়ে যেতে পেরেছে। অ্যান্ড দি এনটায়ার ক্রেডিট গোজ টু ইউ। ব্রাদার ওয়ার্নার যাবার আগে আমার কাছে এসেছিল। তোমার বিষয়ে সব কিছু বলেছে। তোমার এক দিদি আছে না? মারিয়ানা? যাকে সেটন তুলে নিয়ে গেছে?"

দিদির নাম শুনতেই ল্যানসনের চোখে জল। সে কোনওক্রমে মাথা নাড়াল।

"চিন্তা কোরো না। তোমার দিদিকে উদ্ধার করে আনার দায়িত্ব আমাদের। আমরা তোমার দিদির আর মায়ের দেখভাল করব। তোমার মায়ের চিকিৎসা করাব। কিন্তু শর্ত একটাই। তোমাকে আমাদের হয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের সংঘের কাজ। এ কাজে প্রাণসংশয় হতে পারে, কিন্তু যদি জিতি তবে সপাটে চড় মারা যাবে যারা আমাদের অবজ্ঞা করে তাদের মুখে। সুযোগ এসেছে। কিন্তু দরকার ভালো উদ্যমী ছেলের। কি, পারবে?"

অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল ল্যানসন, "আই ডাউট স্যার।"

"বাট আই হ্যাভ নো ডাউটস। আমি অনেকদিন ধরে তোমায় দেখছি। বনিরাও আমায় তোমার কথা বলেছে। তোমার সবচেয়ে বড়ো সুবিধে, তোমায় দেখে এ দেশের নেটিভ বলেই মনে হয়। বাংলা আর হিন্দিও তুমি নেটিভদের মতোই বলতে পারো। শুনলাম তোমার নাকি একটা নেটিভ নামও আছে। এটা আমাদের কাজে লাগবে। কিন্তু তার জন্য তোমাকে আমাদের সংঘে যোগ দিতে হবে। সংঘে থাকলে সব পাবে। বিশ্বাসঘাতকতা করলে সব কিছু কেড়ে নেব। হয় অনন্ত জীবন, নয় বিস্মৃতির মৃত্যু। রাজি?"

ল্যানসেন কিচ্ছু বুঝতে পারছিল না, "কোন সংঘ? কীসের কথা বলছেন স্যার?"

"শোনো, হ্যাঁ বা না বলার আগে তুমি ভেবে নিতে পারো", বলে চললেন হেন্ডারসন, "তোমার উত্তর যদি 'না' হয়, আমাদের আজকের আলোচনাটা কোনও দিন হয়নি। সেক্ষেত্রে তোমার মা বা দিদির কথা তোমাকেই ভাবতে হবে। কিন্তু যদি 'হ্যাঁ' হয়, দেন দেয়ার ইজ নো টার্নিং ব্যাক। নাও ইউ ক্যান টেক ইয়োর টাইম সন।"

খুব বেশি সময় নিল না ল্যানসন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলল, "আমি রাজি স্যার। কিন্তু এই সংঘের ব্যাপারে তো আমি কিছুই জানি না।"

চেয়ার থেকে উঠে, হাতের বইটা তাকে ঢুকিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে হেন্ডারসন বললেন, "হ্যাভ ইউ এভার হার্ড দ্য নেম অফ জাবুলন?"

রামানুজের কথা

১।

তুর্বসুরা চলে যাবার পরেও আধঘণ্টা রামানুজ চুপচাপ খাটে বসে রইল। ঠিক যা যা হবার কথা ছিল, তাই হচ্ছে। দেওয়ালে ঘড়ির দিকে তাকাল রামানুজ। ভোর পাঁচটা বাজে। মোবাইলে একটা নম্বর ডায়াল করল। ফোনটা বেজে কেটে গেল। ঠিক দশ মিনিট বাদে হোয়াটসঅ্যাপে একটা ফোন এল। "আননোন নম্বর" লেখা। কোনও নম্বর দেখা যাচ্ছে না। ফোন তুলতেই অন্য পাশে কোনও কথা নেই। অখণ্ড নীরবতা। শুধু নিঃশ্বাস নেবার একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

যা বলার রামানুজই বলল, "এক ডিঙুর ঠিকছে। সাথ মে এক টোলনা। দো মিলকে বড্ড বিলা চামনছে। মুঝে পোতনা হ্যায়। কব?" উত্তর এল না। রামানুজ আবার প্রশ্ন করল, "কব?" আবার উত্তর নেই। হতাশ হয়ে আবার সে বলা শুরু করল। "মেরা পারিক কো লোকান্তি হুয়া। ম্যায় চেতলা কা মাছিয়া খোল মে চলা যাঁউ কেয়া?" আবার উত্তর নেই। যেন দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলছে। রামানুজ জানে উত্তর আসবে না। ফোনের অপর পারে যিনি থাকেন, তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই ভালোবাসেন। এই নিয়ে তিনবার তিনি ফোন করেছেন। কোনও বার কিছু বলেননি। শুধু শুনে গেছেন। রামানুজের কানে এসেছে জোরে জোরে শ্বাস নেবার শব্দ। হতাশ রামানুজ প্রায় চিৎকার করে বলে, "জ্যায়সে বোলা গয়া থা ম্যায়নে তো ও হি কিয়া। বরাবর। ওহ পড়চি ভি পুলিশকো দে দিয়া। লেকিন পুলিশ নে উসকে সাথ মেরা আধার কার্ড কা ফোটো ভি খিঁচ লিয়া। মুঝে কহা গয়া থা মেরা কুছ নেহি হোগা। পর ম্যায় তো পুরিতরহা ফাঁস চুকা হুঁ। বিশ্বজিৎ নে ভি তো সব বোল দিয়া থা, ফিরভি উসকো কতল কিউ কিঁয়া আপলোগোনে? আব ক্যায়া মেরি বারি হ্যায়?" বলতে বলতে ভয়ে কান্নায় ভেঙে পড়া রামানুজ বুঝতে পেরে গেল ওপাশের ফোন কেউ কেটে দিয়েছে।

উত্তেজনায় বড্ড ভুল করে ফেলেছে রামানুজ। তাদের নিজস্ব কোডের বাইরে গিয়ে কথা বলেছে। স্বাভাবিক ভাষায়। এ ভাষায় কথা বলার নিয়ম নেই। বিশেষ

করে এমন গোপন কথা। রামানুজ জানে এবার কী হবে। ফোনের অপর পারে থাকা মানুষটা চেতলায় হিজড়েদের আস্তানার গুরুমাকে নির্দেশ দেবে। সরাসরি কিংবা কারও মাধ্যমে। ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। রামানুজ শুধু নির্দেশ পালন করতে জানে। সে জানে আর বেশিদিন নেই। তাকে বলা হয়েছে একবার হিলির ভূত জেগে উঠলে তার মুক্তি। তার মতো আরও হাজার হাজার মানুষের মুক্তি। মাঝে মাঝে তার মনে হয় তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হল। আবার ভাবে তার মতো না-চিজকে নিজের হাতে বেছে নিয়েছেন বড়ে মাস্টারজি। এক বিরাট বিপ্লবের জন্য। এটাও কম কথা না। রামানুজের পরিষ্কার মনে আছে বছর সাতেক আগের সেই দিনটার কথা।

শিউলি তাকে সোজা উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল চেতলার হিজড়েদের মহল্লায়। গুরুমা সেখানে ছোটোখাটো জমিদারের মতো। তাঁকে তুষ্ট করতেই সবাই ব্যস্ত। তিনি রেগে গেলেই শাস্তি পেতে হবে। আবার তাঁর হাত মাথায় থাকলে সাত খুন মাফ। প্রথমে বোঝেনি রামানুজ। পরে বুঝল এদের ভিতরের সম্পর্ক ভয়ানক জটিল। গোলাপ নামের হিজড়েটা গুরুমায়ের প্রধান শিষ্য। দেখতে পুরো ছেলেদের মতো। পোশাক পরেও তেমনি। কিন্তু আসলে সে গুরুমায়ের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। মায়ের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই সে খবর মায়ের কানে পৌঁছে যায়। তখন শাস্তি। সে শাস্তির শুরু বেতের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া অবধি যেতে পারে। এক গুরুমা কাউকে তাড়িয়ে দিলে অন্য কোনও হিজড়ে বাড়িতে তাকে নেবে না। ভিক্ষা করে খাবারও উপায় নেই। হিজড়েদের নেটওয়ার্ক ভয়ানক মজবুত। ঠিক পুলিশের সঙ্গে যড় করে জেলে ঢুকাবে কিংবা জন হিজড়ে হয়ে এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায় কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হবে।

শিউলিদের মহল্লার গুরুমা জেনানা। মানে শারীরিকভাবে পুরুষ। নিজে ছিন্নি করায়নি। ফলে নতুন কোনও নাগিন এলেই প্রথমে কিছুদিন তার খিদে মেটাতে হয়। রামানুজকে দেখেই গুরুমা-র মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটেছিল। রামানুজের মনে আছে। গুরুমা শিউলিকে ডেকে বলেছিল রামানুজকে তৈরি করতে। নিজে রামানুজকে পরীক্ষা করে দেখবে সে।

সামনেই ছিল কালীপুজো। সেই রাতে হিজড়েরা ঢোলের আরাধনা করে। আতপ চাল, পান, সুপারি, প্রদীপ, বাতাসা দিয়ে পুজো। সকাল থেকে শিষ্যা মেয়েরা বাজার থেকে তোলা তোলে। দোকান থেকে ইচ্ছেমতো জিনিসপত্র তুলে নেয়। দাম দেয় না। সন্ধে হতে না হতেই হিজড়ে বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দেওয়ালে তেল সিঁদুর দিয়ে আঁকা হল ঊর্ধ্ববাহু তিনটে অদ্ভুত মূর্তি।

অনেকটা লক্ষ্মীমূর্তির মতো। তার সামনে নতুন করে চামড়ায় ছাওয়া সবকটা ঢোল রেখে গুরুমা পুজোতে বসল। পুজোর মন্ত্র মনে মনে। গুরুমা ছাড়া কেউ জানে না। শুধু তার ঠোঁটদুটো নড়তে থাকে। পুজো শেষ হলে গুরুমা একটা ছাড়ানো নারকেল নিয়ে গোলাপের হাতে তুলে দিল। গোলাপ ঢোলের দিকে পিছনে করে ছুড়ে মারল জোরে। নারকেল ফেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই উদ্দাম হয়ে উঠল আনন্দে। ভগবান তাদের পুজো গ্রহণ করেছেন। এবারে নতুন সদস্য বলতে রামানুজ একাই। গুরুমা নিজের হাতে নারকেলের টুকরো রামানুজের মুখে পুরে দিলেন। ব্যস! রামানুজ গুরুমার শিষ্য হয়ে গেল। পরদিন থেকেই শুরু হল রামানুজকে তৈরির কাজ। শিউলি আর গোলাপ নিজের হাতে সে দায়িত্ব নিল।

আগের রাতেই কড়া জোলাপ খাইয়ে রামানুজের পেট পরিষ্কার করা হয়েছিল। শিউলি শক্ত, সরু একটা মসৃণ পাথরের দণ্ডতে ঘি মাখিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিল রামানুজের পায়ুদেশে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে চাইল রামানুজ। উপায় নেই। আগেই তার হাত দুটো উঁচু করে বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছে। দুই পা শক্ত করে চেপে ধরে আছে গোলাপ। দণ্ডটা আরও ভিতরে ঢুকছে। ব্যথা বাড়ছে। এবার পায়ু ছিঁড়ে যাবে। ছিঁড়ে গেল। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়তে লাগল পায়ুদ্বার বেয়ে। শিউলির মুখে হাসি দেখা গেল। "এবারে এই চিলকা ঢোলনা খজ্জর হল", বাচ্চা ছেলেটা হিজড়ে হল। পায়ুর এই রক্তকে হিজড়েরা মেয়েদের মাসিকের রক্ত বলে মনে করে। রক্ত না বেরোলে হিজড়ে হয় না। তারপর টানা সাতদিন ধরে চলল এই অনুষ্ঠান। প্রতিদিন একইভাবে একটু একটু করে সেই পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হত। শেষের দিকে মুখে আর কাপড় গোঁজা হত না। রামানুজের আর্ত চিৎকার যাতে বাইরে না যায়, তাই মহল্লার উঠোনে বসত নাচগানের আসর। গুরুমা নিজে এসে দেখত কাজ কেমন চলছে। রামানুজ যত চিৎকার করত, গুরুমা তত আনন্দ পেত। বলত আরও জোরে ঢুকাতে। সাতদিন পরে রামানুজকে চিত করে শুইয়ে পা উপরে তুলে দিল শিউলি। পায়ুনালী বড়ো হয়ে ফানেলের মতো হয়ে গেছে। পায়ুমুখ থেকে মলাশয় গোটা পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এবার রামানুজ গুরুমায়ের ভোগের জন্য তৈরি হয়েছে।

টানা সাতদিন গুরুমায়ের যৌন ক্ষুধা মিটিয়েছে রামানুজ। এই গুরুমা লোকটা ভয়ংকর। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট। বিরাট চেহারা। দাড়িগোঁফ কামানো। শরীরে পুরো পুরুষ। কিন্তু মহিলাদের মতো শাড়ি পরে থাকে। লাল শাড়ি।

মাথায় বড়ো সিঁদুরের ফোঁটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। নানা বিকৃত যৌন বাসনাক্কা তার। সে রামানুজের গায়ে পেচ্ছাপ করে দেয়, মুখে বাতকর্ম করে, রামানুজের পায়ুমন্থনের সময় ক্রমাগত খিস্তি দিতে বলে। সে যত খিস্তি দেবে, তার নাকি ততই মস্তি বাড়বে। কাউকে নাকি ভয় পায় না গুরুমা। পুলিশকেও না। একবার কী একটা কেসে পুলিশ এসেছিল তাদের মহল্লায়। সেদিন একা দাঁড়িয়ে থেকে এক গাড়ি পুলিশের মোকাবিলা করেছিল সে। তার মুখখিস্তির সামনে ভয়ে একবার পুলিশও হিজড়া বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারেনি।

অন্তত সবাই তাই ভাবে।

কিন্তু সত্যিটা রামানুজ জানে।

ততদিনে প্রায় মাস দু-এক কেটে গেছে। দুপুরে সব হিজড়েরাই কাজে বেরিয়েছে। আছে শুধু রামানুজ, গোলাপ আর গুরুমা। দুপুরে খাবার আগে তিনজন মিলে 'মস্তি' করে। সেই সময়ই বাইরে দুটো পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। একজন জন হিজড়া বাগান পরিষ্কার করছিল। সেই খবর দেয়। তড়িঘড়ি করে দোতলা থেকে নেমে তিনজন দ্যাখে পুলিশ ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে। গুরুমার চোখে সেই প্রথম রামানুজ তীব্র ভয় দেখেছিল। পাগলের মতো সে কাউকে একটা ফোন করছে। ফোন বেজে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। পুলিশ উঠোন পেরিয়ে গেছে। ফোন বাজতে বাজতে কেটে গেল। তারপরেই গুরুমার হোয়াটসঅ্যাপে ফোন এল একটা। গুরুমা ফোন ধরেই প্রায় আর্তনাদ করে বলল, "ডিঙুর ঠিকছে। পোতে যাই নারি। মোগাকে ঠিকতে বল।"

শেষ কথাটা কানে যেতে একটু চমকে গেল রামানুজ। প্রতি হিজড়ে মহল্লায় গুরুমায়ের এক স্থায়ী পুরুষ সঙ্গী থাকে। এরই কোডনাম মোগা। এই গুরুমায়ের মোগাকে কোনও দিন হিজড়ে মহল্লায় দেখেনি রামানুজ। শুনেছে সে আসে গভীর রাতে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে। গুরুমা নিজে সদর দরজা খুলে দেয়। অন্য হিজড়েরা বলে এই লোকটাকেই নাকি একমাত্র ভয় পায় গুরুমা। লোকটা এসে সোজা গুরুমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সকাল হবার আগেই চলে যায়। এই বাড়িতে এই প্রেতের মতো লোকটার নাম কেউ করে না। করলেও ফিসফিসিয়ে। গুরুমা পছন্দ করে না। একবার বাসন্তী এই মোগাকে নিয়ে কী একটা বলেছিল। গোলাপ সে কথা গুরুমায়ের কানে তুলে দেয়। গুরুমা কিচ্ছু বলেনি। পরেরদিন দুপুর থেকে বাসন্তীর ভেদবমি শুরু হল। সন্ধের মধ্যে সব শেষ। মাঝরাতে বাসন্তীর নগ্ন দেহ উপুড় করে শুইয়ে মিছিল করে শ্মশানে গেছিল সবাই। হিজড়াদের রীতি অনুযায়ী। নিয়ে যাবার আগে সবাই মিলে মৃতের

মুখে জুতোর বাড়ি মেরেছিল, যাতে পরের জন্মে আর হিজড়া হয়ে জন্মাতে না হয়। সেই দিন থেকে এই বাড়িতে মোগা শব্দটা আর কেউ উচ্চারণ করেনি।

সেই মোগাকে ভরদুপুরে এই বাড়িতে ডাকছে গুরুমা নিজেই! কী এমন হয়ে গেল? থামের আড়ালে লুকিয়ে অফিসারকে লক্ষ করছিল রামানুজ। গুরুমার ফোনের পরই অফিসারের কাছে একটা ফোন এল। যেন জোঁকের মুখে নুন পড়েছে, এভাবে অফিসার থমকে গেলেন। বাকিদের বললেন ওখানেই দাঁড়িয়ে যেতে।

পনেরো মিনিট। আধ ঘণ্টা। উঠোনের একদিকে রামানুজরা, অন্যদিকে পুলিশ। রামানুজ বুঝতে পারছে না এখানে পুলিশ কী করছে? একটু বাদে একটা লোক এল। এমন লোক আগে কোনও দিন এই বাড়িতে দেখেনি রামানুজ। মাথায় উশকোখুশকো কাঁচাপাকা চুল, গোঁফ আছে, দাড়ি কামানো। পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি আর জিনসের প্যান্ট। কাঁধে একটা ঝোলা। চোখে মোটা পাওয়ারের চশমা। লোকটা এসেই সোজা অফিসারের কাছে একটা কার্ড দেখিয়ে বলল, "আপনার যা বলার আমাকে বলতে পারেন। আমাদের একটা এনজিও আছে। রেজিস্টার্ড। এই যে কাগজ। আমরা এই হিজড়েদের নিয়ে কাজ করি। শুনতে পেলাম আপনারা নাকি বিনা ওয়ারেন্টে রেইড করতে এসেছেন?"

অফিসার চুপ। বললেন, "আমাদের কাছে পাক্কা খবর আছে।"

"কী খবর?"

"সেটা এভাবে বলা যাবে না। আপনি জানলেন কীভাবে আমরা এখানে এসেছি?"

"যিনি আপনাকে ফোন করেছেন, তিনিই আমায় জানিয়েছেন।"

"ভালো কথা। আপনাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে।"

"অবশ্যই যাব।"

"ভালো কথা। আপনার নাম?"

"দেবাশিস গুহ। পেশায় আমি স্টেট আর্কাইভের কর্মচারী। এই যে আমার আই কার্ড।"

২।

সেদিনের পর থেকে রামানুজের উপরে গুরুমা আর গোলাপের ব্যবহার কেমন যেন বদলে গেল। যেন ভয়ানক কোনও গোপন কথা জেনে ফেলেছে। পুলিশ চলে যাবার পরে হিজড়াদের দেবী বহুচেরার কাছে রামানুজকে নিয়ে শপথ

করাল গুরুমা। যা ঘটেছে তা যেন কেউ না জানতে পারে। খোলের হিজড়ারাও না। কিন্তু তারপরেও তার উপরে দুইজোড়া অদৃশ্য চোখ যেন নজর রেখে চলত চব্বিশ ঘণ্টা। তার বাইরে বেরোনো প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। গেলেও সঙ্গে কাউকে পাঠানো হত। এভাবে মাস ছয়েক চলার পরে গুরুমার বিশ্বাস হল সে কাউকে বলেনি বা বলবে না। এবার তাকে কাজ দেওয়া শুরু হল।

এই কাজ গুরুমা ধরতে যেত। কে তাকে বরাত দিত কেউ জানে না। একদিন গভীর রাতে গোলাপ ঘুম ভাঙিয়ে রামানুজকে গুরুমা-র ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে দুই-তিনজন অচেনা মানুষ। গুরুমায়ের সামনেই বসে একজন পায়ের উপরে পা তুলে অত রাতে চোঁ চোঁ করে চা খাচ্ছিলেন। সঙ্গের দুজনের চা শেষ। রামানুজ ঢুকতেই গুরুমা বলল, "ওলো দাশরথি, দেখে নাও গো। এই আমাদের নাগিন, যার কথা বলেছিলাম তোমাকে। ছেমড়িটা চিসা। তুমি বলছিলে টিংবাজের ভালো কাজ আছে। শিখিয়ে নিয়ো গো। কী? চলবে?"

দাশরথির নাম শুনেই চমকে উঠেছে রামানুজ। কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ডে অঞ্চলে দাশরথি এক রূপকথার নায়কের মতো। কলকাতার সেরা কারিগর। টালা থেকে টালিগঞ্জ, শিয়ালদা থেকে শালকে ট্রেনে উঠলে কারও পকেটের মানিব্যাগ থেকে এলাচদানা কিছুই তার হাত থেকে বাদ যায় না। ইদানীং সে নিজে কাজ করে না। তার চ্যালারা খাটে। কিছুদিন আগেই তার এক চ্যালা ট্রেনে চাপা পড়ে মরেছে। তাই সে এসেছে গুরুমার কাছে। নতুন চ্যালার সন্ধানে। রামানুজকে আগাপাশতলা দেখল দাশরথি। মরা মাছের মতো আবেগহীন চোখ। তারপর গুরুমাকে বলল, "এর ছিন্নি করা আছে?"

"না। করাইনি।"

"ঠিক আছে। সমস্যা নেই। কাল সকালে আমার ডেরায় পাঠিয়ে দিয়ো। শিখিয়ে পড়িয়ে নেব।"

দাশরথি চলে যেতেই গুরুমা দুই হাত কপালে ঠেকাল।

•

পরের দিন সকাল সকাল মেয়েদের পোশাক পরে দাড়িগোঁফ কামিয়ে রামানুজ কলাবাগানের মোড়ে হাজির। সেখানে আগে থেকেই দাশরথির এক চ্যালা দাঁড়িয়ে ছিল । সে-ই রামানুজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আড্ডায়। বাইরে থেকে দেখলে অন্য দশটা বাড়ির সঙ্গে তফাত করা মুশকিল। ভিতরে রীতিমতো ক্লাস চলছে। দাশরথি এই স্কুলের মাস্টার কারিগর। সবাই ডাকে হেডমিস্তিরি বলে। তার আন্ডারে গোটা পাঁচেক কারিগর। মূল কাজটা এরাই

করে। পকেট থেকে মোবাইল, মানিব্যাগ সবার অগোচরে তুলে নেওয়া বা ব্লেড দিয়ে অবলীলায় পকেট কাটা, যাতে চামড়াতে দাগ অবধি না পড়ে, সেটাই এদের কাজ। এদের ঠিক পাশেই যে থাকে, তার কোড নাম 'সেয়ানা'। কারিগর মালটা তুলেই এর হাতে পাচার করে দেয় আর সে সবার অলক্ষে সরে পড়ে। আর এই গোটা ঘটনা চলার সময় ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোককে চেপে ধরার দায়িত্ব টিংবাজদের, যাতে মানুষটা এই পকেটমারার সময় নড়াচড়া না করতে পারে। এই টিংবাজ হিসেবে হিজড়েদের কদর বেশি। দলে হিজড়ে থাকলে এমনিতেই লোক একটু ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে, মনোযোগ হিজড়ার দিকে চলে যায়। সেই ফাঁকে কাম তামাম।

মাসখানেক ট্রেনিং-এর পর রামানুজকে ফিল্ডে নামানো হল। ছাত্র হিসেবে সে এককথায় অসাধারণ। দেখতে সুন্দর। গালি দেয় না, বরং মিষ্টি লাস্যে যাত্রীদের ভুলিয়ে রাখে। সে দলে থাকা মানেই কারিগরের এক্সট্রা আয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতে তার প্রমোশান হল 'সেয়ানা'-তে। কারিগর তার হাতে মাল দিলে সাপের মতো কখন যে কেটে পড়ে বোঝা দায়। দাশরথি ঠিক এই জায়গায় একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিল। রামানুজকে মিস্তিরি বানাবে। প্রথম আপত্তি এল অন্য মিস্তিরিদের কাছ থেকেই। হিজড়ারা টিংবাজ, ঘেরা, এমনকি সেয়ানাও হতে পারে, কিন্তু একজন নপুংসক মিস্তিরি হলে অনর্থ ঘটে যাবে। কলকাতায় কেন, সারা ভারতে এই নজির নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, হিজড়া মিস্তিরি হলে কোনও পুরুষ তার অধীনে কাজ করবে না। কিন্তু দাশরথি একবগগা। সে রামানুজকে মিস্তিরি বানিয়ে ছাড়বেই। তাকে হাতসাফাইয়ের খেলা শেখানো শুরু হল। হাতের তালুতে মুদ্রা রেখে হাত খুললে খালি। লাউয়ের উপরে একটা পাতলা কাপড়ের সাপি ভিজিয়ে পেতে দিত। একটা ব্লেড আধটুকরো করে ভেঙে একটা অংশ মাঝখানের দুই আঙুলের ফাঁকে রেখে ন্যাকড়া চিরে দিতে হবে, কিন্তু লাউয়ের গায়ে আঁচড় লাগা চলবে না। তাও সে শিখে গেল একমাসের পরিশ্রমে। চেতলার হিজড়াদের খোলে এখন রামানুজের আলাদা সম্মান। রোজগার সবচেয়ে বেশি। মাঝে একবার দাশরথি নিজে এসে গুরুমার কাছে প্রশংসা করে গেছে। কিন্তু রামানুজ জানত সমস্যা বাধবে সেই দিন, যেদিন প্রথম তাকে মিস্তিরি হয়ে ফিল্ডে নামতে হবে। হলও তাই। একজনও তার শাগরেদ হয়ে যেতে রাজি না। দাশরথির ধমকধামক, অনুরোধ উপরোধ কিছুই কাজ করল না। অন্য কেউ হলে ফিল্ডে যাবার সাহসই করত না। একা ফিল্ডে যাওয়া আর জ্বলন্ত আগুনে হাত দেওয়া এক। দাশরথি প্রায়ই গল্প করত, সে নাকি বেশ কয়েকবার একা ফিল্ডে

গেছে। রামানুজ ঠিক করল সেও যাবে। একাই। দাশরথি বাধা দিল। ভয় দেখাল। শেষে বলল যে ধরা পড়লে কেউ কিন্তু তাকে ছাড়াতে যাবে না। রামানুজ অনড়।

গড়িয়াহাটে সেদিন প্রচণ্ড ভিড়। সামনেই পুজো। গত চার-পাঁচ দিন টানা বৃষ্টি হয়েছে, তাই লোকজন কেনাকাটা করতে পারেনি। আজ আকাশ পরিষ্কার হওয়াতে ভিড় উপচে পড়েছে। সেই ভিড়ের মধ্যেই মেয়েটাকে দেখতে পেল রামানুজ। বন্ধুদের সঙ্গে এসেছে। বোঝাই যাচ্ছে। আর এদিকের মেয়েও না। চোখের চাউনি দেখলেই ধরতে পারে রামানুজ। একেবারে আনাড়ি। হাতের পার্সটা আলগা করে ধরে বন্ধুদের সঙ্গে হাসাহাসি করছে। রামানুজ আজ পুরো মেয়ে সেজেছে। টাইট ওড়না, কুর্তি, বুকে উঁচু প্যাড, চট করে দেখলে ধরা মুশকিল। বেশ কিছুটা দূর থেকে তালি বাজাতে বাজাতে আর দোকান থেকে টাকা চাইতে চাইতে এগোতে শুরু করল সে। কেউ টাকা দিচ্ছে, আবার কেউ দিচ্ছেও না। না দিক, এটা তার ভেক। মেয়েটা যে দোকানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে এসেই রামানুজ এমন শুরু করল যেন তার শরীর বড্ড খারাপ লাগছে। দোকানিকে বলল, "এ বাবু, জারা পানি দেনা। মুঝে উলটি আ রহি হ্যায়", বলেই বমি করার ভাব করল। দোকানি এসব দেখে অভ্যস্ত। সে "ভাগ হিঁয়াসে" বলে ভাগাতে যেতেই দোকানের ঠিক পাশে বিকট ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে বমি করার চেষ্টা করল রামানুজ। কিছুই বেরোল না। মেয়েটার এক বান্ধবী কুণ্ঠিত হয়ে নিজের জলের বোতল বাড়িয়ে দিল। সেটা না নিয়েই হনহনিয়ে হাঁটা দিল রামানুজ।

কলাবাগানে ফিরে টাকাভর্তি লেডিস পার্সটা যখন দাশরথির সামনে নিয়ে ফেলল, তখন দাশরথির চোখে অদ্ভুত বিস্ময়। কোনও হেল্পার ছাড়া প্রথম দিনেই এত টাকা! রামানুজের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "জিতে রহো বাচ্চে।" দাশরথির নিয়ম অনুযায়ী তার সব চ্যালারা যা কামায় সারাদিন ধরে তা তার কাছে জমা পড়ে। রাত হলে সেই টাকা সে ভাগ করে দেয়। কেউ বেইমানি করে ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বার করে দেওয়া তো হয়ই, তার নাম, ছবি চলে যায় পুলিশের কাছে। কোনও দিন এই লাইনে আর তাকে কিছু করে খেতে হবে না।

রামানুজের কপাল খারাপ। প্রথম কামাইয়ের একটা পয়সাও সে ভাগে পায়নি। দুপুর নাগাদ একটা ফোন এসেছিল। দাশরথির কাছে। ফোনটা পেয়েই দাশরথির মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। ফোন রেখে খুব ধীরে ধীরে রামানুজের কাছে এসে বলল, "বুরা খবর হ্যায় এক। ভজহরি নে ফোন কিয়া থা। ইয়ে ব্যাগ তু গড়িয়াহাট সে উঠায়া কেয়া?"

রামানুজ মাথা নেড়ে স্বীকার করতেই দাশরথি বলল, "তব তো ইয়ে ভি দেনা পড়েগা। উস এরিয়া মে ভজহরিকা জান পেহচান মে কোই হ্যায়। উসকা ব্যাগ উঠায়া কোই। হো সকতা হ্যায় কে এ হি ব্যাগ হো!"

"কিঁউ দু ম্যায়? মেরা পহেলা কামাই", চোখ ফেটে জল আর্সিস্ল রামানুজের।

"বেটা দেনা পড়তা হ্যায়। লোকাল লিডার হ্যায় ও। গুন্ডাগর্দি করতে হ্যায়। বহোত উপর তক হাত হ্যায় উসকা। তুঝে ফির মওকা মিলেকা আগর উসকে হাত শিরপে হোগা তো। নেহি তো উস এরিয়া মে হাম কভি নেহি ঘুস পায়েঙ্গে। অউর দেখ, এইসা ভি হো সকতা হ্যায় কে ইয়ে ব্যাগ হো হি না।"

কপাল মন্দ রামানুজের। তার ব্যাগটাই। ভজহরির চেনা কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছে, তার লাভারের। মন ভেঙে গেল রামানুজের। দাশরথির আড্ডায় নিয়ম, যেদিন যে কোনও আয় করবে না, টাকাও পাবে না। কিন্তু সেদিন রামানুজকে পাঁচশো টাকা হাতে ধরে দিতে চেয়েছিল দাশরথি। সে নেয়নি। ভিক্ষার টাকা সে কেন নেবে? দাশরথি বুঝিয়েছিল কাল আরও বেশি হবে। কাল তার সঙ্গে একজন সেয়ানা আর তিনজন টিংবাজকে বাছাই করে সে নিজে দেবে। কারও ওজর আপত্তি শুনবে না।

পরের দিন আর দাশরথির ডেরায় যাওয়া হয়নি রামানুজের। পরের দিন কেন, আর কোনও দিন যাওয়া হয়নি।

চেতলার খোলায় ফিরেই বুঝেছিল কিছু একটা গণ্ডগোল। সব চুপচাপ। একটা ঘরেও আলো জ্বলেনি। সোজা চলে গেল গুরুমার ঘরে। ঘরে ভিড়। গুরু মা নেই। গোলাপ মাটিতে বসে হাউহাউ করে কাঁদছে। তাকে ঘিরে বাকি হিজড়েরা কেউ কাঁদছে, কেউ মাথা গুঁজে বসে আছে। দুইদিন হল গুরুমা নেই। কোথায় গেছে, গোলাপ ছাড়া কেউ জানে না। কাঁদতে কাঁদতে গোলাপ যা বলল তার একটাই অর্থ। গুরুমা আর ফিরবে না।

গুরুমাকে ওরা খুন করেছে।

৩।

গুরুমা খুন হবার পরে গোলাপ চেতলার খোলার সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। খুব স্বাভাবিকভাবেই রামানুজের ক্ষমতাও একধাপে বাড়ল অনেকটাই। এখন সে গোলাপের ঘরে থাকে, আর গোলাপ দখল নিয়েছে গুরুমার ঘর। গুরুমাকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে। অন্তত এমনটাই গোলাপ সবাইকে বলেছে। বডি আসেনি।

এখন রামানুজকে আর দাশরথির দলে যেতে হয় না। তার অন্য দায়িত্ব পড়েছে। বিভিন্ন মেলায়, পিরের দরগায় হিজড়াদের নিলাম বসে। নানা বয়সের হিজড়াদের সাজিয়েগুজিয়ে গুরুমা-রা বসেন নিলামের আশায়। নিলাম হয় তালি মেরে। তালির পর তালি। এক তালি মানে এক হাজার, দুই তালি দুই হাজার। সাধারণত নাগিনরাই বিক্রি হয় এই বাজারে। সবচেয়ে বড়ো বাজার দিল্লির জামা মসজিদের ধারে হরে বাবা কা মাজার। গরিব নাগিনদের তৈরি করা হয় চেতলার খোলে, তারপর রামানুজ তাদের দিল্লি নিয়ে গিয়ে নিলামে বেচে দেয়। সুশ্রী নাগিনদের দর পনেরো থেকে কুড়ি হাজার। বদলে সেই নাগিনের মালিক তার দেহের উপরে পুরো অধিকার পায়। একদিন সেই শখ মিটে গেলে আবার তাকে দাঁড়াতে হয় নিলাম বাজারে নতুন খদ্দেরের জন্য। এই গোটা র‍্যাকেটটাই পুলিশকে ঘুষ খাইয়ে চলে। রামানুজ এখন জেনে গেছে কোন দেবতা ঠিক কোন ফুলে তুষ্ট। জানে কোন নাগিনকে কম দামে কিনে নিয়ে পরে তিন গুণ দামে বিক্রি করা যাবে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে হিজড়া খোলের আয় আগের প্রায় ডবল হয়ে গেল। আগের গুরুমা লাভের বেশিরভাগ অংশ নিজের জন্য রাখত। গোলাপ তা করে না। রামানুজও না। লাভের একটা বড়ো অংশ খোলের হিজড়াদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। আর বাকিটা যায় প্রশাসন আর হিজড়ে মাফিয়াদের মুখ বন্ধ রাখতে।

গুরুমা মারা যাবার ঠিক এক বছর বাদে একদিন রাতে আবার রামানুজের ঘরে টোকা পড়ল। গোলাপ। কিন্তু এই সময়? ফিসফিস করে গোলাপ বলল, "গুরুমা কা মোগা ঠিকছে। আয়।" গোলাপ এখন নিজে গুরুমা হয়ে গেছে। তাও সে আগের গুরুমাকে ভোলেনি। কিন্তু সেই গুরুমার মোগা এতদিন বাদে এখানে কী করছে? রামানুজ গোলাপের পিছন পিছন চলল প্রায় অন্ধকার বারান্দা দিয়ে। গুরুমার ঘরের দরজা ভেজানো। খুলতেই দেখল সামনে চেয়ারে বসে আছে সেই লোকটা, যাকে বছরখানেক আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিল রামানুজ। দেবাশিস না কী যেন নাম। লোকটার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি। এ হাসি এ পাড়ায় কেউ হাসে না। যেন বড্ড সরল, বড্ড বাচ্চাদের মতো, কোনও ঠাকুর দেবতার হাসি।

"তুমিই রামানুজ?"

"জি।"

"তোমার কথা খুব শুনতে পাই। তুমি এখন ফেমাস হে। এক বছরে চেতলা খোলের ভোল বদলে দিয়েছ।"

গোলাপ পাশ থেকে বলল, "এ আসার পরে আখখার একদম বড়িয়াসে চলছে। বড়কা বড়কা দশ পাতিয়া নিয়ে আসছে এই চিলকাটা। হুজুরের লোকান্তির পরে এই চালাচ্ছে পুরো আখখার।"

"যাক ভালো খবর। বাচ্চা বয়সেই ব্যবসা ধরে নিয়েছে। এই তো চাই। কিন্তু গোলাপ আমার কাজের কী হল? এক বছর সময় দিয়েছিলাম। কোনও খবর পেলে?"

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যেমন হয় গোলাপ সেভাবে গুটিয়ে গেল। পাশাপাশি মাথা নাড়ল। পায়নি।

"তুমি খোঁজ করেছিলে? না ভেবেছিলে অভয় মরেছে আর তার সঙ্গে আমিও সবকিছু ভুলে গেছি", গলা চড়তে থাকে ভদ্রলোকের। "হাতে আর সময় নেই। বড়োজোর দুই বছর। এদিকে এখনও জিনিসটার কোনও পাত্তাই নেই!"

গোলাপ মিনমিন করে একেবারে স্বাভাবিক গলায় বলে, "এত পুরনা বাক্সা। তাও কোন খোলের জানা নেই। হামি নজরে রাখছি। খবর পেলেই যাই। কিন্তু কাম হয় না। বাক্সা আর ভূত একসঙ্গে গায়েব। ছে মাহিনে পহলে কা কিসসা শুনা আপনে?"

"কোন কিসসা?"

"খিদিরপুরওয়ালা। পেপার মে ভি তো আয়া থা।"

"শুনেছি। ঘটনা শুনে যা মনে হয় এ সেই ভূতের কীর্তি ছাড়া কিছু না। তুমি সেই খোলায় লোক পাঠিয়েছিলে?"

"হামি নিজে গিয়েছিলাম।"

"আচ্ছা, তারপর? কিছু পেলে?"

"কুছ নেই। সব সাফসফা। যো কুছ ভি থা, পুলিশ লে গয়া।"

"আমিও গেছিলাম। অনেক পরে..." খুব ধীরে ধীরে বলল লোকটা, "ঠিকই বলেছ। কিছুই পাওয়া যায়নি। বাকিরা এখন ওই খোলায় থাকতে ভয় পাচ্ছে।"

"উও তো হবেই বাবু। তিন-তিনটে মওত। তাও একদম অচানক।"

"শোনো, যে কারণে তোমার কাছে আসা, আমি আমার মতো করে খোঁজ চালাচ্ছি। একা না, একজন পুলিশ আর এক প্রাইভেট ডিটেকটিভকেও কাজে লাগিয়েছি। ওরা অবশ্য আসল জিনিস কিছু জানে না। তবে এবার যার জন্য এসেছি সেটা ওদের দিয়ে হবে না। ভালো নাগিন চাই তার জন্য। টোপ দিতে হবে।"

"কিঁউ? কেয়া হুয়া?"

"কিছুই তো খোঁজ রাখো না। সেদিন ওই ঘটনার সময়, ওই তিন হিজড়ে ছাড়া খোলায় আরও একজন ছিল। গুরুমা-র মোগা। সে যে কেমন করে বেঁচে গেল কে জানে। পুলিশকে একটা বয়ান দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমার ধারণা সে লোক এর বেশি অনেক কিছু জানে। ওর থেকে কথা বার করতে হবে। আমি খুঁজে বার করেছি লোকটাকে। এমনিতে বলবে না। ভালো নাগিন চাই ওকে বশ করতে।"

"তো ফিকর কী আছে? নিয়ে যান যাকে খুশি।"

"যাকে খুশি? বেশ, তবে ওকে দাও। আমার ওকেই চাই। ওকে নিতেই আমি এসেছি।"

এটা গোলাপ কল্পনাও করতে পারেনি। সে লোকটার পায়ে পড়ল, বুক চাপড়াল, বোঝাতে চেষ্টা করল রামানুজ চলে গেলে চেতলা খোল কানা হয়ে যাবে। লোকটা অনড়।

"তুমি জানো গোলাপ, যে কাজে নেমেছি, তাতে যদি সফল হই আমরা, তবে এই দুই-তিন মাসের ক্ষতির একশো গুণ লাভ করবে তুমি। আপত্তি করে লাভ নেই। মেনে নাও।"

গোলাপ কিছুতেই মানবে না। রামানুজকে ছেড়ে দিলে তার চলবে না। এই এক বছরে রামানুজ তাকে আলসে করে দিয়েছে। গোটা খোলার ভার বকলমে রামানুজ সামলায়। সে চলে গেলে দুইদিন বাদে খোলাও উঠে যাবে। এবার সে কাঁদতে আরম্ভ করল। শেষে আর উপায় না দেখে লোকটা বলল, "ঠিক আছে। ছাড়তে হবে না। আমি তেত্রিশ নম্বরকে খবর পাঠাচ্ছি, তুমি আমার কাজে বাধা দিচ্ছ। তারপর দেখি তোমার খোলা আর কতদিন টেকে।"

এই তেত্রিশ নম্বর কী জিনিস রামানুজ জানে না। শুধু এটা জানে এর পর আর একটাও কথা বলেনি গোলাপ। শুধু হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে ছিল। সকাল হয়ে আসছে।

"মিনিমাম জামাকাপড় একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে আমার সঙ্গে চলো।" রামানুজের দিকে তাকিয়ে বেশ নরম গলাতেই বলল লোকটা।

চন্দননগরে লোকটার বাড়িতে দুজন যখন ঢুকল, ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে।

পেটভরে খেয়ে সারাদিন ঘুমোল রামানুজ। লোকটা অফিস গেছে। বলে গেছে বাইরে না বেরোতে। যতই দরকার হোক। সন্ধে হবার আগেই ঘরে

ঢুকল লোকটা। রামানুজকে দেখে একগাল হেসে বলল, "ঘুমিয়েছ? পেট ভরা?" সে নিজে যে সারারাত জেগে, তার ক্লান্তি কোথাও নেই।

রামানুজ কথা না বলে ঘাড় নাড়ল।

"আমায় খুব বাজে লোক মনে হচ্ছে, তাই না? জানি। আমি তোমার জায়গায় থাকলে আমারও মনে হত। তোমায় সব খুলে বলি। বাংলা বোঝো তো?"

আবার ঘাড় নাড়ল রামানুজ।

"বেশ। শোনো, আমাদের একটা এনজিও আছে। আমরা হিজড়া আর বেশ্যাদের নিয়ে কাজ করি। তুমি বলবে সে তো সবাই করে। এমন শয়ে শয়ে এনজিও আছে। কিন্তু না, আমরা হিজড়াদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়ি না। আমরা হিজড়াদের সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য লড়ি না। আমরা চাই না কোনও হিজড়া সমাজের ভিক্ষায়, কৃপায় বেঁচে থাকুক। আমরা এমন একটা সমাজ গড়তে চাই, যেখানে গোটা সমাজ তোমাদের কৃপায় বেঁচে থাকবে। অনেক হয়েছে এইসব নেকুপুষুগিরি। এই পাইয়ে দাও। ওই পাইয়ে দাও। চোখের জল ফ্যালো। সম্মেলন করো। তাতে গুষ্টির মিষ্টি ধ্বংস করে দেব অবধি লাভের বেলায় ঘণ্টা। ঘেন্না লাগে না তোমার?"

আবার মাথা নাড়ল রামানুজ। লাগে। কিন্তু কী করা?

"আমরা বিশ্বাস করি ডাইরেক্ট অ্যাকশানে। অনেক লোকভুলানো কথা হয়েছে। এবার কাজ। তোমাকে এখনই সবটা খুলে বলতে পারছি না, তবে এটা বিশ্বাস রেখো আমরা আসলে একটা যুদ্ধে নেমেছি। গোপন যুদ্ধ। তথাকথিত ভদ্র নারী পুরুষদের বিরুদ্ধে। আর আমরা যদি জিতি, তবে এমন দিন আসবে যখন সারে সারে নারী আর পুরুষদের দল আমাদের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে বলবে, "ক্ষমা করো। এতদিনের অবিচার, অত্যাচার, অনাচারের জন্য ক্ষমা করো। আর আমরা বলব... না"

উত্তেজনায় গলার শিরা ফুলে উঠেছে লোকটার। চোখ লালচে। পাশে রাখা জলের বোতল থেকে এক ঢোঁক জল খেল লোকটা। আবার শুরু করল, "অভয়, মানে তোমাদের গুরুমা ছিল আমাদের বড়ো সৈনিক। জানি না তোমরা ওকে কতটুকু জানো। খুব বড়ো মনের মানুষ ছিল। একটাই সমস্যা ছিল। সেক্সের ব্যাপারে নিজেকে কনট্রোল করতে পারত না। তোমাদের খোলে সবাই জানত আমি ওর যোগা। ও-ই রটিয়েছিল। ভাবলে অবাক হবে, কোনও দিন আমার সঙ্গে কোনও ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ ছিল না ওর। আমি যেতাম আমাদের সমিতির কাজ নিয়ে আলোচনা করতে।"

সমিতির আলোচনা এত রাতে? এত গোপনে? কেন? কেন এই লোকটাকে সবাই এত ভয় করে? তেত্রিশ নম্বর কে? নানা প্রশ্ন জাগতে থাকে রামানুজের মনে। তার আগেই লোকটা বলে উঠল, "তোমার মতো ব্রাইটদের খুব দরকার আমাদের সমিতিতে। আমার খুব ইচ্ছে তোমায় দলে ঢোকাই। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। বিশ্বাসের পরীক্ষা। আনুগত্যের পরীক্ষা। আনুগত্য বোঝো?"

"হ্যাঁ। নিষ্ঠা।"

"বলতে পারো। তোমাকে একটা কাজ দেব। কেউ জানবে না। গোলাপও না। খিদিরপুরের সেই মোগা, যার কথা বলেছিলাম, এখনও কোনও নতুন খোলায় যাচ্ছে না। ভয় পেয়েছে বোধহয়। কিন্তু বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেলে ভুলতে পারে না। ছেলেটা চন্দননগরের। কিন্তু কাজ করে কলকাতায়, এক শাড়ির দোকানে। সকালের যে ব্যান্ডেল লোকালটা সাড়ে নটায় হাওড়ায় ঢোকে, সেটাতে নামে। নেমেই সিধা টয়লেটে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে পাশেই রেলের ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে গোটা একটা সিগারেট শেষ করে তারপর কাজে যায়। তোমাকে কয়েকদিন সেখানে দাঁড়াতে হবে। ওর চোখে পড়বেই। তোমার খোলার নাম, ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে বলবে না। ওর যা চ্যানেল, ধরে ফেলবে। চেষ্টা করবে ও যেন তোমার পারিক হয়ে যায়। বাড়িতে পাগল মা ছাড়া কেউ নেই। অসুবিধা হবার কথা না। ওর সঙ্গে মিশবে। প্রথমেই না, ধীরে ধীরে ও নিশ্চয়ই খিদিরপুরের কথা বলবে। যা বলবে শুনে যাবে। এমন প্রশ্ন করবে না, যাতে ওর মনে সন্দেহ হয়। পারলে মোবাইলে গোপনে রেকর্ড করে রাখবে। পরে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েই ডিলিট করে দেবে। আমার নম্বর সেভ করে রাখবে না। মুখস্থ করে রাখো। আর বিপদে পড়লে আর-একটা নম্বর দিলাম। সেখানে কল করবে। কেউ ধরবে না। একটা আননোন নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কল আসবে। যা বলার বলবে। কিছু শুনতে চাইবে না। লাভ নেই। উত্তর পাবে না। আর হ্যাঁ, কপালগুণে আমরা দুজনেই চন্দননগর থাকব। রাস্তাঘাটে দেখা হতেই পারে। স্রেফ না চেনার ভান করে চলে যাবে। ঠিক আছে? দ্যাখো, আমি জানি এই কাজে রিস্ক আছে। কিন্তু সফল হলে গোটা পৃথিবী তোমার পায়ের তলায়। একবার যদি ভূত ঠিকঠাক আমাদের হাতে এসে যায়, তবে দেখো সেই ভূত নিয়ে কেমন তাণ্ডব দেখাব সবাই মিলে। বলো, রাজি?"

"হ্যাঁ।"

রামানুজের সামনে মোবাইলের স্ক্রিনে একটা ছবি দেখিয়ে লোকটা বলল, "এই যে তোমার হবু পারিক। নাম বিশ্বজিৎ দে। বাড়ি চন্দননগরের বোড় পঞ্চাননতলায়। মুখটা ভালো করে দেখে রাখো। হাওড়া স্টেশনে হাজার লোকের মাঝে চিনে নিতে হবে তো!"

৪।

খিদিরপুরে তিন বৃহন্নলার নৃশংস হত্যাকাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা: গতকাল খিদিরপুরের "হিজড়া খোল" নামে পরিচিত বৃহন্নলাদের বসতিতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। খোলার গুরুমা ইউনুস হিজড়ে গতকাল দুপুর একটা নাগাদ আচমকা উন্মাদের মতো হয়ে

খাটের তলা থেকে একটা বড়ো রামদা নিয়ে খোলের অন্য এক হিজড়া চামেলী হিজড়ানির দিকে তেড়ে যায়। কেউ কিছু বোঝার আগেই চামেলীর ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা হয়ে যায়। তারপরেই সে বাকি দুইজন হিজড়া মাহামুদান আর জহরীকে আক্রমণ করে। তারা যথাসম্ভব নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। দেহের বিভিন্ন জায়গায় গভীর আঘাত লাগে তাদের। কলকাতার এক নামকরা বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরে তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করা হয়। সেই সময় ওই খোলে এই চারজন ব্যতীত অন্য একজনও ছিলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই ব্যক্তি জানিয়েছেন উন্মত্তের মতো তিনটি খুনের পরই ইউনুস অজ্ঞান হয়ে যায়। পুলিশ অকুস্থলে এসে তাকে গ্রেপ্তার করলে ইউনুস গোটা ঘটনা অস্বীকার করে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও অবস্থাগত প্রমাণের উপরে ভিত্তি করে পুলিশ ইউনুসকে গ্রেপ্তার করেছে। মৃতদেহগুলোকে পোস্ট মর্টেমে পাঠানো হয়েছে।

উত্তরখণ্ড— সংকাশ

প্রথম পর্ব— বিষণ্ণ খড়ের শব্দ

১।

সেই রাতে চুঁচুড়ায় আর থাকা হল না তারিণীর। ফিরতি ট্রেনেই আবার কলকাতা চলে আসতে হল। কাজ বড়ো বালাই। এই জাবুলনদের সঙ্গে ফ্রিম্যাসনদের অনেকে জড়িত এটা স্পষ্ট। তা না হলে সাইগারসন, বঙ্কিমবাবু আর প্রসন্নকুমার মিলে একই কথা বলতেন না। প্রিয়নাথ অস্বাভাবিক চুপ। যেন তাঁর ভিতরে একটা বিরাট ঝড় তোলপাড় চালাচ্ছে। মুখমণ্ডল গম্ভীর, শান্ত। কিন্তু তারিণী জানে এই শান্ত ভাব বড়ো কোনও ঝড়ের আভাস মাত্র। হাওড়া স্টেশনে নেমে প্রিয়নাথ তারিণীকে বললেন, "তুমি কি এখান থেকেই আপিসে ফিরে যাবে? যদি যাও তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। কিছু কথা তোমাকে এই মুহূর্তে জানানো দরকার। পরে দেরি হয়ে যাবে। আপিস এখন ফাঁকাই আছে তো?"

"একপ্রকার বলতে পারেন। থাকলে বড়োজোর শৈল থাকবে। কিন্তু আমার ক্লায়েন্ট এলে সে বেরিয়ে বাইরে অপেক্ষা করে।"

"ঠিক আছে তবে। গাড়ি ঘোরাও।"

ক্লাইভ স্ট্রিটে তারিণীর আপিসের সামনে যখন গাড়ি দাঁড়াল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দুটো লোক তখনও মস্ত মোটা একটা পাইপে পিচকারির মতো করে রাস্তার অনেক দূর অবধি জল দিয়ে ধুচ্ছে। এই এক নতুন। আগে শুধু ভোর চারটেতে গিন্নিরা গঙ্গায় নাইতে যাবার আগে ভিস্তিরা মশকে করে জল ছিটাত। এখন ভিস্তির পাট উঠেছে। সে জায়গায় এই পাইপ দুবেলা রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। তাতে সুবিধা কতটা হয় জানা নেই। রাস্তায় সর্বদা একটা কাদা কাদা ভাব।

অফিসের দরজা খোলাই ছিল। শৈল কোথাও একটা যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারিণীকে দেখেই বলল, "তুমি এয়েচ ভাই? বেশ হল। তোমার কথাই ভাবছিলেম। জরুরি দরকার। এখুনি আমায় বেরুতে হচ্চে। তবে চলে আসবখন। রাতের খাওয়া বেড়ে রেখেচি। একসঙ্গে খাওয়া যাবে।" বলে প্রিয়নাথের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে একটা প্রশ্ন করল, "দারোগাবাবু, যে এককালে আপনার উপকার করেছিল, সে যদি অন্য কারও মহাক্ষতিতে লিপ্ত হয়, তবে আপনি কী করবেন?"

প্রিয়নাথ এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে ঈষৎ আমতা আমতা করে বলল, "অবশ্যই তাকে বাধা দেব। তাকে বুঝিয়ে বলব।"

"আর সে বুজতে না চাইলে?"

"তাকে আইনমাফিক সাজা দেব।"

"আর যদি সে আইনের হাতের বাইরে হয়?" বলে একটু হেসে শৈল আর উত্তরের অপেক্ষা করল না। "আপনারা আলাপ করুন। আমি একটু নৈশবিহারে যাই", বলে বেরোবার উদ্যোগ করল।

"তা বলি যাচ্চ কোথায়?" তারিণী শুধাল।

"একটা হেস্তনেস্ত করতে। ফিরে বলব।" খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল শৈল।

শৈল বেরিয়ে যেতেই প্রিয়নাথের মুখ আবার গম্ভীর হয়ে গেল। পাশেই একটা বেতের মোড়ায় বসে পড়ল ধপ করে। তারিণী হাঁ হাঁ করে উঠল। তাকে বারবার বলল ড্রিসকলের দেওয়া চেয়ারে বসতে। প্রিয়নাথ হাত নেড়ে মানা করল। হাতের ইশারায় তারিণীকে বলল দরজা ভেজিয়ে দিতে। চারিদিকে বড্ড গুমোট করেছে। বৃষ্টি নামতে পারে। তাও তারিণী দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ঘরের কোনায় রেড়ির তেলের একটা কুপি জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই নিজে বলতে থাকল প্রিয়নাথ মুখুজ্জে, "আজ সাইগারসন সাহেবের সামনে মুখ খুলিনি। হয়তো খোলা উচিত ছিল। কিন্তু সাহসে কুলায়নি। ভেবেছিলাম কাউকে জানাব না। কিন্তু বিবেক। বিবেককে কি ফাঁকি দেওয়া যায়, বলো?"

তারিণী উত্তর দিল না। এইসব সময় উত্তর দিতে নেই।

"জাবুলনদের নাম আমি ছয় বছর আগেই শুনেছি। শুধু গুরুত্ব দিইনি। দেবার উপায়ও ছিল না। তাহলে আমি নিজে বিপদে পড়তাম। কাউকে যে ঘটনা জানাইনি, আজ তোমাকে বলছি। আমি তোমায় চিনেছি। জানি তুমি

আমাকে বিপদে ফেলবে না। কিন্তু এই সত্য প্রকাশ না পেলে হয়তো আরও বড়ো বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আর সেটা হলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।"

"আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।"

"তুমি দুই সাহেব দস্যু হিলি আর ওয়ার্নারের নাম শুনেছ?"

"কে না শুনেছে? সমাচার চন্দ্রিকায় নিয়মিত এদের খবর প্রকাশ পেত। আপনার সাহস ও বীরত্বে এরা ধরা পড়ে ও আইনমাফিক সাজা পায়।"

"হিলি পায়নি।"

"মানে?"

"মানে আইনমাফিক সাজা। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার সময় একদিন হিলি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি দেখা করি। সে একান্তে আমার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু তার কথার মর্মোদ্ধার করতে পারিনি তখন। এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।"

"কী বলেছিল হিলি?"

"বলেছিল জাবুলনরা নাকি কলকাতায় এসে গেছে। বড়োজোর আর বছর সাতেক। তারপরেই আসবে চরম আঘাত। সেটা কী আর কীভাবে আসবে আমি জানতে চেয়েছিলাম। হিলি বলেছিল সে সব বলবে। জবানবন্দি দেবে। কিন্তু আমার কাছে না। পুলিশ কমিশনারের কাছে। এটাও বলেছিল তার কাছে এমন এক অস্ত্র আছে, যা প্রয়োগ করলে এক মাসের মধ্যে পৃথিবী থেকে মানুষ উধাও হয়ে যাবে। সেটা কী আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেনি। বারবার বলছিল সে কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"তারপর?"

"তারপরের ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। আচমকা একদিন হিলিকে বোম্বেতে নিয়ে যাবার নির্দেশ এল। কারণ জানি না। শুনলাম বোম্বে যাবার পথে হিলি নাকি পালাবার চেষ্টা করেছিল। আবার তাকে ধরে এনে আদালতে হাজির করা হয়েছে। সাক্ষী দিতে আমাকেও বোম্বাই যেতে হল। আর গিয়ে যা দেখলাম..."

"কী দেখলেন?"

"সাক্ষীর কাঠগড়ায় যে দাঁড়িয়ে আছে, সে আর যে-ই হোক, হিলি না। আমি নিজের হাতে হিলিকে ধরেছিলাম। প্রেসিডেন্সি জেলে কয়েকবার দেখা করতে গেছি। হিলির সঙ্গে সে ব্যক্তির মিল আছে ঠিকই, কিন্তু তাকে হিলি সাজানোর প্রাণপণে চেষ্টা হয়েছে। চোয়ালের কাছে কাটা দাগ, কানের লতির নিচের অংশ

নেই, মানে আইডেন্টিফায়িং মার্কস সব ঠিক আছে। কিন্তু লোকটাই বদলে গেছে বিলকুল।"

"আপনি কিছু বলেননি?"

"বলতে গেছিলাম। কমিশনার সাহেব বারবার বললেন আমি ভুল বলছি। শেষে ভয় দেখালেন। আমার চাকরি যাবে। আর ব্রিটিশদের অধীনে কাজ মানে তো জানোই। আমি চুপ করে গেলাম। বদলে প্রোমোশন জুটল। খ্যাতি জুটল।"

"হিলি... মানে যাকে হিলি হিসেবে ধরা হল সে-ই বা কিছু বলল না কেন?"

"তাও জানি না। বোম্বে নিয়ে যাবার পরে শুধু হিলিকে চিহ্নিত করা ছাড়া অন্য কোনও কাজে আমায় রাখা হয়নি। এমনকি ওয়ার্নারের কাছেও ঘেঁষতে দেয়নি আমাকে। আমাকে অন্য কেসের দায়িত্ব দেওয়া হয়।"

"জাবুলন বিষয়ে আপনার নিজের কী ধারণা?"

"ধারণা একটাই। এরা যেই হোক, এদের হাত অনেক দূর অবধি ছড়ানো। ইংরেজ সরকারের মধ্যেই এরা বাসা বেঁধে আছে। কেউ জানে না এরা কারা। তাই কোনও সরকারি পুলিশ এদের কিচ্ছু করতে পারবে না। জানি না এরা আমার ওপরেও নজর রেখেছে কি না। পারলে তুমিই পারবে। কারণ তোমার কেউ চেনে না। তোমার গতিবিধি অবাধ। সাইগারসন সাহেব ঠিক লোককেই ঠিক দায়িত্ব দিয়েছেন।"

"এখন আমার কর্তব্য?"

"তুমি নিজের মতো তদন্ত চালাও। খরচ নিয়ে ভেবো না। যা দরকার হবে আমার কাছে চলে আসবে। আমি সাধ্যমতো করব। শুধু টাকাপয়সা কেন, অন্য সাহায্যের দরকারেও আমি তোমার পাশে আছি।"

"কিন্তু..."

"কোনও কিন্তু না তারিণী। আমার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। সরকারি চাকরি আমার হাত পা বেঁধে রেখেছে। তুমি এটা আমার প্রায়শ্চিত্ত বলে ধরে নাও।"

প্রিয়নাথ রওনা হতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হল।

সে রাতে শৈলচরণ ফিরল না।

২।

পরের দিন, এমনকি তার পরের দিন সকালেও যখন শৈল এল না, তারিণী রীতিমতো চিন্তায় পড়ল। এমন তো হবার কথা না! থিয়েটার কোম্পানি ছেড়ে

দেবার পর এমন খুব কমই হয়েছে যে শৈল তার আপিসঘরের বাইরে থেকেছে। সেখানে দুই রাত হয়ে গেল তার কোনও পাত্তা নেই। তাহলে কি সে দেশের বাড়ি ফিরে গেল? শৈল পরনের ফতুয়া আর ধুতিটা ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়নি। একটা কাঠের বাক্সে টাকা রাখা থাকে। দুজনের যা জমে। গুনে দেখল তারিণী। দশ টাকা কম। এত টাকা শৈলর কী কাজে লাগল? টাকাপয়সার ব্যাপারে শৈল খুব সজাগ। দরকার ছাড়া একটি পাইপয়সা খরচ করে না। বাক্সেই একটা সাদা কাগজ ভাঁজ করে রাখা। একটা বিল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেসের। দুই দিন আগের তারিখ। সেদিন থেকেই শৈল নিখোঁজ। বিলে লেখা, Printing and Binding cost (100 copies)– 10 rupees। দশ টাকা খরচ করে কী ছাপিয়েছে শৈল?

তারিণী সারাদিন ঘুরল শহরের হাসপাতালগুলোতে। কোনও খবর নেই। মন শক্ত করে সরকারি লাশকাটা ঘরেও খবর নিল। নতুন তিনটে লাশ এসেছে ঠিকই, কিন্তু কোনোটাই শৈলর না। জলজ্যান্ত মানুষটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। হাঁড়িতে চাল আর আলু চাপিয়ে তারিণী ভাবতে বসল।

সেদিন প্রিয়নাথের সামনে অদ্ভুত প্রগলভ হয়ে উঠেছিল শৈল। এ তার চরিত্রের সঙ্গে যায় না। কথা বলতে বলতে হাত নাড়াচ্ছিল। আর হাতে ছিল... এবার তারিণীর আবছা মনে পড়ছে। শৈলর ডান হাতে একটা পাতলা বই। বটতলার বই যেমন হয়। বইটা তার লেখার টেবিলে ছিল। বেরোবার ঠিক আগে টেবিল থেকে বইটা নিয়ে সেটাকে ফতুয়ার পকেটে পুরে নিয়েছিল সে। ঘরের কোণে ছোট্ট একটা টেবিল পেতে শৈল লেখালেখি করে। ওদিকটায় বিশেষ যায় না তারিণী। আজ বাধ্য হয়ে গেল। টেবিলে যথারীতি বেশ কিছু হ্যান্ডবিলের খসড়া ছড়িয়ে আছে। গণপতির ম্যাজিকের, পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের। একপাশে দোয়াত, তাতে কালি পুরো ভরা। মানে ফিরে এসেই আবার লেখার পরিকল্পনা ছিল। সেই দোয়াত চাপা একটা স্টেটসম্যান পত্রিকা দেখে বেশ চমকেই উঠল তারিণী। এই পত্রিকা সচরাচর রাখা হয় না। তাদের দুজনের কেউই ইংরাজিতে তেমন দড় না। পত্রিকার ভাঁজ করা অংশে একটা বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল তার। থিয়েটারের বিজ্ঞাপন। চারিদিকে লাল পেনসিল দিয়ে গোল করা। বিজ্ঞাপনে লেখা–

Please note the change!

STAR THEATRE.

Telephone No. 364.

SATURDAY, 30 TH MAY, AT 9. P.M.

The Beautiful Classical Operetta

ANNODA MANGAL.

Followed by the Brilliant Pantomime

EKAKAR

SOCIAL CHOAS!

CONCLUSION

Grand Transformation Scenery!

NEXT-DAY, SUNDAY, AT CANDLE-LIGHT,

Bankim Chandra's CHANDRASEKHAR.

AMRITA LAL BOSE,
Manager.

শৈল থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে, এমনই সে জানত। বিশেষ করে সেই ঘটনার পর। তাহলে এই বিজ্ঞাপন কেন? 'একাকার'-এর তলায় লাল পেনসিল দিয়ে দুটো দাগ। টেবিলের তলায় ঝুঁকতেই যা খুঁজছিল পেয়ে গেল তারিণী। খয়েরি মলাটে মোড়া দড়িবাঁধা একটা প্যাকেট। সেটা খুলতেই বেরিয়ে এল এক বান্ডিল বই। সদ্য ছাপানো। উলটেপালটে দেখল তারিণী। শৈলর লেখা নাটক। নাটক না বলে প্রহসন বলাই ভালো। এমন অদ্ভুত প্রহসন লিখতে গেল কেন শৈল? তারই আপিসের ঠিকানা, এদিকে তাকেই কিছু না জানিয়ে! কিছুই মাথায় ঢুকছিল না। বার তিন-চার সে নাটকটা পড়ল। মোটেই খুব একটা উৎকৃষ্ট কিছু না। তবে শৈলর লেখায় একটা চাপা যৌনতা থাকে। এখানে সেটা বেশ প্রকট। নাটকের নামটাও অদ্ভুত, "বিষম ভূত ও পুষ্পসুন্দরীর পালা"। টেবিলে আরও একটা ছবি চোখে পড়ল তারিণীর। আগে এই ঘরে এমন ছবি সে দেখেনি। ছাপাই ছবি। পাথুরে ছাপাই। এক অসামান্যা রূপসি, এক বৃদ্ধা আর এক শিশু। প্রত্যেকেই অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। তলায় বাংলায় লেখা, "ভারত ভিক্ষা"। তারিণীর অভ্যস্ত চোখ গোপন চিহ্নগুলো মিলিয়ে নিতে চাইল। কিছু পারল। কিছু পারল না। কিন্তু এই ছবি এখানে কেন? ছবির তলায় লেখা,

ভারত ভিক্ষা।

Designed and Published by Calcutta Art Studio। ছবিটা ভাঁজ করে একটা বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল তারিণী। তারপর নিতান্ত বেখেয়ালেই বইগুলো গুনতে শুরু করল। আটানব্বইটা। নিশ্চিত হিসেবে ভুল হয়েছে। আবার গুনল। হিসবে ভুল নেই। আটানব্বইটাই আছে। কিন্তু সেদিন শৈল তো তার সামনেই একটা বই সঙ্গে নিয়ে গেছিল। আর-একটা গেল কোথায়? হিসেবের কড়ি তো বাঘে খাবে না। তারিণী তন্নতন্ন করে ঘর খুঁজল। ঘরে

নেই। তাহলে নিশ্চিতভাবে আর-একটা কপি শৈল আগে থেকেই অন্য কাউকে দিয়েছে। কিংবা প্রেসেই আছে প্রেস কপি হিসেবে। সেটা ছাপাখানায় না গেলে জানা যাবে না।

তারিণী নিজের কর্তব্য স্থির করে নিল। জাবুলন পরে হবে। আগে তার নিজের বন্ধুকে খুঁজে বার করা প্রয়োজন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেসে যেতে হবে। কিন্তু সেখানে পরে গেলেও চলবে। বরং দ্বিতীয় যেখানে যাবার কথা সেটা দিয়েই শুরু করা যাক। দুপুর দুপুর সেখানে না পৌঁছালে পরে ঢোকাই যাবে না।

তারিণী স্টার থিয়েটার যাবার রাস্তাটা মনে মনে ছকে নিল।

দ্বিতীয় পর্ব— মদির আলোর তাপ

১।
বিনোদিনী ছেড়ে চলে যাবার পরে স্টারের আর সেই বাড়বাড়ন্ত নেই। কিন্তু মরা হাতি লাখ টাকা। এখনও মঞ্চ কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন অর্ধেন্দু মুস্তাফি, দানীবাবুরা। গিরিশ ঘোষ নিজে খুব কম অভিনয় করেন। নাটক লেখা, পরিচালনাতেই আজকাল বেশি ঝুঁকেছেন। স্টারের গা ঘেঁষে পান-বিড়ির দোকান, গোপন মদের আড্ডা, দেওয়ালে কালি, ঝুল, কিছুই গা করেন না। আগে দেওয়ালে পোস্টার মারার নিজস্ব স্থান ছিল। এখন একপাশের দেওয়াল জুড়ে অন্নদামঙ্গল-এর পোস্টার সাঁটা। তারিণী থিয়েটারের পাঁচপেঁচি লোকেদের বিশেষ পছন্দ করে না। আগে তাও শখ হলে যেত, কিন্তু শৈলর সঙ্গে যা হয়েছিল, তা দেখার পর আর থিয়েটারে যাবার প্রবৃত্তি হয়নি। আজ বহুদিন পরে নেহাত প্রয়োজনে তাকে এ পাড়ায় আসতে হল।

দুপুরের থেকেই স্টারে কলাকুশলীরা সবাই আসতে শুরু করে। মহলা হয়। ভিতরের আপিসঘরে রোজকার কাজকর্ম চলে। থিয়েটার হোক না হোক সবাইকে রোজ হাজিরা খাতায় সই করতেই হবে, এমনটাই ভুনিবাবুর নির্দেশ। ভুনিবাবু, মানে অমৃতলাল বসুর হাতে পড়ে ইদানীং স্টার আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। সব কিছু চলছে ঘড়ির কাঁটার তালে। তারিণী স্টারের পিছনের দরজার সামনে এসে খানিক ইতস্তত করল। আগে কোনও দিন এই পথে ভিতরে ঢোকেনি। কিন্তু নিরুপায়। দরজা খুলে খাটো ধুতি পরা একজন বার হতেই তারিণী তাকে

জিজ্ঞেস করল, "ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে একটু দরকার। তিনি এয়েচেন?"

"ও বাবা! তিনি না এলে কি আর এস্টার থিয়েটার চলে নাকি? একেবারে সোজা নাকবরাবর চল্যে যান। গিরিন রুমের পাশেই ম্যানেজারের ঘর।"

ভিতরে গুটিগুটি পায়ে ঢুকল তারিণী। চারিদিকে হেলান দেওয়া সেটের অংশ। রাংতা মোড়া তলোয়ার, জরির গয়না স্তূপ করে রাখা। ম্যানেজারের ঘরের উপরেই বড়ো করে অমৃতলালের নাম খোদাই করা। দরজা হাট করে খোলা। অমৃতলাল আলবোলার নলে মুখ লাগিয়ে তামাক টানতে টানতে চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সি এক অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন।

"কাল তোর মহলা দেখলাম, সবার সামনে বলিনি, কিন্তু ওটা কী করছিস?"

"কেন, ভুল হল কোতায়?"

"আহ! এত বয়স হল, তবু তোর এই ত-এর দোষ কাটল না? কোতায় না রে বেটি, কোথায়, কোথায়!"

"আচ্ছা, কোঠায়। এবার বলুন দিকি।"

আলবোলার নল সুদ্ধু মাথায় হাত ঠেকালেন অমৃতলাল, "তোকে শেখানো শিবের অসাধ্য। ভাগ্য ভালো তোর মুখে কোনও ডায়লগ নেই। কিন্তু চারুশীলার "আমার হৃদয়দোলা দোদুল দোলে" গানে তুই ওর পাশে ওটা কী নাচছিস? কিস্যু হচ্ছে না। আর-একবার দেখা দেখি তোর হৃদয়দোলা কেমন করে দোলে।"

মেয়েটা শুরু করতেই এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে অমৃতলাল নিজেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে দুলে দুলে নাচতে শুরু করলেন। তারিণী অবাক হয়ে লক্ষ করল সদ্যযুবতিটির চেয়ে প্রৌঢ় অমৃতলালের দেহের লাস্য যেন অনেক বেশি সরস হয়ে ফুটে উঠছে।

"বুঝলি, একেই বলে হৃদয়দোলা, এবেলা শিখে নে, নইলে... কে? কে তুমি?"

শেষ কথাটা তারিণীকে উদ্দেশ্য করেই বলা।

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রায়। বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে আসা।"

"তা বেশ। ভিতরে এসো। খেঁদি তুই যা গে। হৃদয়দোলা প্র্যাকটিস কর। আমি এক ঘণ্টা বাদে পরীক্ষা নেব।"

তারিণী ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েই রইল। অমৃতলালের টেবিলে একগাদা কাগজপত্র ছড়ানো। একপাশে আলবোলার নল, অন্যদিকে একটা চৌকো

কাটলার, পামারের হুইস্কির বোতল। আকাশে সন্ধ্যার রং লাগলেই যোগার অপেক্ষায়।

"তুমি বসতে পারো।"

"আজ্ঞে না। বসতে আসিনি। এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর খোঁজে। আপনি চেনেন। শৈলচরণ সান্যাল।"

নাম শোনা মাত্র অমৃতলাল প্রায় শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন।

"চুঁচড়োর শৈল? সেই অক্ষয় সরকারদের দলে ছিল। কলকাতায় এসে কিছুদিন ন্যাশনালে কাজ করেছিল। হ্যাঁ, তাকে চিনি বই কি। এই তো গতকালই আমার কাছে এসেছিল। সন্ধেবেলা।"

"গতকাল? আপনি ঠিক জানেন? গত পরশু নয় তো?"

"পরশু? হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে তাই হবে। মানে যেদিন সন্ধের পরে বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়েই আমার কাছে এসেছিল। হ্যাঁ, এবার আমার স্পষ্ট মনে পড়েছে। আসলে মাতাল মানুষ কিনা, দিনকাল গুলিয়ে যায় আজকাল", হাসতে হাসতে বলেন অমৃতলাল।

"কেন এসেছিল বলতে পারেন?"

"হ্যাঁ পারি। এসেছিল অদ্ভুত এক দাবি নিয়ে। তুমি ওর বন্ধু। নিশ্চয়ই জানো, স্টারের জন্য ও ইদানীং একটা প্যান্টোমাইম লিখেছিল।"

এই খবরটা তারিণীর কাছে নতুন। সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। তারিণীর মুখ দেখেই অমৃতলাল সেটা বুঝলেন।

"জানতে না। তাই তো? তোমাকে বলেনি হয়তো। একবারে চমকে দিতে চাইছিল। এই তো পরশুদিনই কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে", বলে স্টেটসম্যানের একটা পাতা এগিয়ে দিলেন তারিণীর দিকে। এই বিজ্ঞাপন তারিণীর চেনা। একটু আগেই দেখেছে।

"একাকার প্রহসন তাহলে শৈলর লেখা?"

"হ্যাঁ। আর কী দারুণ লিখেছে ভাবতেই পারবে না। ছোকরার লেখার হাত একেবারে বাঁধিয়ে রাখার মতো। শুধু একটু খামখেয়ালি এই যা। নইলে এত বড়ো সুযোগ পেয়েও কেউ হেলায় হারাতে চায়?"

"কেন? কী হয়েছে?"

"এই দ্যাখো আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয়নি। সেদিন বাদলা করেছিল, তাই সবাই আগে আগে ভেগেছে। আমি একা এই ঘরে বসে কারণবারি সেবন করছি। এমন সময় পুরো ভিজে কাক হয়ে তোমার বন্ধুটি এলেন। বললুম,
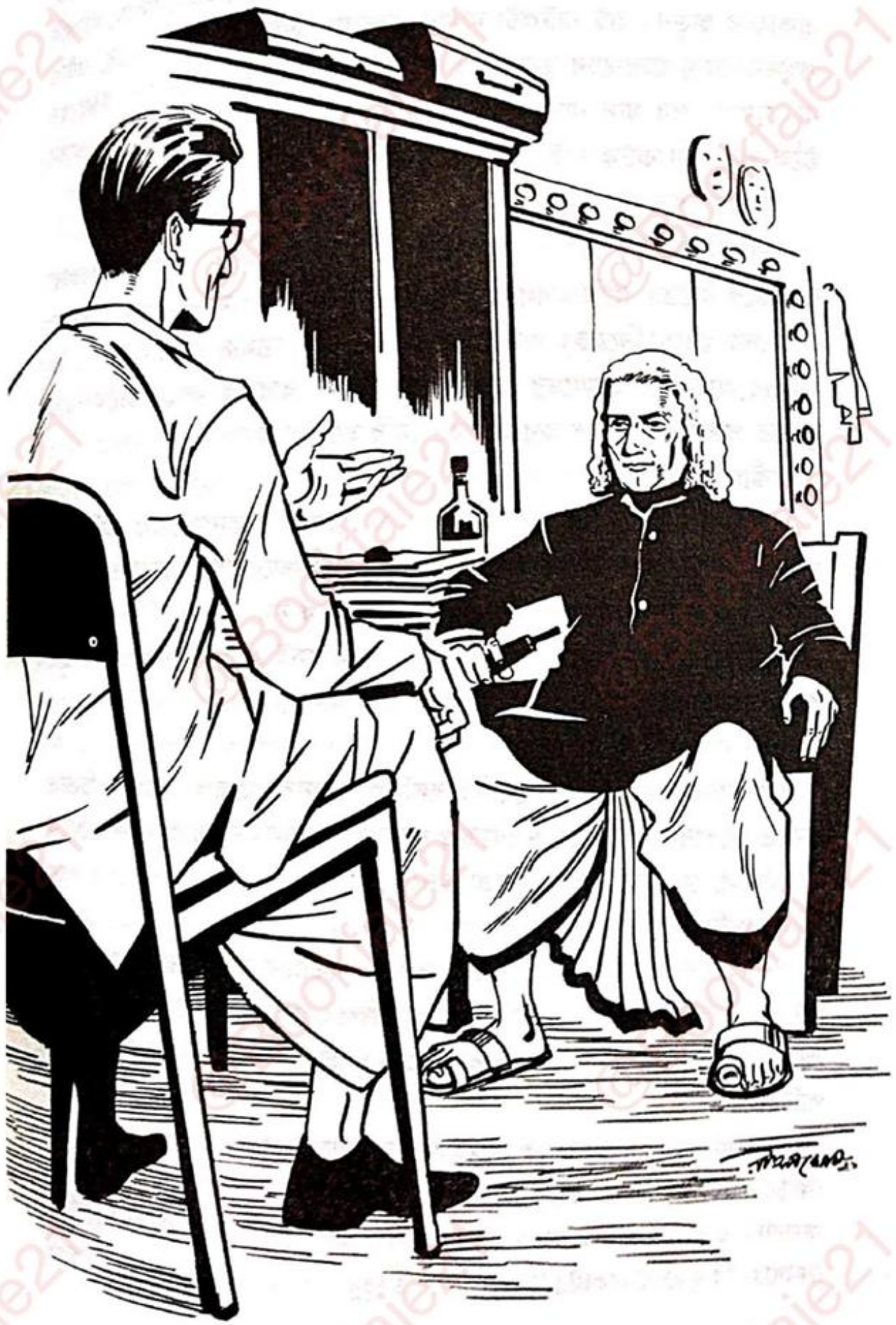
খানিক বসো। তা তার নাকি বসবার সময় নেই। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা থিয়েটারের বই বার করে বললে, এখনও দিন পনেরো সময় আছে, আপনি একাকার ছাড়ুন। এই নাটকটা নামান। বললাম, এটা কী নাটক? বলে, এটাও প্রহসন, কিন্তু ঢের ঢের ভালো। আমি রাজি হইনি। স্টারে এভাবে কাজ হয় না। মাসের পর মাস নাটক পড়ে থাকে। গিরিশবাবু নিজে বেছে দেন। এমন উঠল বাই তো কটক যাই করলে নাটক হয় নাকি?"

"তাতে শৈল কী বলল?"

"সে কি আর মানে? খানিক হাতে পায়ে ধরল। তারপর বলল 'একাকার' বন্ধ করে দিতে। আমি বললাম, বাপু, সে নাটক তো তুমি নিজেই দশ টাকায় আমাদের বেচে দিয়েছ। এবার আমাদের পাঁঠা, আমরা গোড়ায় কাটি, কি ল্যাজায়, সে তো আমাদের ব্যাপার। তখন সে বারবার বললে আমি নাকি বুঝতে পারছি না। পরে করলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।"

"কীসের দেরি?"

"আমিও ঠিক সেটাই জিজ্ঞেস করলাম। বললে একদল লোক নাকি খুব খারাপ একটা কাজ করতে যাচ্ছে। এই নাটক দেখানো হলে তারা ভয় পেয়ে যাবে। এই নাটক আগুনের গোলা, জোঁকের মুখে নুন, আরও কীসব বললে। এই নাটক একবার প্রচারিত হলে তারা নাকি সেই খারাপ কাজখানা করার আগে হাজারবার ভাববে।"

"কী কাজ? কিছু বলেছে?"

"সেইটেই তো ভেঙে বলেনি। বলছিল ভয়ানক খারাপ। আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। তবে ও নিজেও খুব ভয় পাচ্ছিল। বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছিল, যেন কেউ ওকে তাড়া করছে।"

"আপনি কী বললেন?"

"আমি শেষে একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, তোমার নাটক রেখে যাও। দিন দুই বাদে এসো। ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে এসেছিল। সেই বৃষ্টিতেই বেরিয়ে গেল। আজ অবধি তার টিকিটির দেখা পাইনি। তা তোমাকে কি দূত হিসেবে পাঠিয়েছে?"

"আজ্ঞে তা না। ও আমার সঙ্গেই থাকে। আমার আপিসে। পরশু সন্ধেবেলা বেড়িয়েছে। বলেছিল রাতে এসে একসঙ্গে খাবে। আজ অবধি ফেরেনি। কলকাতায় ওর কোনও বন্ধুও নেই। হাসপাতাল আর মর্গেও খোঁজ নিয়েছি। কোথাও কিছু নেই। তাই..."

"তোমার আপিস? কী করা হয়?"
তারিণী নিজের পরিচয় দিল।
"অ। টিকটিকি। তা পসার কিছু হয়?"
তারিণী সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি পড়েছিলেন সেই নাটক?"
"হ্যাঁ। সেই রাতেই পড়েছি। বইখানা ভিজে গেছিল বটে, তবে পড়েছি।"
"নাটক নিয়ে আপনার কী ধারণা?"
"অত্যন্ত সাধারণ মানের নাটক। প্রহসন বলা যায় কি না জানি না। যৌনতার ছড়াছড়ি। তাতে আবার রূপকথা ঢুকিয়ে কী যে করতে চেয়েছে ঈশ্বরই জানেন। আমার মতে এটা ওর লেখা সবচেয়ে দুর্বল নাটক। আমি তাও রেখে দিয়েছিলাম, গিরিশবাবুকে দেখাব বলে। কিন্তু কোথায় যে রাখলাম। কাল থেকে আবার খুঁজে পাচ্ছি না। আসলে নেশার ঘোরে... যাই হোক। এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। গিরিশবাবু এই নাটক দেখলে ছুড়ে ফেলে দিতেন।"
"দেখুন তো এই সেই নাটক কি না?" পকেটে করে একটা বই নিয়ে এসেছিল তারিণী। সেটাই বার করে দেখাল।
"দেখি? হ্যাঁ, এটাই তো। পুষ্পসুন্দরীর পালা। একেবারে খাজা নাটক ভাই। কিছু মনে কোরো না। আর তোমার বন্ধুর কোনও খোঁজ পেলে জানিয়ো। বলবে, একাকার হবেই। ও যেন আমার সঙ্গে এসে কথা বলে। ওকে দিয়ে অন্য নাটক লেখাব। এইসব পুষ্প-টুষ্প চলবে না।"
"অবশ্যই। আর এই ছবিটা আপনি আগে দেখেছেন?"
"কই দেখি?" মন দিয়ে উলটেপালটে ছবিটা দেখলেন অমৃতলাল। তারপর হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "বাপের জন্মে না। কেন, এ ছবির কী তুক?"
"না এমনিই", বলে ছবি ফেরত নিয়ে তারিণী বেরোতে যাচ্ছে, এমন সময় অমৃতলাল পিছন থেকে ডাকলেন।
"জিজ্ঞাসা করব করব করেও করতে পারছিলাম না। এখন ভাবছি করেই ফেলি। তুমি ওর এত কাছের বন্ধু যখন নিশ্চয়ই জানবে। ন্যাশনালে শৈলর সঙ্গে ঠিক কী হয়েছিল?"
তারিণী ঘুরে দাঁড়ায়। থিয়েটারপাড়ায় এসেছে আর এই প্রশ্ন আসবে না তা হতেই পারে না। সামান্য কাষ্ঠহাসি হেসে তারিণী বলল, "শৈলকে তো দেখেছেন। শরীর পুরুষের মতো হলেও মনটা একেবারে নারীদের মতো। ভগবান নারী বানাতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে ওকে পুরুষ করে ফেলেছেন। বিধাতার

ভুল। কিন্তু সে কথা সবাই মানলে তো! ন্যাশনালে একদিন রাতে তিন-চারজন পুরুষ অ্যাক্টর মিলে ওকে পুরুষ বানাতে গেছিল। তারা কেউই আজ আমাদের মদ্যে নেই। তাই নাম উল্লেখ করেও বিশেষ লাভ নেইকো।"

"বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ যে ধর্ষণের নামান্তর!"

"নামান্তর কীসের? ধর্ষণই বলুন।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? শৈল ন্যাশনালের মাথাদের জানায়। তাঁরা বিচারসভা বসান। বিচারে সাব্যস্ত হয় শৈলই নাকি থিয়েটারের পরিবেশ নষ্ট করছে। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর কিছু জানার নেই নিশ্চয়ই। আজ আসি তবে।"

তারিণী যখন দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে, তখনও অমৃতলাল অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে। হাতের আলবোলাতে টান দিতেও ভুলে গেছেন।

২।

শোভাবাজারের মোড় থেকে সামান্য এগিয়ে বাঁহাতি দক্ষিণ-পুবে গেলেই বটতলা এলাকার শুরু। প্রথমে লোহার সিন্দুক, তস্কর-প্রতিরোধক আলমারির দোকান পেরিয়ে বাঁ হাতেই সোনাগাজির সেই কুখ্যাত গলি। বছর চারেক আগে এই গলিতেই বেশ কয়েকবার আসতে হয়েছিল তারিণীকে। সেই গলির মুখেই ভাবলেশহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে জনাকয়েক বেশ্যা। যেন কারও অপেক্ষায়। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। রাত বাড়লে ধীরে ধীরে এরা ঢুকে যাবে নিজের নিজের খোলায়। বাবুদের সঙ্গে। আপিসফেরতা কিছু বাবু খুব নিবিষ্টমনে এক-একজনকে দেখতে দেখতে চলেছেন। পাকা বাজারু যেভাবে মাছ দ্যাখে। পছন্দ হলে এগিয়ে গিয়ে কানকো তুলে দরদাম করার মতো পাইপয়সার হিসেবটুকু বুঝে নিচ্ছেন। তারিণীর এসবে বেশ অস্বস্তি হয়। সে দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। সেখানে আবার আর-এক দৃশ্য। একদিকে ছোটো ছোটো পাইকারি আর খুচরা বই বিক্রির দোকান, পিছনে হাতে চালানো ট্রেডল প্রেস, আর অন্যদিকে যাত্রার দল, অপেরা, হাফ আখড়াই, পাঁচালি পোড়োদের আস্তানা। এই গরমে কেউ আর ঘরে বসে নেই। সবাই রাস্তায় বসে গজল্লা করছে। কেউ বা আড়ঠেকায় রসের গান ধরেছে—

এই দেখাই শেষ দেখা হল আমার ওগো চারুশীলে।
চলিলাম জনমের মতো মনে রেখো অনাথ বলে।।

দুই-তিনজন সমঝদার পাশে বসে আহা আহা করছে। চিৎপুরের এই যাত্রা

দলের অফিসগুলোর ডান হাতে নিমাইচরণ গোস্বামীর বিরাট বাড়ি। বলরামের রাস উৎসবে নিমু গোস্বামীর বাড়ি প্রসাদ পেতে ফি-বছর আসে তারিণী। এই গলি পেরোলেই গরানহাটা। নিমতলার কাঠ দিয়ে অক্ষরের ডালা, ব্লক, গ্যালি তৈরি করে বাড়ির মেয়ে বউরা। এখানেই কোথাও সেই প্রেস থাকার সম্ভাবনা। তারিণী এগিয়ে গিয়ে এক প্রেসে জিজ্ঞেস করল, "ভাই এখানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেস কোনটা? ৯১ নম্বর বাড়ি?"

লোকটি ছোকরা এবং কিছুটা তেরিয়া গোছের। গ্যালি সাজানোর কাজ বন্ধ রেখে খ্যাঁক করেই জিজ্ঞেস করল, "কেন? ওই অ্যাংলো ইন্ডিয়ানই কেন দরকার? আমরা দেশি লোকরা ভালো কাজ পারিনে বুঝি? নাকি ওই আধাফিরিঙ্গি ট্যাঁশদের গায়ের গন্ধ থাকলে বইয়ের মান বাড়ে? কী কাজ করাবেন বলুন। এই গোটা গরানহাটায় আমাদের ক্রাউন লাইব্রেরির ধারেকাছে কেউ নেই।"

তারিণী মাথা গরম করল না। বলল, "আজ্ঞে সে তো নিশ্চয়ই। ক্রাউন লাইব্রেরির নাম কে না জানে? তবে আমার দরকার অন্য। আমার এক বন্ধু ওই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে কিছু বই ছাপিয়েছিল। টাকা পুরো নিয়েছে, বই কম দিয়েছে। বন্ধু এসেছিল, ওকে ভাগিয়ে দিয়েছে। তাই আমাকে পাঠাল।"

"তাই বলুন", এতক্ষণে তারিণী লোকটার মন পেল। "এ তো জানা কথা। ওইসব অজাত কুজাতের লোক দিয়ে কি আর ভালো কাজ হয়? আপনার বন্ধুরও বলিহারি। আর প্রেস পায়নি? আমাদের কাছে এলে আমরাই কম দামে ভালো কাজ করে দিতুম।"

"আজ্ঞে প্রেসটা কোথায় যদি বলতেন..."

"একটু এগিয়ে যান। খানিক বাদে রাস্তা বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে হাটখোলার দত্তদের আটচালা শিবমন্দির। ঠিক তার উলটো দিকের রাস্তায় দুটো বাড়ির পরেই ৯১ নম্বর। ভালো করে ধমকে দেবেন। আর আপনার কিছু ছাপানোর থাকলে আমাদের কাছে আসবেন। মনে রাখবেন ক্রাউন লাইব্রেরি।"

কোনওমতে নমস্কার করে দ্রুত এগিয়ে গেল তারিণী। ৯১ নম্বর খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। অন্য প্রেসের চেয়ে আকারে একটু বড়ো। ভিতরে বিদ্যুতের আলোতে ঝলমল করছে। একটু চমকে গেল তারিণী। এত প্রেস থাকতে এখানেই বই ছাপাতে হল? প্রেসের ভিতরে ট্রেডল মেশিনের ঘটাং

ঘটাং শব্দ চলছে। সামনে একটা টেবিলে বসে গ্যালি প্রুফ দেখছেন এক ফিরিঙ্গি। তারিণীকে দেখেই মুখ তুলে একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

"ওয়েলকাম বাবু। কাম ইন। আসেন আসেন। বলেন কী দরকার?"

সাহেব তাহলে বাংলাটা ভালোই শিখেছেন বোঝা গেল।

"আজ্ঞে সাহেব, আমার নাম শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রায়। আমি এসেছিলাম একটা খোঁজ নিতে।"

"বলেন বলেন। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?"

পকেট থেকে বইটা বার করে সাহেবের হাতে দিল তারিণী। "এই বই আপনাদের প্রেস থেকে ছাপা?"

বই হাতে নিয়েই সাহেবের হাসি হাসি মুখ এক নিমেষে গম্ভীর হয়ে গেল। যেন কোনও আগুনের গোলা ছুঁয়ে ফেলেছেন এমনভাবে দ্রুত বইটা তারিণীর হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, "ইয়েস। নাও হোয়াট হ্যাপেনড এগেইন?"

"কেন সাহেব? কী হয়েছিল?"

"আপনি এই রাইটারকে চিনেন?"

"চিনি।"

"ইয়োর ফ্রেন্ড?"

"না। পরিচিত। কেন?" মিথ্যে বলল তারিণী।

"আপনি তাহলে এখানে এসেছেন কেন?"

"আমার একটা বইয়ের দোকান আছে। চিৎপুরে। যাত্রার বইয়ের। সেদিন ও আমাকে একশো কপি বই বেচে দাম নিয়ে গেছে। এখন দেখছি একটা বই কম। ও বলল আপনারা নাকি এক কপি বই নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছেন। তাই জানতে এলাম।"

"দেন আই মাস্ট সে, বি অ্যাওয়ার অফ হিম।"

"সে কী! কেন?"

"ভেরি ডেঞ্জারাস ম্যান। কিছুদিন আগে আমার কাছে এসে বলল এক রাতের মধ্যে ওর একটা প্লে ছেপে দিতে হবে। আমি বললাম ইমপসিবল। বলল পসিবল করতে হবে। আর্জেন্ট। তাও রাজি হলাম। বললাম তিরিশ টাকা লাগবে। ও বলল এক পয়সা দেবে না। দেন হি থ্রেটেনড মি।"

"থ্রেট? কী নিয়ে?"

"লুক বাবু। আপনারও বইয়ের দোকান আছে। আপনি বুঝবেন। এই পাড়ায় বিজনেস করতে গেলে স্ট্রেট ওয়েতে সবসময় হয় না। অ্যাংলো

ইন্ডিয়ানদের তো আরও মুশকিল। তাই কিছু টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন আমিও করেছি। আনফরচুনেটলি হি নোজ দ্যাট।"

"বাট হাউ?"

"দ্যাট আই ক্যান নট টেল ইউ। জাস্ট আউট অফ ফিয়ার আমাকে এক রাতের মধ্যে এই প্লে প্রিন্ট করে দিতে হয়েছে। শুধু এটা বলি হি ইজ নট আ কমন ম্যান। একটা বড়ো গ্যাং আছে ওর পিছনে। দ্যাটস অল। আর কিছু আস্ক করবেন না প্লিজ।"

"আচ্ছা। এই যে বিলটা, এটা আপনাদেরই তো?"

"শিওর। দ্যাট সান অফ আ বিচ একটা পয়সাও না দিয়ে আমাকে দিয়ে এই বিল করিয়েছে। ইফ আই গেট হিম ইন হ্যান্ড..."

"তাহলে এই বইয়ের একটাও কপি আপনাদের কাছে নেই?"

"নো। নেভার।"

"আচ্ছা চলি", বলে উঠে এল তারিণী। সবকিছু কেমন ধোঁয়াটে লাগছে। এই সাহেব যা বললেন, তা যদি সত্যি হয়, তবে শৈলকে সে আজ অবধি চিনতে পারেনি। কিন্তু এই সামান্য একটা নাটককে নিয়ে এত বাড়াবাড়িই বা সে করছে কেন কে জানে! গোটা রাস্তা ভাবতে ভাবতে চলল সে। এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেবের কী এমন গোপন কথা থাকতে পারে, যা শৈল জেনে ফেলেছিল? আর জানলই বা কী করে? এই শৈলকে সে চেনে না। এতদিন একসঙ্গে থাকার পরেও না।

প্রেস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জোড়াসাঁকো, আদি ব্রাহ্মসমাজ পেরিয়ে এল তারিণী। আর-একটু এগিয়ে গেলেই চোরাবাগান আর্ট স্টুডিও। তারিণী যাবে আর-একটু উত্তরপানে। বউবাজারে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও-তে। অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মশাই এই স্টুডিও তৈরি করার পরে এখন কলকাতা তো বটেই, ভারতের অন্যতম সেরা ছাপাই ছবি এখানেই বানানো হয়। সেখানে গিয়ে বিশেষ কাজ হল না তারিণীর। অন্নদাবাবু ছিলেন না। তাঁর প্রধান সাগরেদ নবকুমার বিশ্বাস আর ফণীভূষণ সেন এত ব্যস্ত যে কথা বলার সময় নেই। তারিণীর হাতের সেই ছবিটি কে ছাপতে দিয়েছে, কবে দিয়েছে, এই বিষয়ে কেউ একটি কথাও বললে না। নবকুমার শুধু জানালেন, সেখানে কমিশনড কাজ যিনি করাতে দেন, তিনি চাইলে তাঁর নাম গোপন রাখা হয়। এক্ষেত্রেও তাই। ফলে তাঁরা নিরুপায়। বাকিদের জিজ্ঞেস করেও সুবিধে হল না। সবাই যেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে।

রাত অনেক হল। তারিণী জানে প্রিয়নাথ অনেক রাত অবধি লালবাজারে থাকে। তাকে একবার জানানো প্রয়োজন। যথারীতি প্রিয়নাথ নিজের কামরাতেই ছিল। লালবাজারে ইদানীং বিদ্যুতের সংযোগ হওয়াতে রাতেও কাজ চলে। তারিণী সমস্ত ঘটনা জানাল প্রিয়নাথকে। প্রিয়নাথ মন দিয়ে শুনল। পাশেই একটা কাগজে প্রেসের ঠিকানাটাও লিখে নিল।

"আচ্ছা, আজ তুমি যাও। আমি দেখছি শৈলর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় কি না।"

তারিণী যাবার আগে প্রিয়নাথের হাতে একটা পাতলা বই ধরিয়ে বলল, "আমি জানি আপনি সাহিত্য পছন্দ করেন। এটা পড়ে দেখবেন। পারলে আজ রাতেই।"

"কী এটা? সেই নাটক? দিয়ে যাও তবে। কিন্তু পড়ার জন্য এত তাড়া কীসের হে?"

"আজ্ঞে তাড়া তো আচেই। শৈলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। যদি এই বইতে কোনও সূত্র খুঁজে পান। আমি চাই আপনি এই বই পড়ুন। বিলম্বে যদি কোনও বিপদ ঘটে।"

"কী বিপদ?"

"আজ্ঞে শৈলর বিপদ।"

"এ নাটক তুমি পড়েছ?"

"পড়েছি বলেই বলচি। সাদা চোকে যা মনে হয় এ বই তেমন বই না। তবে আমি মুখ্যু মানুষ। ভুল করতে পারি। আপনি একবার পড়ে দেখুন।"

তারিণী বইখানা প্রিয়নাথের হাতে দিল। প্রিয়নাথ বই উলটেপালটে দেখে বলল, "যাও তবে। সাবধানে যেয়ো। ভিতরের এই ছবিটাও থাক। আর বইয়ের পিছনে এই লাল পেনসিলের চিহ্নটা কীসের?"

"আজ্ঞে ওটা আমার বদ অভ্যেস। বই পড়া হয়ে গেলে পিছনে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখি।"

"তোমার এটা পড়ে কী মনে হয়েছে বলবে না?"

"আজ্ঞে আপনি আগে পড়ে নিন। কাল আমি আবার আসব। আমার ধারণা তখনই আপনাকে বলা যাবেখন।"

নিজের আপিসে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল তারিণীর। শহরের পেটা ঘড়িতে নয়বার ঢং ঢং শব্দ হল। ক্লাইভ স্ট্রিট প্রায় নির্জন। মাঝেমধ্যে

দুই-একটা ছ্যাকরা গাড়ি, ব্রুহাম ছুটে যাচ্ছে। তারিণীর অফিসের ঠিক সামনের ল্যাম্পপোস্টের বাতিটা খারাপ হয়েছে বেশ কদিন হল। এতদিন সমস্যা হয়নি। সে রাতের আগেই ঘরে ফিরেছে। আজ তালায় চাবি ঢোকাতে সমস্যা হবে। দরজার কড়ায় হাত পড়াতে চমকে উঠল তারিণী। তালা নেই। দরজা ভেজানো।

তাহলে কি শৈল ফিরে এল?

"শৈল শৈল" করে বার দুই ডাকল তারিণী। কোনও উত্তর এল না।

খুব ধীরে ধীরে দরজার পাল্লা দুটো খুলে দিল সে। আর দিতেই প্রচণ্ড জোরে একটা ধাতব আঘাত লাগল তারিণীর মাথায়। তারপর তার আর কিচ্ছু মনে নেই...

তৃতীয় পর্ব— ধূসর পাতায় যেই জ্ঞান

অরুণবাবুর বাড়ি থেকে সোজা অফিসে ফিরলাম। অমিতাভ মুখার্জি ব্যান্ডেল স্টেশন অবধি পৌঁছে দিয়েছিলেন। অফিসে এসে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে বসলাম।

একটা জিনিস ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। এই হিলি আর ওয়ার্নারের গ্রেপ্তারের সঙ্গে দেবাশিসদার মৃত্যু কোনও না কোনও ভাবে জড়িত। আবার তারিণীর লুকিয়ে রাখা নাটকের বইয়ের লেখক শৈলচরণ সান্যাল-ও খুন হন একইভাবে। এদিকে বিশ্বজিৎ খুন হয়েছে। এই যে সব রিচুয়ালিস্টিক খুন, এর পিছনে কোনও একজন থাকা সম্ভব না। কোনও ব্যক্তিগত হিংসা বা লোভেও এই খুন না। কারণ যারা খুন হয়েছে তারা কেউই সমাজের উঁচুতলার মানুষ নয়। মধ্যবিত্ত বা ছাপোষা গৃহস্থ। শুধু... ভাবতে গিয়ে একটু নাড়া খেলাম। দেবাশিসদা আর বিশ্বজিৎ। দুজনেরই যৌনজীবন কিন্তু ছাপোষা মধ্যবিত্তের মতো ছিল না। দেবাশিসদা নিয়মিত বেশ্যাপাড়ায় যেতেন, আর বিশ্বজিতের এক হিজড়ার সঙ্গে সম্পর্ক। যদি ধরেই নিই এই যৌনতার কারণে দুজন খুন হয়েছেন, তাহলেও দেবাশিসদার আমাকে পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপ আর বিশ্বজিতের কাছে পাওয়া সেই নোটের কোনও মানে উদ্ধার হয় না। আগে যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। একশো বছর ধরে কোনও এক দানব ঘুমিয়ে ছিল। দানব না ভূত কে জানে? হয়তো এ-ই হিলির ভূত। এখন সেই ভূতকে আবার জাগিয়েছে কেউ বা কারা। ইতিহাস নিজেকে ফের গুটিয়ে নিয়ে চলেছে একশো বছর আগের পথে।

আচ্ছা, তারিণী কি সেই কেস সমাধান করেছিল? প্রিয়নাথ? করলে কেমন

BENGALI CONAN DOYLE.

Inspector Priyanath Mukherji, of the Calcutta Police, who has earned the title of the "Conan Doyle of Bengal" has retired from service with a record of good and useful work extending over thirty-three years to his credit. During his long tenure of office he has been entrusted with the investigation of numerous complicated cases, and in many instances has brought his investigation to a successful issue. Beginning his career as a writer-constable, Inspector Mukherji rose to be an Inspector, and has proved himself worthy of advancement. It would be impossible in a newspaper article to enumerate his many triumphs in tracing the guilty. But he made his mark as a detective officer of special aptitude in connection with what is known as the Heely-Warner Case. He was also the leading investigating officer in connection with the Howrah acid throwing case. Inspector Mukherji is the first Bengali writer of detective stories.

করে? সমকালীন কোনও পত্রিকায় এই নিয়ে কিছু নেই। যে দুটো জায়গায় থাকতে পারত, প্রিয়নাথের দারোগার দপ্তরের পাণ্ডুলিপি আর তারিণীর ডায়রি। দুটোই মিসিং। কেউ যেন ইচ্ছে করে আমাকে অদ্ভুত একটা ভিডিও গেম খেলায় নামিয়ে দিয়েছে, যে খেলায় গোপন ক্লু ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক। কিন্তু লুকিয়ে রাখা। সেই ক্লু খুঁজে বার করে পরের ক্লুয়ের জন্য যেতে হবে। যদি সত্যিই ভিডিও গেম হত, তবে দুর্দান্ত হত, দারুণ এনজয় করতাম। কিন্তু মুশকিল হল এটা ঘোর বাস্তব। দুজন চেনা মানুষ এর মধ্যেই বীভৎসভাবে খুন হয়েছেন। তবু কেন যেন মনে হচ্ছে এর গোটাটাই টিপ অফ দি আইসবার্গ। আরও বড়ো কিছু আসছে। সামনেই। আর আমি ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার হয়ে বসে আছি।

ভাবতে ভাবতে প্রথমেই অরুণবাবুর দেওয়া ফাইলটা খুললাম। অনেকদিন অব্যবহারে ধুলো জমেছে। দারুণ সংগ্রহ ভদ্রলোকের। শুরুতেই স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রিয়নাথের অবসর গ্রহণের খবরের কাটিং। একটা ব্যাপার দেখে অবাক হলাম, এই সামান্য পরিসরেও হিলি আর ওয়ার্নারের কেসের উল্লেখ আছে। আর আছে কিছু বাংলা সংবাদপত্রের কাটিং। সবই ওই ১৮৯৫-৯৬ নাগাদ। পত্রিকার নাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়। পিছনে পেনসিলে প্রিয়নাথের হাতে লেখা, "নীবারসপ্তকের জন্য"। তাতে যে কটা খবর দেখলাম, সবই হয় দাঙ্গার, নয় অস্বাভাবিক মৃত্যুর। এই ধরনের খবরে আমার আগ্রহ চিরকাল।

খবরগুলো পড়তে পড়তেই মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল যেন। এতক্ষণে ধীরে ধীরে আমার কাছে একটা ছবি পরিষ্কার হচ্ছে। আর সে ছবি বড়ো ভয়ানক। বিশ্বজিতের কাছে থাকা দেবাশিসদার নোটটা আমার

কাছেই রাখতে বলেছিলেন অফিসার। সেটা আবার দেখলাম। তখন তাড়াহুড়োতে খেয়াল করিনি। এবার যা দেখতে পেলাম, তাতে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবার জোগাড়। আমি যা ভাবছি তা যদি ঠিক হয়, তবে তো...

ফাইল ঘাঁটতে থাকলাম পাগলের মতো। যদি আর কিছু পাওয়া যায়। খবরের কাগজের কাটিং বাদে কিছু পাতলা পাতলা কাগজ, হ্যান্ডবিল, একটা ক্লিপ দিয়ে আঁটা। সঙ্গে একটা কাগজের টুকরোতে ছোট্ট নোট, "প্রিয়নাথের দারোগার দপ্তরের কপির ভিতর থেকে পাওয়া।" সেগুলো উলটেপালটে দেখলাম। বিশেষ দরকারি কিছু না। কালেকটরস আইটেম বলতে একটাই। জাদুকর গণপতি কোন এক লালমোহন মল্লিকের বাড়িতে প্রাইভেট শো দেখাবেন, তার বিজ্ঞাপন। যেটা সবচেয়ে অবাক করল, তা হল বিজ্ঞাপনে এইচ এল সেনের উল্লেখ। যিনি "জনমধ্যে আনন্দ জন্মাওনার্থ এই মনোরম ছায়াবাজি প্রদর্শন করিবেন।" এই এইচ এল কি হীরালাল? তাহলে তো দারুণ ব্যাপার! জাদুকর গণপতি আর ভারতীয় সিনেমার পথিকৃৎ হীরালাল সেন এক মঞ্চে! জানি না এই খবর আর কেউ জানেন কি না। এর সঙ্গেই পাতলা লাল কাগজে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের কোনও এক দোকানের স্তনবর্ধক তেলের বিজ্ঞাপন। তেলের নাম রতিবিলাস তৈল। এ জিনিস আবার এখানে কেন? পাশে অর্ধনগ্ন এক মহিলার ছবি। নিচে বিজ্ঞাপন আর ছড়া লেখা। সেই ছড়াও সামান্য অশ্লীলতা ঘেঁষা। আজকাল এমন বিজ্ঞাপন যে করবে, তাকে মারধর খেতে হবে নিশ্চিত। বিজ্ঞাপনের একেবারে শেষে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। একেবারে ছোটো ছোটো অক্ষরে লেখা, "এইপ্রকার বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন— শ্রী শৈলচরণ সান্যাল ও শ্রী তারিণীচরণ রায়। ৩৫ নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।" সে কী! তাহলে তো এই বিজ্ঞাপন এই ফাইলে থাকার কারণ স্পষ্ট। আর প্রিয়নাথের সঙ্গে তারিণীর যোগের বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হচ্ছে। মন দিয়ে বিজ্ঞাপনটাই পড়তে শুরু করলাম। এবার একটু খুঁটিয়ে।

শুরুতেই সাবধানবাণী। "ইগনোর করিবেন না"। ইগনোর কেন? উপেক্ষা কেন না? পরের লাইনটা আরও অদ্ভুত। একই বাক্যের মধ্যে পরপর কয়েকটা সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। "এক এক ঔষধ", "দুই স্তনে", "তিনবার", "পাঁচদিন" ব্যবহার করলেই নাকি কাজ হবে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে আবার শেষের দিকে মাসে "আটদিন" ব্যবহার করতে বলছে কেন? আরে! ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮— সংখ্যাগুলোর এই সিরিজটা তো আমি চিনি। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াকালীন আমাদের অঙ্ক স্যার শুভঙ্কর বিশ্বাস একটা গোটা ক্লাস নিয়েছিলেন এই নিয়ে।

সেই থেকে ভুলিনি। ১২০২ সালে খরগোশের বৃদ্ধি গুনতে গিয়ে ফিবোনাচ্চি নামের এক ভদ্রলোক এই সিরিজ বানান। সিরিজটা দেখতে একেবারে সোজা। প্রথমে শূন্য। তারপর ১। তারপরের সংখ্যা আসবে আগের দুটোকে যোগ করে। জীববিজ্ঞানীরা বলেন এই সিরিজ অনুযায়ী নাকি গাছের ডালে পাতার সজ্জা থেকে সূর্যমুখী ফুলের বীজের সজ্জা, এমনকি শামুকের খোলের প্যাঁচ সব হয়। স্বয়ং ঈশ্বর নাকি এই সিরিজ বানিয়েছেন। সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, চিনের গোপন বার্তাবহ অক্ষর ই-চিং, ইউরোপের ফ্রিম্যাসনদের কোড লেটার সব কিছুতেই এই গোল্ডেন সিরিজ থাকতই। ফ্রিম্যাসনদের পবিত্র সংখ্যা ছিল তেরো (৮+৫)। বিজ্ঞাপন, হাতে লেখা পোস্টারের মাধ্যমে তারা তাদের নানা গোপন বার্তা প্রকাশ্যেই ছড়িয়ে দিত শহরের বিভিন্ন জায়গায়। আপাতদৃষ্টিতে এর একটা মানে থাকত ঠিকই, কিন্তু সেটা বহিরঙ্গের। আসল বার্তাটা ধরতে পারবে কেবল অন্য একজন ফ্রিম্যাসনই। অন্য কেউ না। তাদের যে-কোনো গোপন বার্তায় তেরো থাকবেই। শুভঙ্কর স্যার বলেছিলেন, ফ্রিম্যাসনদের নিয়ে এই সবই জানা গেছে মাত্র বছর তিরিশ আগে। বেশ কিছু ফ্রিম্যাসন সাংবাদিকদের ভিতরের খবর দিয়ে দেয়। এক ঝটকায় সব মনে পড়ে গেল। আর ঠিক তারপরেই মনে হল বড্ড বেশি ভেবে ফেলছি। একে তো এটা নিতান্ত মহিলাদের স্তন বাড়ানোর হ্যান্ডবিল, তাও দুই বাঙালির লেখা। এই নিয়ে এত বেশি ভাবার অবকাশ কোথায়? সবচেয়ে বড়ো কথা, গোটা বিজ্ঞাপনে কোথাও তেরো সংখ্যাটাই নেই। বিজ্ঞাপনে লেখা শিশির দামে চোখ পড়তেই মুখটা আপনাআপনি হাঁ হয়ে

গেল। প্রতি বোতলের দাম, "বারো আনা এক পাই।" বারো আর এক। তেরো।

এর একটাই মানে। আমি এই মুহূর্তে হাতে যেটা ধরে আছি, সেটা কোনও সাধারণ বিজ্ঞাপন না। ফ্রিম্যাসনদের গোপন লিফলেট।

আমি যা বোঝার বুঝে গেছি। একশো বছর আগের কেসটা ঠিকঠাক না জানতে পারলে দেবাশিসদা কিংবা বিশ্বজিতের মৃত্যুরহস্য সমাধান করা যাবে না। ফ্রিম্যাসনদের নিয়ে কোথা থেকে শুরু করব বুঝে গেছি। প্রিয়নাথের শেষ লেখা আর তারিণীর খাতা পাইনি, কিন্তু যেটা পেয়েছি সেটা দিয়েই শুরু করা যাক বরং। তৈমুরের কাব্যগাথার মধ্যে লুকিয়ে রাখা শৈলচরণ সান্যালের লেখা সেই অদ্ভুত নাটক। সম্ভবত তাঁর লেখা শেষ নাটক। আগে একবার চোখ বুলিয়েছিলাম। খুব ইম্প্রেসিভ কিছু লাগেনি। আসলে হোমসের ভাষায় আমি দেখেছি, কিন্তু লক্ষ করিনি। আর গোয়েন্দা হতে গেলে তো অবজারভেশন আর ডিডাকশান মাস্ট। ড্রয়ার থেকে বইটা বার করে সামনের টেবিলল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বসলাম। দরজাও বন্ধ করে দিলাম। এখন কেউ ডিসটার্ব করলে মুশকিল। সেই ছেঁড়া খামের মধ্যে থেকে পো-র বইয়ের মলাটে মোড়া নাটকটা বার করলাম। কী আশ্চর্য! খামের ভিতরে আরও একটা কাগজ! এটা আগে দেখিনি তো? দেখলে মনে থাকত নিশ্চিত। খুলে দেখলাম ফাঁকা কাগজ না। ছবি। এক বৃদ্ধা, এক যুবতি, আর এক শিশুর। এই ছবি আগে খেয়াল করিনি কেন? ছবির পিছন দিকে দেখতেই রহস্য পরিষ্কার হল। খামের ভিতরে আঠা দিয়ে ছবিটা লাগানো ছিল। আঠা খুলে পড়ে গেছে। ছবিটা পাশে রেখে এবার বইটা খুললাম।

একদম ছোট্ট বই। পাতলা কাগজে ছাপা। মলাট বলতে চারিদিকে সরু বর্ডার দিয়ে বইয়ের নাম, পাশে ডানাওয়ালা দুই পরি হাতে মালা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। মাঝে একটা তর্জনী নিচের লেখার দিকে নির্দেশ করছে। সেখানে লেখা—

"সাধিতে দেশের হিত করিয়াছি পণ।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"

এই লাইন দুটো আমার চেনা। বাবা প্রায়ই বলতেন। খুব সম্ভব রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের লেখা। তারপরে আরও কয়েক ছত্র কবিতা। লেখকের নাম, মুদ্রক আর প্রাপ্তিস্থান লেখা। একেবারে পিছনের মলাটে লাল পেনসিল দিয়ে অদ্ভুত একটা চিহ্ন আঁকা। বইটা খুলে পড়তে বসলাম। এবার সিরিয়াসলি।

বিষম ভূত ও পুষ্পসুন্দরীর পালা

"সাধিতে দেশের হিত করিয়াছি পণ।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"।

হংসকে হত্যা করার কিবা এ কী ছল।
তুমিই মহান দেব প্রতাপ প্রবল।।
মানুষ ছাড়িয়ে ভূতে লইলে শরণ।
দুর্গ প্রাকারে তব মহা আয়োজন।।
প্রেমের অপূর্ব গতি, অদ্ভুত সে খেলা।
ভাতৃমাঝে অসহায় দারিকা একেলা ।।

কলিকাতা
গরানহাটা নিবাসী
শ্রীযুক্ত শৈলচরণ শান্যাল
প্রণীত।
গরানহাটা স্ট্রীটে
৯১ নং ভবনে এংলো ইন্ডিয়ান যন্ত্রে
মুদ্রিত
সন ১৩০৩
যাঁহার এই পুস্তক প্রয়োজন হইবেক তিনি ৩৫ নং ক্লাইভ স্ট্রীটের
শ্রী তারিণীচরণ রায়ের আপিসে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন
মূল্য ।০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

বিকট মনে হইলেও ইহা একটি প্রহসন মাত্র। এই ক্ষুদ্র প্রহসনখানি আপনাদের নয়নাগ্রে অর্পণ করা আমার অতিমাত্র সাহস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সাবধান হই নাই। সাহিত্যপ্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ।

কঠোর এই দুঃসাহস সমুদ্রে একমাত্র সমাজোপকারের ভরসাতরী অবলম্বনে ভাসিত হইলাম। এক্ষণে গ্রন্থকর্ত্তার জীবননাশ বা জীবনোদ্ধার দুই কার্য্যের বিবিধ ভার আপনার উপরেই সমর্পিত হইল। পাঠান্তে যেমতি বোধ হইবে তেমতি করিবেন। আপনারাই আমার ভ্রাতা ভাগিনীসম। রাখিলে আপনারাই রাখিবেন, মারিলে আপনারাই মারিবেন। সে ষড় একান্তই আপনার নিজস্ব বিচারাধীন।

তোয়াজি ভূতে আমার ঘাড় মটকাইলে জানিবেন একদিন সেই ভূত কৃষ্ণকায়া পুষ্পসুন্দরীকে হত্যার অশেষ চেষ্টা করিবেক।

রিভাইজ করা সত্ত্বেও এই পুস্তকে বিবিধ পংচুএশন দোষ আছে। সানুগ্রহে সংশোধনান্তে পাঠাজ্ঞা হইবেক। তাহাতে কেরানী হইতে রাণী সকলেই সুখী।

আমার আশা এই নাটক অভিনীত হইলে গোল্ডেন জুবিলিতে যাইবেই।

ইতি।

গ্রন্থপ্রণেতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

দীপ্তবর্ত-	পুষ্পসুন্দরীর স্বামী
বিজয়বর্মা-	পুষ্পসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র
ধনবর্মা-	পুষ্পসুন্দরীর কনিষ্ঠ পুত্র (বিশেষ প্রয়োজনে দীপ্তবর্তর ভূমিকার অভিনেতা এই ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারেন)
শক্তিধর-	প্রজা
বুদ্ধিধর-	বিদেশি প্রজা
কাপালিক-	বিশেষ প্রজা
সেনাপতি-	পুষ্পসুন্দরীর রক্ষক

স্ত্রী।

পুষ্পসুন্দরী	মহারাণী
হেমলতা	পুষ্পসুন্দরীর দাসী

বিষম ভূত ও পুষ্পসুন্দরীর পালা

অতি পুরাতন কথা ছিলয়ে রাজন।
তিনটি সিংহ তাঁর করয়ে সৃজন।।
কানহারী নামে মন্ত্রী বুদ্ধে বিচক্ষণ।
বিনা মেঘে বজ্রপাত রাজার মরণ।।
রাজার তনয়া যেন কুসুম মুরতি।
পুষ্পসুন্দরী নামে হয় তাঁর খ্যাতি।

প্রথম অঙ্ক

পুষ্পসুন্দরীর উপবেশনাগার

পুষ্প কেশবিন্যাস করিতেছে। হেমলতা সম্মুখে দণ্ডায়মানা

পুষ্পসুন্দরী— দিনের পরে দিন চল্যে যায়। আমার আর সুদিন আসে না। কানহারী কতা শোনে না। সখীরা কাচে ঘেঁসে না। এই ভরা গতর নিয়ে আমি কোতায় যাই?

হেমলতা— সে কী কতা রাজকুমারী! কিচুই যে তোমার মনে ধরে না! নিত্তি নিত্তি খাওনদাওন। ধুমধাম। গলায় মুক্তোর সাতনরি হার। রোজই নিত্যনতুন পাত্র আসচে। তাতেও মনে সুক নেই? সতেরো বছর বয়স হোতে গেল। থাকো কেমন কোরে?

পুষ্পসুন্দরী— কী যে বলিস আবাগীর বেটি! আমার কি আর রাজপুতের অভাব আছে? কিন্তু সব যে বুড় ভাম। আমার শরিলের জ্বালা তেয়ারা কি মিটাতে পারবেন?

আর থাকি কেমন করে—
কী বলিব হায় ওহে কী বলিব হায়।
দিবা রাত্রি আমি থাকি ঐ ভাবনায়।।
আমার যা হয় ওহে আমার যা হয়।
পূর্ণরূপে প্রকাশিতে বাক্য সাধ্য নয়।।
অন্য মেয়ে হোলে ওহে অন্য মেয়ে হোলে।
নাগরের সঙ্গে যেত কোন দেশে চলে।।

হেমলতা— সে কী গা! এমন কতা মনেই আনতে নেই। দেখ আজ তোমার আত্মীয়রা আসবেন। তোমার কত সুখ্যাত করবেন। মুকে এট্টু পউডার টাউডার দেও, একখানা ভাল কাপড় পর, রাজপুতেরা এলে নিজের হাতে হাতে পান সেজে দিওখন। তোমায় আর শেকাব কি? কর্ম্ম সিদ্ধি কত্তে পার কি না দেক।

অন্য দ্বার দিয়া রাজকুমার দীপ্তবর্তের প্রবেশ

হেমলতা(উচ্চৈঃস্বরে)— এ কী! এ কী! কে? তুমি কাউকে না বলে অন্দরমহলে ঢুকলে যে বড়! এ আমাদের রাজকুমারীর শয়নকক্ষ। বেরোও এখুনি।

দীপ্তবর্ত— (লজ্জিত হইয়া) এসব আমি কিছুই জানি নে। আমি পথভুলে এই কক্ষে এসেচি।

পুষ্পসুন্দরী— আরে আরে এ কাকে কী বলচিস হেম? এ যে দীপ্ত। পাশের রাজ্যের রাজপুত্তুর। আমার শিশুকালের সখা। সেই কবে দেখেচিলুম। ওর সেই মূর্ত্তি আমার মনে গাঁথা হয়ে রয়েচে। সেই মুখ, সেই চোক। এখন আরও সুন্দর হয়েচ।

(স্বগত গীত)

রাগিণী লোম ঝিঁঝিট। তাল ঠেকা।

আমি কী করি এখন,
অস্থির হতেছে প্রাণ নাহি নিবারণ।
যে ছিল সদা অন্তরে, আবার সে এল ফিরে
তাহারই অদর্শনে, বাঁচে কি জীবন।

দীপ্তবর্ত— আমি তবে যাই রাজকুমারী।

পুষ্পসুন্দরী— সে কী। চলে যাবে? সবে তো এলে। তোমায় কতদিন দেকিনি রাজকুমার। কী চেহারাখানি, কী মিষ্ট কথা, কী মধুর স্বর। আহা আমার সঙ্গে কথা বলে আর দু দণ্ড কি থাকা যায় না? এই নাও এই বেলফুলের মালা তোমায় দিলেম। এই পান দিলেম তোমার হাতে।

দীপ্তবর্ত— তা যাবে না কেন রাজকুমারী?

লঘু ত্রিপদী

আহা কী শুনিনু মরমে মরিনু

মনের আগুন দ্বিগুণ হল।
শুনে বেলফুল হইনু আকুল
অকূলেতে প্রাণ পড়িল।।
শুন লো দিনা, তোমারে বিনা,
যতেক যাতনা সই।
এ বসন্ত কালে, সে সদা কালে,
হৃদেতে দংশিছে ঐ।।

পুষ্পসুন্দরী— আহা! তোমার কথা শুনে মন বড় ব্যাকুল হচ্চে। তোমায় আপন করে পেতে আমার শরিল মন উতলা হয়েচে। তুমি আমায় বিয়ে কর।

দীপ্তবর্ত— কিন্তু কুমারী যে জন্মের বাঁধন আমাদের একডোরে বেঁধেচে তারা কি আমাদের মিলনে বাধা দেবে না?

পুষ্পসুন্দরী— আমি ওসব বুঝতে চাইনে। দেহ মন দিয়ে আমি সুদু তোমাকেই কামনা করেচি। আমার জ্বালা মিটাও। এস খানিক ঘুমানো যাউক।

দীপ্তবর্ত— চলো (দুইজনে কিয়ৎকাল রহস্য করে নিদ্রা গেল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট পুষ্পসুন্দরী

পুষ্পসুন্দরী— (স্বগত) আমার প্রাণের আরাম, দেহের শান্তি দীপ্তবর্ত আর নাই। সান্নিপাতিকে আক্রান্ত হয়ে আমায় এই নিঠুর পিথিবিতে ফেলে তিনি সগগে গেচেন। রেকে গেছেন রাজকুমার বিজয়বর্মা আর রাজকুমার ধনবর্মাকে। এখন আমি একা মহিলা এঁদের কি মতে মানুষ করি?

(বিজয়বর্মার প্রবেশ)

বিজয়বর্মা— আমাকে এত্তালা পাটিয়েছিলেন মা?

পুষ্পসুন্দরী— হ্যাঁ বাবা। চারিদিকে বড্ড কানাঘুষা শোনা যায়। তুমি নাকি এদানি এক রাঁড় লয়ে ফুত্তি কচ্চ? দেশের সকলে ছি ছি কচ্চে। তোমার এসব নষ্টামি বন্দ। তুমি রাজপুত্তুর। ভেবে দেক দেকি, এ কাজ কি ভাল কচ্চো?

বিজয়বর্মা— আপনি ভুল শুনেচেন মা। সৌদামিনী আমার রাঁড় নয়। আমার চোক্ষের মণি। বক্ষের পাঁজর। সে রাজবাড়ির রন্ধনশালে কাজ করে। আপনি নিজে তাঁর রান্নার কত সুখ্যাত করেচেন। আর কে কি কান ভরালো, আপনি সে সমস্ত ভুলে গেলেন?

গীত
রাগিণী চল বাছা। তাল কলসী কাচা।
কেন হইল এমন।
মম প্রাণ ধনে সৌদামিনী কেমনে করিল হরণ।
কি দিবস কি রজনী, দহিচে গো সজনী
বিহনে সেই গুণমণি এই অধীনের মন।
জীবন দিব অর্পণ, ত্যাজ না ত্যাজ না প্রাণ
কোথা রবে সেই প্রাণধন

পুষ্পসুন্দরী— ছি ছি বাবা। তোমার নজ্জা নেই কো? মায়ের সামনে এসব কতা কইচ? তোমার ওই রাঁধুনির সঙ্গে মেলামেশা চলবে না। আমি তোমার সাতে কম্বুদ্বীপের রাজকুমারীর বে দেব।

বিজয়বর্মা— হা হা হা। বড় হাসালেন মা। এই কাল পোশাকের মত আপনার মনটাও কাল হয়ে বিষ হৃদয় হয়েচে। কম্বুদ্বীপের প্রজারা আজ খেতে পত্তে পাচ্চেন না। আপনি দেকেও দেকচেন না। আর সেকেনের রাজকুমারীর সঙ্গে আমার বিবাহের কতা বলচেন?

ছি ছি এ কী কাজ নাই তব লাজ
ধিক২ তোমায় শতেক ধিক।।
সৌদা গুণমণি, আমার সন্তান জননী
ভালবাসি প্রাণাধিক।।

পুষ্পসুন্দরী— তুই এ কী কল্লি! রাজপুত্তুর হয়ে দাসীর গভ্যে নিষেক কল্লি? তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর কল্লাম। এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা আমার চোকের সামনে থেকে। আর এই পোড়ামুক আমায় দেকাস না।

(প্রণাম করিয়া বিজয়বর্মার বিদায়)

তৃতীয় অঙ্ক

নগরের রাজপথ

দুই বন্ধু শক্তিধর আর বুদ্ধিধরের প্রবেশ

শক্তিধর— ভাই বুদ্ধিধর আজ আমাদের বড় দুর্দিন। রাজকুমার বিজয়বর্মা প্রাণ দিলেন। বন্দিদশা আর সইছিল না। নিজের বুকে তলোয়ার ঢুকিয়ে পরাণপাত কল্লেন।

বুদ্ধিধর— শেষে তো আমাকেও তাঁর কাচে ঘেঁসতে দিত না। প্রহরীরা

এমন বজ্জাত আমায় দেকলেই তেড়ে আসত। আমি গোপনে দুই একবার তাঁর কক্ষে প্রবেশ করেছি। সে দিশ্য চোকে দেকা যায় না ভাই। রাজপুত্তুরের সোনার বন্ন কালি হয়েচে। চোখের জ্যোতি ছাই হয়েচে। তিনি শুদু ঘরে বসে থাকেন আর কাঁদেন। বলেন আমার মেয়ে কোতায়?

শক্তিধর— রাজপুত্তুরের আবার মেয়ে কী গো? উনি তো আইবুড়!

বুদ্ধিধর (ফিসফিস করে)— তবে আর বলচি কী? রাজবাড়ির রাঁধুনির গভ্যে রাজপুত্তুরের মেয়ে হয়েচে। রাণী সেই মেয়েকে কোতায় পাচার করেচেন কে জানে?

শক্তিধর— আর সেই রাঁধুনি?

বুদ্ধিধর— তাকে পুরেচে পাগলাগারদে। এখন ছোট রাজকুমারই মাকে মন্তন্না দিচ্চেন। সঙ্গে বড়মন্ত্রী।

শক্তিধর— কিন্তু এ তো মেনে নেওয়া যায় না ভাই। তবে উপায়?

বুদ্ধিধর— উপায় একটা আচে। আমি আমার ভাইদের সাতে কতা বলেচি। তারা এক উপায় বাতলেচেন। জঙ্গলের মাঝে এক কাপালিকের বাস। তার এক পোষা ভূত আচে। সে বিষম ভূত এমনিতে পোষ মানে না, তাকে দিব্যি তোয়াজ কত্তে হয়। মন্ত্র পত্তে হয়

(মন্ত্র)

হিলি ভূত, বিলি ভূত
খিলখিলি কত ভূত।
বাক্সেতে এস ভাই
বোতলেতে বস ভাই
সবুজ বরণ দেকে
আহা, আহা মরে যাই!

শক্তিধর— ধর তোয়াজ কল্লাম। তারপরে কী হবে?

বুদ্ধিধর— সেই ভূত কোনক্রমে তোমায় চেপে ধল্লে তোমার ঘিলু আর কাজ কব্বে না। মাতা গুলিয়ে যাবে। তকন ভূতে যা যা কবে, তুমি তাই তাই কর্তে বাধ্য। আমি একন সেই স্থলেই যাচ্চি। যাবে তো চল।

শক্তিধর— কিন্তু সে স্থলে কি আমায় পোবেশ কর্তে দেবে?

বুদ্ধিধর— আমি আছি চিন্তা কি? তুমি তৈয়ার থাকিও।

(করমর্দন করিয়া দুজনের বিদায়)

কাপালিকের গৃহ

অন্ধকার হইতে আওয়াজ ভাসিয়া আসে।

কাপালিক— তুমি কে?

বুদ্ধিধর— ঈশ্বরের পুত্র। আপনার ভাই।

কাপালিক— তোমার সঙ্গে কে?

বুদ্ধিধর— ঈশ্বরের আর এক অনুগামী। আপনার অন্য এক ভাই।

কাপালিক— তোমাদের পণ কী?

বুদ্ধিধর— আমাদের পণ জীবনসর্বস্ব।

কাপালিক— জীবন তুচ্ছ। সকলই কি ত্যাগ করতে প্রস্তুত?

বুদ্ধিধর— হ্যাঁ।

কাপালিক— তবে চোখ বন্ধ করে তিন পা সামনে এস। আলোর সন্ধান পাবে।

(আলো জ্বলিয়া উঠে)

কাপালিক— তোমরা কেন এসেচ?

বুদ্ধিধর— আমাদের মনস্কাম পূর্ণ কত্তে।

কাপালিক— সেটা কী?

বুদ্ধিধর— আমার ভাইয়েরা বলেচে আপনার কাচে এক পোষা তোয়াজি ভূত আচে। হিলির ভূত। সে ভূত আপনার আজ্ঞায় চলে। আমাদের সেই হিলির ভূত চাই।

কাপালিক— সে ভূত সবার জন্যে নয়। তাকে লুকিয়ে রাকতে হয়। দুর্জনের হাতে পল্লে সব্বোনাশ হবে।

বুদ্ধিধর— আমাদের মনস্কাম প্রতিশোধ। রাণী পুষ্পকুমারী আমাদের ভাই বিজয়বর্মাকে মেরেচে। আমরা তার শোধ নেব। এই আমার বন্ধু শক্তিধর রাজি হয়েচে। সে রাণীর মহলে ঢুকে ভূত ছেড়ে আসবে।

কাপালিক— তাকে রাজপুরীতে ঢুকতে দেবে কেন?

বুদ্ধিধর— মহামাত্যের হাত আমাদের মাতায়। রাণী জানেন না উনি কম্বুদ্বীপের চর।

(কাপালিকের হাতে দুইটি কাঁটা। সম্মুখে একখানি মানবকরোটি ও দুইখানি হাড়। তিনি এক লম্বা চাবি লইয়া তাহার পাশ হইতে এক অদ্ভুত ধাতব বাক্স বাহির করেন। ডালা খুলিয়া ভিতর হইতে এক কাচের বোতল বাহির হইল)

কাপালিক— এই বোতলেই সেই ভূত রয়েচে। এই ভূত এমনিতে জাগে না। তোয়াজে জাগে। লবণখোর এই ভূতকে লবণ খাওয়ালেই সে জাগ্রত হইয়া রঙ বদলায়। তারপর তাতে আগুন দিতে হয়। অনলের তাপে ভূতের পো জেগে নেত্য করেন। এই দ্যাখো আমি কেমন শিশি খুলিয়ে লবণ দিতেছি।

শক্তিধর— আরে আরে! ভূতের ছানার রঙ বদলে কেমন্নে সবজেপানা হয়ে গেল। এবার কী কর্ত্তে হবে?

কাপালিক— যার গায়ে ছাড়তে চাও। তার কাচের লোককে এই দিয়ে বশ কল্লেই হবে। এই লাও।

শক্তিধর— ভূতের শক্তি ফুরালে কী কব্বো?

কাপালিক— অনলের তাপে ভূতের শক্তি আবার বাড়বেখন। তুমি বোতল লয়ে যাও।

(বোতল লইয়া কাপালিককে প্রণাম করিয়া দুইজনের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

রাণী পুষ্পসুন্দরীর কক্ষ

পুষ্পসুন্দরী ও ধনবর্মা বসিয়া আছেন

পুষ্পসুন্দরী— মহারাজের মৃত্যুর পর অনেক বছর কাটল। প্রজারা সবাই সুখে শান্তিতেই আচে। রাজ্যবাসীর এই খপর জানা দরকার। তুমি উচ্ছবের আয়োজন কর।

ধনবর্মা— অবশ্য রাণী। কিন্তু তার আগে আপনার পাপের বিচার হোউক।

পুষ্পসুন্দরী— এ কী বলচ?

ধনবর্মা— আপনি খপর রাখেন না মহারাণী। রাজ্যে মানুষে মানুষে মহাদাঙ্গা বেঁধেচে। সবাই সবাইকে মারতে লেগেচে। আপনি চোখ উলটে বসে আচেন। এ রাজ্য আপনি আমাকে প্রদান করুন।

পুষ্পসুন্দরী— মাগো! এ কেমন কতা! ছি ছি। মা থাকতে ছেলে বসবে সিংহাসনে এ কি সম্ভব! আমার মহামন্ত্রী, সেনাপতি থাকতে তা হতে দেবে না।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি— আপনার পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েচে রাণী। এবার প্রাণ দিতে তৈয়ার হউন।

পুষ্পসুন্দরী— সেনাপতি তোমার মাতা কি খারাপ হল? এমনতর বকচ

কেন? তোমার চোক লাল। মুকে গ্যাঁজা উটচে। কেমনপানা লাগচে যেন তোমায়।

ধনবর্মা— তোয়াজী হিলিভূতে ভর করেচে ওকে। ও আর আপনার কতা শুনবে না। শুনবে আমার কতা। সেনাপতি গর্দান লও।

পুষ্পসুন্দরী— হায় হায়! আমার ইহকাল বিধবা হইয়াই গেল। পরকালও বুঝি যায়। আপন পেটের পুত্তুর এইভাবে শত্তুর হইয়া দেখা দিবে ভাবি নাই। হা ঈশ্বর। হা স্বামী!

(সেনাপতি কর্তৃক পুষ্পসুন্দরীর হত্যা)

সেনাপতি— হায় হায়! এ কী কল্লাম! ভুতের বশে এসে আমাদের রাণীকে হত্যা কল্লাম। আমার নরকেও ঠাঁই নাই।

(বুদ্ধিধর ও শক্তিধরের প্রবেশ)

বুদ্ধিধর— মন ছোট কর্বেন না সেনাপতি। যা হবার হয়েচে। এখন ছোট রাজকুমার ধনবর্মাই আমাদের নতুন রাজা।

(ধনবর্মাকে ঘিরে সবাই গান করিতে লাগে)

গীতি— বেহাগ। তাল— কাওয়ালি

এনা হতে দেবগণ জনম করি গ্রহণ
ডরে সবে নিবসে যাঁহায়
অজর অমর অজ অভুজে অযুতভুজ
আশে বড় প্রণমি তাহায়।
রত্নাকরে রমা যথা অথবা বিজলীলতা
দশ মাঝে তুমি আছ রাজা
খুজিয়া অযুত দেশ তোমার বন্দিত বেশ
নিন্দুকেরা পায় যোগ্য সাজা।

যবনিকা পতন।

চতুর্থ পর্ব— ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আঁধার

১।

(প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জার্নাল)

কিছু ঘটনার অভিঘাত মনুষ্যজীবনে এমন গভীরভাবে দাগ কাটিয়া যায়, যাহা আমৃত্যু ভোলা অসম্ভব। এই সম্পূর্ণ তদন্তকালে যদি একটি এবং কেবলমাত্র একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতে হয় যাহা আমার মর্মমূল অবধি আতঙ্কের শিহরণ জাগাইয়া দিয়াছিল, তবে তাহা অবশ্যই সেই দিনের ঘটনা যেই দিন তারিণীর আপিসে যাইব বলিয়া আমি অতি প্রত্যূষে লালবাজার হইতে রওনা হইয়াছিলাম। আমি সাহিত্যিক নই। হইলে হয়তো সে ভয়াবহ দৃশ্যের সঠিক বর্ণনা আমার লেখনী দ্বারা সম্ভব হইত। শুনিয়াছি মৃত্যুকে অতি নিকট হইতে প্রত্যক্ষ করিলে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ স্মৃতিতে অক্ষয় হইয়া থাকে। ইহা যে কেবলই মিথ্যা নয়, তাহা আজ এত বৎসর বাদে সেই গ্রীষ্ম প্রভাতের স্মৃতি রোমন্থন করিতে বসিয়া বিলক্ষণ টের পাইতেছি। যেন সে নারকীয় ঘটনা গতকল্যই ঘটিয়াছে এমন বোধ হইতেছে।

তারিণী পূর্বাহ্নে আমার নিকট আসিয়া শৈলর রচিত একখানি নাটক দিয়া গিয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে উহা নিতান্ত নির্দোষ এক পালার ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তাহাতে হিলির নাম সহ এমন কিছু গোপন সূত্র ছিল যাহা ইংরাজ সরকারের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ ব্যতীত কাহারও জানিবার প্রশ্নই উঠে না। শৈল এক সাধারণ পালাকার। তাহার নিকট এই সম্বাদ পৌঁছাইল কী উপায়ে? উপরন্তু তারিণী জানাইল সে দুই দিবস হইল নিরুদ্দেশ। তাহাকে সামান্য ভাবিয়া বড়ো ভুল করিয়াছিলাম। যেনতেনপ্রকারেণ তাহাকে খুঁজিয়া বার করিতেই হইবে। আমার বিশ্বাস বহু রহস্যের চাবিকাঠি লইয়া সে সকলের অগোচরে লুকাইয়া রহিয়াছে। তবে তাহার পূর্বে তারিণীর সহিত দ্রুত মিলিত হইতে হইবে। সমস্ত রাত্রি লালবাজারে আমার নিজস্ব কামরাটিতে নিদ্রাহীন অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতেই তারিণীর আপিসের উদ্দেশে বহির্গত হইলাম।

বাহিরেই সংবাদপত্র বিক্রেতার নিকট হইতে সবেমাত্র একখানি পত্রিকা খরিদ করিয়াছি, আমার কানে অদ্ভুত বিজাতীয় এক আওয়াজ প্রবেশ করিল। 'চড়াৎ চড়াৎ' সেই শব্দ কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত আমার দুঃস্বপ্নে হানা দিত। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই আওয়াজের কারণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানি কয়েক বৎসর যাবদ কলিকাতার সড়কের প্রায় সকল গ্যাসবাতিকে

প্রতিস্থাপিত করিয়া বিজলীবাতির বন্দোবস্ত করিয়াছে। কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই, তবু কলিকাতার বারো আনা সড়কে সেই সময় উজ্জ্বল বিজলীবাতি দেখিতে পাওয়া যাইত। লালবাজারের উলটাদিকের বিজলীবাতিস্তম্ভের বাতি দুই দিবস হইল তড়িৎহীন হইয়া আছে। দুই দিবস পূর্বের প্রবল বর্ষণে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এদিন প্রভাতে কিলবার্ন কোম্পানির দুই নেটিভ কর্মচারী আসিয়া কীসব করিতেছিল। এক ব্যক্তি লম্বা মই বাহিয়া এক উচ্চস্তম্ভে চড়িয়া দুইখানি কালো মোটা ছিন্ন তারকে জোড়া লাগাইবার চেষ্টা চালাইতেছিল। সেই ভয়ানক শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম একখানি তার হইতে বিদ্যুৎঝলকের ন্যায় তড়িৎস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। মইয়ের উপরের কর্মচারীটি আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া লাফাইয়া উঠিল। আমি স্পষ্ট দেখিলাম, তাহার সঙ্গী তাহার পদতলের মইখানিতে এক রামধাক্কা মারিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অবলম্বন নিমিত্ত লোকটি তারের অন্য প্রান্তটি চাপিয়া ধরিল।

উহাই তাহার কাল হইল। দুইখানি বিদ্যুতের তারের মধ্যে সে এক জীবন্ত তড়িৎবাহক। বিদ্যুৎ ভীমবেগে তার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। চড়াৎ, চড়াৎ শব্দ বাড়িয়া উঠিতেছে। তাহার দুই হস্তে অদ্ভুত কমলা হলুদ বর্ণের অগ্নি। যেন পাতালের হুতাশন। মই নিম্নে পতিত। দুইখানি তার ধরিয়া ঝুলিয়া একজন মানুষ জীবন্ত দগ্ধ হইতেছে। আমি এতটাই বিহবল হইয়া গিয়াছিলাম যে আমার কোনও বুদ্ধি সেই মুহূর্তে কাজ করিতেছিল না। পুতুলের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া আমি শুধু ঊর্ধ্বপানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। আমার ন্যায় সেই রাজপথে আরও কিছু মনুষ্য, পালকি, ঘোড়ার গাড়ি, লাল পাগড়ি দেশীয় কনস্টেবল আপনাপন কর্মে যাইতেছিল। সবাই যেন সেই দৃশ্যে চিত্রার্পিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেছে। কোনও এক নরকের শয়তান যেন তাহার জাদুদণ্ড সঞ্চালনে আমাদের সকলকে স্থির করিয়া দিয়াছে এক মুহূর্তে। শহরের কোলাহলও যেন কমিয়া প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অবাক বিস্ময়ে সকলে দেখিল ঝুলন্ত লোকটির মুখ খুলিয়া গেল। সেই হাঁ মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে নির্গত হইতেছে লেলিহান নীল আগুনের শিখা। তাহার মোটা চটের পোষাক দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার মস্তক ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দেহ বেতসপত্রের ন্যায় দোদুল্যমান। দুই হাত তবু তারের দুই প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া আছে। ভুল বলিলাম। তড়িৎ তাহাকে মুক্তি দিতেছে না। ঊর্ধ্বাকাশে ঝুলন্ত প্রভু যীশুর ন্যায় তাহার সেই মূর্তি আমি ভুলিব না। চারিদিকে চামড়া, আর মাংসপোড়া গন্ধ। তাহার পোষাক, চামড়ার পোড়া টুকরো যখন মাটিতে পড়িতে লাগিল তখনও
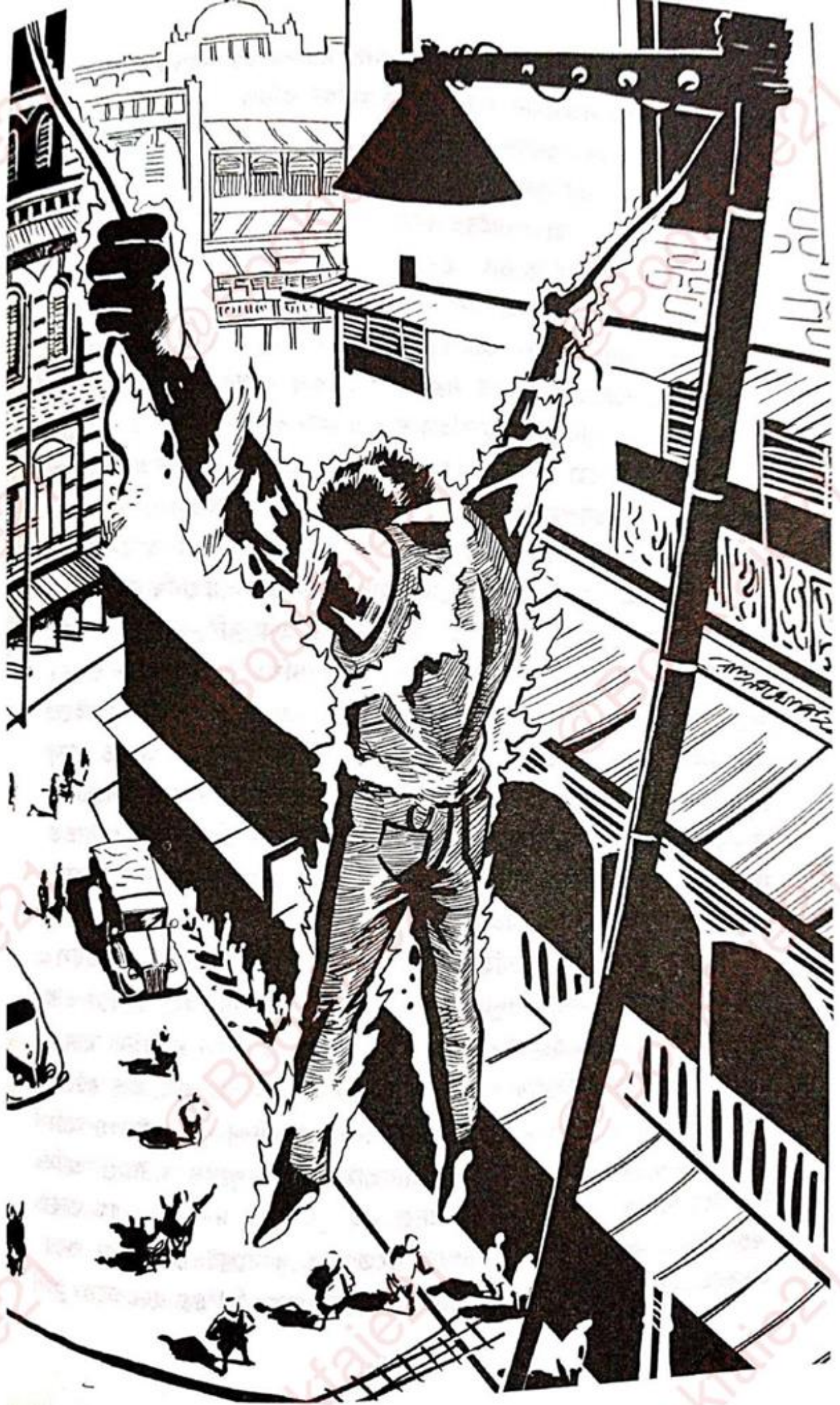
সকলে চুপ। ইহার অব্যবহিত পরেই সেই ব্যক্তির শোণিতধারা তীব্রবেগে বাহির হইয়া নীচে দণ্ডায়মান এক শিশুকে আবিষ্ট করিল।

এইবার সমবেত জনগণ উন্মাদের ন্যায় চিৎকার আর পলায়ন আরম্ভ করিল। ল্যান্ডোর ঘোড়া লাফাইয়া এক পথচারীর ঘাড়ে উঠিল, পালকি বেহারারা বেগতিক দেখিয়া ছুটিয়া পলাইতে গিয়া এক ছ্যাকরা গাড়ির সহিত সংঘর্ষ বাধিল। সকলেই পলাইতে চায়। কে কাহার পদতলে পিষ্ট হইল কে তাহার খবর রাখে? কিন্তু এই সমস্ত কোলাহল ছাপাইয়া এক অদ্ভুত উন্মাদের ন্যায় হাস্য আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। কেহ যেন অদ্ভুত আমোদ পাইয়াছে, এমনভাবে হাসিতেছে। কে এই নরাধম? একবার হাসির আওয়াজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই বুঝিতে বাকি রহিল না। এ সেই কর্মচারীর সঙ্গীটি। দুই হস্ত কোমরে স্থাপন করিয়া প্রাণপণে হাসিতেছে। সে হাসির বিরাম নাই। হাসিতে হাসিতে সে পেট চাপিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। আমি ততক্ষণে নিজজ্ঞানে ফিরিয়াছি। সামনেই এক বেহারী লাল পাগড়ি কনস্টেবল মোতায়েন ছিল। তাহাকে বলিলাম, "জলদি চলো।" সেই ব্যক্তির নিকটে গিয়া দেখি সে হাসিতে হাসিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। চক্ষে অদ্ভুত এক দৃষ্টি, যেমনটি কয়েক বৎসর পূর্বে ডালান্ডা হাউসের কয়েদীদের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলাম। ভাবলেশহীন। নির্বাক। হাসিতে হাসিতে তাহার দম বাহির হইয়া যাইতেছে। মুখগহ্বর হইতে ফেন নির্গত হইতেছে। তবু সে হাসিতেছে। কনস্টেবল তাহাকে ধরিতে গেলে সে বাধাদানের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না। ইতিমধ্যে আরও দুইজন কনস্টেবল আসিয়া উপস্থিত। আমি তাহাদের নির্দেশ দিলাম ইহাকে বন্দি করিয়া আপাতত ফাটকে রাখিতে। স্খলিতপদে এই ব্যক্তি যখন লালবাজারের উদ্দেশে যাইতেছে, তখনও তাহার হাসি থামে নাই।

বিদ্যুতের স্তম্ভের দিকে চাহিতেই আমার নিকট গোটা ঘটনা স্পষ্ট হইল। স্তম্ভের ঠিক নিম্নে একখানি বিদ্যুতের হাতল থাকে। যাহা নামাইয়া রাখিলে তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। স্তম্ভে উঠিবার পূর্বে হাতলটি নামাইয়া রাখাই দস্তুর। কিন্তু স্পষ্ট দেখিলাম হাতল নামানো নাই। নিশ্চিতভাবে মৃত ব্যক্তির সঙ্গীই এই দুষ্কর্মটি সাধন করিয়াছে। কিন্তু কেন? কিছুদিন পূর্বে হইলেও আমি পুরাতন রাগ, প্রতিহিংসা ইত্যাদি ভাবিতাম। খিদিরপুরের ঘটনাও আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু আজ ওই খুনির যে দশা দেখিলাম তাহা অভূতপূর্ব। একমাত্র কাহারও উপরে ভূতে ভর করিলেই সে এমন করে শুনিয়াছি। এদিকে শৈলর লিখিত নাটক আমাকে পরম বিস্মিত করিয়াছে।

তবে কি হিলির ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব রহিয়াছে? তাহা হইতেও বড়ো প্রশ্ন, সেই ভূত কি অবশেষে মুক্তি পাইয়াছে?

চারিদিকে ধোঁয়া, জ্বলন্ত শবের গন্ধ। ঝুলন্ত অবস্থায় সেই পোড়া কাঠের ন্যায় শব এখনও তড়িতের আবেশে মধ্যে মধ্যে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। এ দৃশ্য সহ্য করা যায় না। আমি খানিক সভয়েই আগুয়ান হইয়া সেই বিদ্যুতের হাতল লইয়া ঠেলিয়া নামাইয়া দিলাম। ধপ করিয়া আওয়াজে আমার ঠিক সম্মুখেই কৃষ্ণবর্ণের সেই বস্তুটি পড়িল। ইহাকে মনুষ্যদেহ বলিয়া চিহ্নিত করা অসম্ভব। আমি আমার চাকুরীজীবনে বহু মৃত্যু, বহু হত্যা দেখিয়াছি। চিনাপাড়ায় সেই সাহেবের মৃতদেহ দেখিবার পর ভাবিয়াছিলাম আমার নূতন কিছু দেখিবার নাই। কিন্তু পরম করুণাময় ঈশ্বর আমার প্রতি বড়োই অকরুণ। উনি এমন মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিতে বাধ্য করিলেন।

আমার তখনও হতভম্ব ভাব কাটে নাই। মেডিক্যাল কলেজের দিক হইতে একখানি দামী ল্যান্ডো আসিয়া ঠিক আমার সমুখেই দাঁড়াইল। দরজা খুলিয়া যিনি লাফাইয়া নামিলেন তাঁহাকে দিন দুই পূর্বেই চুঁচুড়ায় দেখিয়াছিলাম। উনি এই স্থলে কী করিতেছেন?

"আপনার সন্ধানেই আসিয়াছি। দ্রুত এই গাড়িতে উঠিয়া আসুন। মেডিক্যাল কলেজ যাইতে হইবে। তারিণী ওই হাসপাতালেই ভর্তি। গতকল্য উহাকে কেউ খুন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছে। অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। উহাকে বাঁচাইতেই হইবে। নহিলে অনর্থ।"

আমি কিছু বুঝিবার পূর্বেই সাইগারসন সাহেব প্রায় ঠেলিয়াই আমায় গাড়িতে প্রবৃষ্ট করাইলেন।

২।

"এ তো প্রায় মেরে এনেছে হে। আমি কী করব?"

মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। ইদানীং মেডিক্যাল কলেজে আসেন না বিশেষ। প্রিয়নাথকে বিশেষ স্নেহ করেন। তাঁর শিষ্য গোপালচন্দ্র দত্তের সঙ্গে বছর চারেক আগে পরিচয় হয়েছিল প্রিয়নাথের। এখন তিনিই সর্বেসর্বা। তিনিই প্রিয়নাথের কথা বলে মহেন্দ্রলালকে ডেকে এনেছেন।

তারিণীর মাথার ডানদিকে গভীর ক্ষত। কেউ লোহার ডান্ডা বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে সজোরে আঘাত করেছে। আর-একটু জোরে মারলেই মাথা ফেটে

দুইভাগ হয়ে যেত। প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে। এখন ক্ষতস্থানে ভালো করে আয়োডিন, ব্রোমাইড আর পারার ক্বাথ মলমের মতো লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। জ্ঞান নেই। ফিভার হাসপাতাল থেকে ডাক্তার গুডিস এসেছেন। তিনি বলেছেন দু ড্রাম অ্যামোনিয়া, দু ড্রাম ল্যাভেন্ডার আর কর্পুর মিশিয়ে পুলটিস দিতে। সঙ্গে দিনে তিনবার দু গ্রেন ক্যালোমেল। ক্রমাগত বিড়বিড় করে কী যেন বলছে তারিণী। সাইগারসন ইঙ্গিতে প্রিয়নাথকে দরজার বাইরে ডেকে নিলেন।

"ওঁকে এখানে কে ভরতি করল সাহেব?" প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করল।

"আমিই। কাল অনেক রাতে।"

"আপনি কাল কলকাতায় এসেছেন? কেন?"

"তারিণীর সঙ্গে দেখা করতে। কাল দুপুরে ট্রেনে চেপে চুঁচুড়া থেকে এসেছি। এসেই প্রথমে গেলাম তারিণীর আপিসে। দেখি তালাবন্ধ। সেখান থেকে হোটেল। হোটেলে ডিনার সেরে রাতে আবার তারিণীর আপিসে আসি। ও ফিরল কি না দেখতে। এসে দেখি দরজা খোলা। তারিণী দরজার পাশেই পড়ে ছিল। অজ্ঞান। আমিই একটা গাড়ি ডেকে ওকে মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করিয়েছি। ডাক্তার দত্ত তো ছিলেনই। তখন প্রায় যমে মানুষে টানাটানি। আজ সকালে অবস্থা একটু ভালো হতেই আপনাকে ডেকে আনতে যাই।"

"কিন্তু আপনিই বা সাততাড়াতাড়ি তারিণীকে খুঁজতে এলেন কেন? কিছু আন্দাজ করেছিলেন?

"আপনার কাছে খবরটা আসেনি তাহলে।"

"কী খবর?"

"চুঁচুড়ায় তারিণীর বাড়ি আছে জানেন তো?"

"হ্যাঁ। ও বলেছিল বটে।"

"বাড়ির নাম জানেন?"

"জানি না।"

"CONCORDIA। এবার কিছু বুঝলেন?"

"না সাহেব।"

"কনকরডিয়া রোমের দেবী। ঐক্যের দেবী। যিনি সবাইকে এক নীতিতে, এক আইনে বেঁধে রাখেন। ফ্রিম্যাসনরা শুরু থেকেই এই দেবীকে খুব মানত। বিশ্বাস করত কেউ কনকরডিয়ার আইন ভাঙলে তার শাস্তি হয়। শাস্তি দেন জাবুলন নিজে। একেবারে প্রাচীনকালে ফ্রিম্যাসনদের অনুষ্ঠান শুরু হত এই

দেবীর আরাধনা দিয়ে। তাতে একটাই বাদ্যযন্ত্র বাজত। কী বলুন তো?"

"জানি না।"

"অ্যাকর্ডিয়ন। এর দুটো কারণ। একে তো গোটা অ্যাকর্ডিয়ন একসঙ্গে বাজে। একসঙ্গে খোলে আর বন্ধ হয়। কনকরডিয়ার ঐক্যের মতো। তবে আসল কারণটা অন্য। সেটা আমি ভেবে বার করেছি।"

"কী সেটা?"

সাইগারসন পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবই বার করে বড়ো বড়ো করে লিখলেন CONCORDIA। এবার অক্ষরগুলো একটু উলটেপালটে দিলেন—ACCORDION।

"চুঁচুড়ার এই বাড়ি এককালে ফ্রিম্যাসনদের ঘাঁটি ছিল। ডাচ ফ্রিম্যাসনদের শুরু এখান থেকেই। ডাচ শাসক ভার্নেৎ নিজে ফ্রিম্যাসন ছিলেন। তিনিই চুঁচুড়ায় প্রথম ম্যাসনিক লজ স্থাপন করেন। এই সেই কনকরডিয়া। পরে ইংরেজরা চুঁচুড়ার দখল নিলে এই বাড়ির হাতবদল হয়। তখন তারিণীরা এই বাড়ি পেয়েছে। ও নিজেও ব্রাদারহুডের সদস্য। সেটা তো জানেনই।"

"তা তো জানি। কিন্তু এর সঙ্গে..."

"যেটা সেদিন আপনাদের বলেছিলাম। ব্রাদারহুড একেবারে শান্তিপ্রিয় হলেও জাবুলন তা না। ফ্রিম্যাসনদের মধ্যে যিশুর বাণী প্রবেশের পর তারা অহিংসায় বিশ্বাস করা শুরু করেছে। কিন্তু জাবুলনরা এখনও প্রাচীন রোমের কায়দায় শাস্তি দিতে পছন্দ করে।"

"সেটা কেমন?"

"ফ্রিম্যাসনদের এই চরমপন্থী দলের শুরু করেন অরিজেন নামের এক সাধু। নিজেকে ঈশ্বর ভাবতেন তিনি। নিজের পাপ স্খলন করতে নিজের হাতে নিজের অণ্ডকোশ কেটে ফেলেন। এখনও তাঁর উদাহরণ দেওয়া হয়। এই অরিজেন জাবুলনদের কাছে যিশুর সমান। কিংবা তাঁর চেয়েও বড়ো। কেউ বেইমানি করলে জাবুলনরা তাকে শাস্তি দেয়।"

"কীভাবে?"

"ঠিক যেভাবে অরিজেন নিজেকে শাস্তি দিয়েছিলেন। অণ্ডকোশ কেটে দেয়। হত্যা করে। তারপর সেই কাটা অণ্ডকোশ তার মুখে পুরে দেয়। তাদের বিশ্বাস এতে পরকালে গিয়েও সে কথা বলতে পারে না।"

"কিন্তু এত কিছু আপনি জানলেন কী করে?"

"গত পরশু চুঁচুড়ায় আমার কাছে এক আগন্তুক এসেছিল। তাকে আগে

দেখেনি। দারোয়ান তাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু সে বলে সে তারিণীর বন্ধু। আমি তাকে ঢুকতে দিয়েছিলাম। লোকটি আমাকে কিছু অদ্ভুত তথ্য দেয়। বলে সে রাজভক্ত আর ইংরাজ সরকারের ভয়ানক বিপদ আসতে চলেছে। আমি যদি তাকে সহায়তা করি সে ইংরাজ সরকারকে রক্ষা করতে পারবে।"

"তারপর?"

"আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, ও আমার কাছে এল কেন? খোঁজই বা পেল কী করে? সে জানায় সে নাকি লুকিয়ে তারিণীর ডায়রি পড়ে আমার উল্লেখ পেয়েছে। চার বছর আগেকার যে ঘটনা কলকাতায় খুব বেশি লোকের জানার কথা না, তা সে জানে। জানে ইংরেজ সরকারে আমার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। শুনলাম আপনি যখন তারিণীর আপিসে গিয়ে তারিণীকে চুঁচুড়ায় আমার ঠিকানা দেন, সেই সময় সেই ঘরে সে উপস্থিত ছিল। তারিণী ঠিকানা লেখা কাগজটা টেবিলে রেখেই বাইরে বেরিয়ে যায়। এই লোকটি বোঝে আমি চুঁচুড়ায় এসেছি। কিন্তু তারিণী আসার আগে ইচ্ছে করে আসেনি। তাতে তার কাজের ক্ষতি হত।"

"আপনি তার কথায় বিশ্বাস করলেন?"

"প্রথমে করিনি। তারপর সে বলল কারা এর পিছনে আছে সে জানে।"

"কারা?"

"জাবুলন।"

"বলেন কী? এই লোকটি নিজের নাম বলেছে? শৈলচরণ সান্যাল কি?"

"হ্যাঁ। তারপর সে আমায় জাবুলন নিয়ে কিছু গোপন কথা জানায়। সেগুলো তো আমি আপনাকে বললামই। কিন্তু এতটুকুই। আমি জাবুলনের সদস্যদের নাম জানতে চাই। বলেনি।"

"কেন?"

"শৈলচরণ বলে ওর কাছে সব প্রমাণ আছে। ও সব বলবে। কিন্তু তার আগে ওর প্রচুর টাকা চাই। প্রচুর।"

"প্রচুর মানে কত?"

"পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।"

"বলেন কী?" চমকে উঠল প্রিয়নাথ।

"আমিও ওকে তাই বললাম। ও জানাল ওর কাছে যা খবর আছে সেই তুলনায় এই পরিমাণ নাকি কিছুই না। ইংরেজ সরকার যদি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চায় তবে এই টাকাটা ওকে দিতেই হবে।"

"আপনি রাজি হলেন?"

"আমি সময় চাইলাম। পনেরো দিন। আমাকেও তো টেলিগ্রাফে লন্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।"

"সে কী বলল?"

"বলল সময় বেশি নেই। বেশি দেরি করলে সে অন্য উপায় দেখে নেবে। তার সঙ্গে নাকি অনেকেই যোগাযোগ করেছে। আর সে ব্যবস্থাও নাকি আগেই সে করে এসেছে।"

"আর কিছু বলল?"

"আর বলল, সে যে এসেছিল, সেটা যেন তারিণী ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে। তারিণীকে জানালে সে আর একটা কথাও বলবে না।"

"বুঝলাম। তাহলে আপনি কাল তারিণীর খোঁজে এসেছিলেন কেন?"

"আমার মনে হচ্ছিল তারিণীর এবার কোনও ভয়ংকর বিপদ হতে পারে। প্রাণসংশয় অবধি। আমায় ওকে জানাতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

"কিন্তু কেন?"

সাইগারসন এতক্ষণ দরজা দিয়ে বেডে শুয়ে থাকা তারিণীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহ। এতক্ষণে আসল কথাটাই বলা হয়নি। কলকাতায় খবরটা আসেনি এখনও। কাল খুব ভোরে তারিণীর বাড়ির সামনে কেউ সেই শৈলচরণকে খুন করে রেখে গেছে। পেট চিরে দুইফালা। অণ্ডকোশ কেটে মুখে পুরে দিয়েছে।"

পঞ্চম পর্ব— ভয়াবহ স্বাভাবিক কথা

১।

আজ রবিবার। লালমোহন মল্লিকের বাড়িতে ভিড় অন্যদিনের তুলনায় ঢের বেশি। একে তো আজই গণপতির জাদু দেখানোর শেষ দিন, তার উপরে ঘোষণা করা হয়েছে আজ নাকি গণপতি কিছু "ইস্পেশাল" খেলা দেখাবেন। বাড়ির বাইরে প্রচারপত্র পড়েছে সেইমতোই।

সন্ধ্যা হতে না হতেই আজ ভিড় বাড়ছে। এমনিতেই গণপতির খেলায় লোকের অভাব হয় না। তার উপরে আজ আবার স্পেশাল কী হতে পারে তা ভেবে যাঁরা আগে একবার দেখে গেছেন, তাঁদের অনেকেই আবার টিকিট
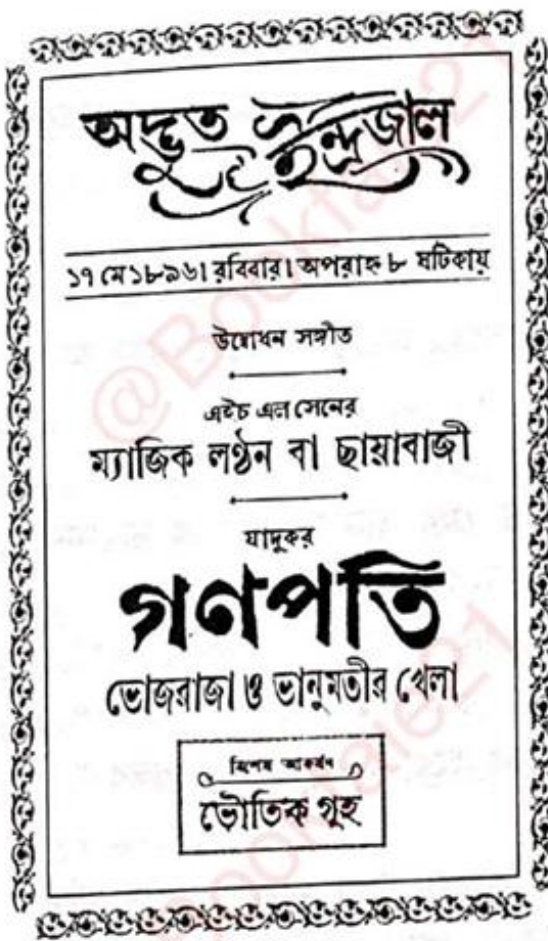
কেটেছেন। দুপুর হতে না হতেই টিকিট শেষ। লালমোহন মল্লিকের বাড়ির পাশের টিকিটঘরের ঝাঁপ পড়ে গেছে। সবাই গুনগুন করে আলোচনা করছেন এই গণপতি নাকি প্রেতসিদ্ধ। হিমালয় থেকে একটা ভূত এনে পুষে রেখেছেন। আত্মারাম নামের সেই পোষা ভূত নাকি আজ সশরীরে মঞ্চে আসবে। এর আগে তার গলার আওয়াজ শুনে গেছেন অনেকেই। স্টেজে নীল আলোর সামনে দাঁড়িয়ে গণপতি তার পোষা ভূতকে ডাকে, "আত্মারাম, এবার আমার গেলাসের ভিতর চলে এসো।" ভূত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "এঁসেছি হুঁজুর, কীঁ বলবঁ বঁলুন।" গণপতি জিজ্ঞেস করে, "তা তুমি এখন আসছ কোথা থেকে?" ভূতের উত্তর নেই। গণপতি রেগে যায়, "বলি কানে কি ঠুলি গুঁজেছ? আসছ কোথা থেকে?" আবার উত্তর নেই। শেষে জানা যায় এতদূর থেকে আসতে গিয়ে তার গলা শুকিয়ে হেঁচকি উঠছিল। তাই সে উত্তর দিতে পারেনি। সমবেত দর্শক হো হো করে হেসে ওঠেন। গণপতি হেসে হারমোনিয়াম টেনে গান ধরে,

"জীবন ফুরায়ে এল কোথা প্রাণধন/ প্রাণ লয়ে পলাইল, না এল এখন।" গণপতির জাদুতে এই হাসি ঠাট্টার পরিবেশ শুরু থেকেই থাকে।

কিন্তু আজ যাঁরা বাঁধা মঞ্চে ঢুকলেন, তাঁরা সবাই বুঝলেন গুরুতর কিছু একটা হতে চলেছে। আগে যাঁরা এসেছেন তাঁরা জানেন শুরুতে সানাই বাজে পুরিয়া ধানেশ্রীতে। আজ তার বদলে খুব ধীর লয়ে কোথাও একটা ড্রাম বাজছে গুমগুম শব্দে। গোটা মঞ্চের আলো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বল হলুদ পর্দার জায়গা নিয়েছে কালচে লাল ভারী পর্দা। উৎসবের যে মেজাজ এতদিন ছিল, তা আজ একেবারে ভ্যানিশ। সকাল থেকে নিজের ঘর ছেড়ে বেরোয়নি গণপতি। বারবার ধ্যানে বসার চেষ্টা করেছে। ইষ্টনাম জপ করেছে। কিছুতেই মন বসাতে

পারছে না। আজকেই হয়তো শেষবারের মতো তার মঞ্চে খেলা দেখানো। যে জাদুর খেলা দেখাবে বলে সে জীবনের অনেক কিছুকেই বাজি রেখেছিল, আজ বুঝি সব শেষ হতে চলেছে। গণপতি জানত এই দিনটা একদিন না একদিন আসবে। কিন্তু এত দ্রুত, তা টের পায়নি। সেদিন তারিণী তার হ্যান্ডবিলের সঙ্গে আরও একটা পাতলা বিজ্ঞাপনের কাগজ দিয়ে গিয়েছিল। সাদা চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু সেই "টাইট ব্রেস্টের" বিজ্ঞাপনে এমন কিছু ছিল, যাতে গণপতি বুঝতে পেরেছে শিয়রে শমন। এবার তার ডাক এসেছে। সংঘের ডাকে দরকার হলে তাকে প্রাণও দিতে হতে পারে। বহু বছর আগে হরিদ্বারে এমনটাই তো কথা দিয়েছিল সে লখনকে। কথার খেলাপ করার উপায় নেই। খুনের মামলা তামাদি হয় না। ওখানকার পুলিশ হয়তো এখনও তাকে পিন্ডারী বাবার খুনের মামলায় খুঁজে বেড়াচ্ছে! এদিকে লখনের কথা শোনা মানে নিজের বিবেককে আবার বিসর্জন দেওয়া।

তবে গণপতি ঠিক করে নিয়েছে। আজকে তার শেষ খেলা। আর এই খেলাই হবে তার জীবনের সেরা খেলা। যাতে সে মারা গেলেও লোকে বলতে পারে খেলার মতো খেলা দেখাত একজনই। জাদুকর গণপতি চক্রবর্তী। আজকের খেলার জন্য কাঠের বিরাট একটা ক্যাবিনেট বানানো হয়েছে। যে খেলা আজ সে দেখাবে, ভারতে আজ অবধি তেমন খেলা কেউ দেখেনি। দেখবেও না। উইংসের পাশ থেকে ভাবলেশহীন চোখে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ছিল গণপতি। উদ্বোধনী সংগীত শেষে মঞ্চের পিছনে চুন পোড়ানো আলো জ্বালিয়ে পর্দায় প্রোজেক্টার দিয়ে নিজের তোলা নানা অদ্ভুত অদ্ভুত ফটো দেখাচ্ছে হীরালাল। খুব হালকা চালে পিয়ানো বাজছে। আমোদগেঁড়ে দর্শক সেসব ফটোগ্রাফ দেখেই বেজায় হাততালি দিয়ে "বাহবা বাহবা" করছে। বেশিরভাগই কলকাতা শহরের ছবি। রাস্তাঘাট, মানুষ, সাপুড়ে, এক্কাগাড়ি, মানুষজন। তারপরেই কলকাতার বিখ্যাত সব জায়গার ছবি। মেডিক্যাল কলেজ, মনুমেন্ট, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ওয়াজেদ আলির মিনাজারি, হাওড়া ব্রিজ, দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির (যা দেখেই দর্শকরা প্রায় সকলেই মাথায় হাত ঠেকাল), রাজভবন। এতক্ষণ বেশ নিরাসক্তভাবেই ছবি দেখছিল গণপতি। রাজভবনের ছবিটা দেখাতেই চমকে উঠল। রাজভবনের সামনের পথে একটা লোক। একটা লোক, যাকে সে চেনে। জানে সে সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। খুনি মাকড়সা যেমন জালের ঠিক মাঝে বসে থাকে, আর পায়ের সামান্য নড়াচড়ায় জালের যে-কোনো প্রান্তের সামান্য কম্পন টের পায়,

এও সেরকম। গত চার বছর গণপতি একে দেখেনি। শুধু নানা ইঙ্গিতে বুঝেছে সে আছে। শুধু আছেই না। মাটির তলায় জমতে থাকা আগ্নেয়গিরির লাভার মতো শক্তিবৃদ্ধি করছে। হয়তো এবার চরম আঘাত হানার পালা। তাই গণপতির ডাক এসেছে।

গণপতি বুঝতে পারল হীরালাল নিজের অজান্তেই ভয়ানক একটা কাজ করে ফেলেছে। যে লোক মানুষের স্মৃতিতেও থাকতে নারাজ, সিলভার ব্রোমাইডের কাচের প্লেটে হীরালাল তার ছবি তুলে নিয়েছে। খুব সম্ভব সে এটা জানে না। জানলে... প্রবল করতালিতে ভরে উঠল প্রেক্ষাগৃহ। হীরালালের ছবি দেখানো শেষ।

এবার ঘোষক এসে ঘোষণা করলে, "হিমালয় থেকে আসল ভারতীয় জাদু শিখে আসা গণপতি এখন তাঁর অতি অপূর্ব জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করবেন।" নাম ঘোষণা মাত্র আবার করতালি। প্রতিদিন গণপতি স্টেজের পাশ থেকে প্রায় লাফিয়ে ভিতরে ঢোকে। আজ ঢুকল অতি শান্তভাবে। উইংসের পাশ থেকে। মুখমণ্ডল গম্ভীর। যেন কোনও অনাগত বিপদের প্রতীক্ষায়। গণপতির প্রবেশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চের পিছনে দিকে বিরাট এক কাঠের ক্যাবিনেট ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ক্যাবিনেটের গায়ে বিচিত্র সব চিত্র। যেন একদল প্রেত মহানন্দে নৃত্য করছে। গণপতির সেদিকে খেয়াল নেই। সে প্রথমে দর্শকদের প্রণাম করেই শুরু করল তাসের ম্যাজিক। এক হাত ভর্তি তাস মুহূর্তে অন্য হাতে চলে যাচ্ছে, হরতনের বিবিকে আকাশে ছুড়তেই রুইতনের টেক্কায় পরিণত হচ্ছে, এক বান্ডিল তাস থেকে যতই তাস ফেলা হোক, হাতের তাসের সংখ্যা কমছে না। শেষে গণপতির পায়ের কাছে তাসের পাহাড় জমে গেল। কিন্তু হাতে সেই সাতটা তাস। দর্শক এমন খেলা আগে দেখেনি। যারা দেখেছে তারা আবারও মুগ্ধ।

এবার প্রিজন অ্যাক্ট বা বসুদেবের কারামুক্তি। গণপতি উইংসের ভিতরে গিয়েই বেরিয়ে এল অন্য পোশাকে। খালি গা। পরনে খাটো ধুতি। এত দ্রুত সাহেবি পোশাক থেকে এই পোশাক পরিবর্তন-ও এক ম্যাজিক বইকি! দর্শক আনন্দে হাততালি দিল। গণপতি বসুদেব সেজেছে। তার কোলে শিশু শ্রীকৃষ্ণ। মঞ্চের পিছন থেকে ভেসে আসছে সেই শিশুর কান্নার আওয়াজ। হলের সবাই একসঙ্গে হরি হরি করে উঠল। ধীর পায়ে বসুদেবরূপী গণপতি কারাগারে প্রবেশ করল। তার দুই হাত, দুই পা, কোমরে দশ গাছা ভারী ভারী মোটা লোহার শেকল, হাতকড়া, লোহার বেড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। ফেলে দেওয়া

হল পর্দা। বিবেক এসে করুণ স্বরে গাইতে লাগল, "যাও যাও বসুদেব, যাও ত্বরা গোকুলে/ এমনি নিঠুর কংস/ এখনি করিবে ধ্বংস/ পায় যদি তোমার ওই কালো ছেলে।" গান শেষ হতেই পর্দা উঠে গেল। কেউ নেই। বসুদেব নেই। কৃষ্ণ নেই। কারাগার ফাঁকা। দর্শকরা হতবাক। কোথায় গেল গণপতি?

এমন সময় চারিদিকে বেজে উঠল শঙ্খ। উলুধ্বনি। মঞ্চের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে দর্শকদের মধ্যে দিয়ে ছেলে কোলে হেঁটে আসছেন, উনি কে? গণপতি না? চারিদিকে হাততালির শব্দ আর "হরি, হরি" আওয়াজে কান প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। অন্যদিন গণপতি এইখানে দর্শকদের সঙ্গে কিছু রহস্যালাপ করে। আজ সে সময় নেই। ইচ্ছেও নেই বোধহয়। অতি দ্রুত আবার সাহেবি পোশাকে ফিরে এসে টেবিল ওড়ানো, মড়ার খুলির মুখে সিগারেট দিয়ে সিগারেট খাওয়ানো, একটা লোহার বলকে ইচ্ছেমতো দিকে চালনা ইত্যাদি সহজ জাদুগুলো দেখিয়ে সরাসরি চলে এল সেদিনের স্পেশাল জাদুতে।

শুরু থেকে তখন অবধি একটাও শব্দ উচ্চারণ করেনি গণপতি। যারা তার নিয়মিত দর্শক তাদের কাছে এটা বেশ আশ্চর্যের। স্পেশাল অ্যাক্ট দেখাবার ঠিক আগে বুকের কাছে দুই হাত জোড় করে মঞ্চের মাঝে এসে দাঁড়াল গণপতি। পরনে সাহেবি ফ্রক কোট। বুকে খানকয়েক মেডেল। এর আগে নানা জায়গায় ম্যাজিক দেখানোর পুরস্কার। গম্ভীর গলায় কথা বলতে শুরু করল গণপতি—

"মশাইরা, আমি নেহাতই সাধারণ এক জাদুকর। ভোজবাজির খেলা দেখাই। এমন দিন গেছে যখন রাস্তায় মাদারির সঙ্গে খেলা দেখিয়েছি। বেদেদের কাছে খেলা শিখেছি। কোনও দিন ভাবিনি মঞ্চে এত মানুষের সামনে খেলা দেখানোর সুযোগ পাব। যাঁদের দয়ায় এ সুযোগ পেলাম, তাঁরা আমার কাছে ভগবানের মতো। সেই ভগবান যেমন দুই হাত উপুড় করে দেন, তেমনি আবার ফিরিয়েও নেন মর্জিমতো। যে বিদ্যা তাঁরা আমায় দিয়েছেন আজ হয়তো তাঁরাই আবার সেটা ফিরিয়ে নিতে চাইছেন। ভাগ্যের উপরে কার হাত আছে? তবে মঞ্চ ছেড়ে যাবার আগে আজ আমি আমার সেরা খেলাটা দেখিয়ে যাব। এ খেলার নাম ভৌতিক জাদুর গৃহ। এই যে গৃহটি দেখছেন সেখানে আমাকে বেঁধে রাখা হবে চোখ বন্ধ করে।"

গণপতি মঞ্চের মাঝে রাখা ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে ডালা খুলে দেয়। ক্যাবিনেটের তিনটে অংশ। দুইপাশে বেহালা, বাঁশি, তবলা, হারমোনিয়াম, সেতার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ঝোলানো। মধ্যিখানে বসানো দুটো কাঠের চেয়ার।

"আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ক্যাবিনেট খালি। পিছনে কাঠের দেওয়াল। কেউ ঢুকতে বা বেরোতে পারবে না। আপনারা এসে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফলে ঢোকার বা বেরোবার একমাত্র উপায় আপনাদের চোখের সামনে দিয়ে। এর মধ্যে একটা চেয়ারে বসব আমি। আমার হাতে প্রথমে হাতকড়া পরিয়ে দেবেন দর্শকদের মধ্যেই কেউ। তারপর অন্য একজন এসে এই চেয়ারের পিছনে দড়ি দিয়ে আমার হাতদুটো বেঁধে দেবেন। অন্যজন চেয়ারের পায়ার সঙ্গে বেঁধে দেবেন পা। চতুর্থজনের কাজ সবচেয়ে কঠিন। তিনি আমার চোখ আর মুখ একখণ্ড কাপড়ে বেঁধে গোটা দেহ এই চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেবেন। দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আমার সামনের এই চেয়ারে আমি আমার গুরুদেবের প্রেতাত্মাকে আহবান করব। তিনি আসবেন। তিনি যে এসেছেন তাঁর সংকেত আপনারা পাবেন এই বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে। তিনি এই প্রতিটি বাদ্যযন্ত্র নিজে বাজাবেন। তারপর বিদায় নেবেন। তিনি বিদায় নিলে সামনের চেয়ারে রাখা ঘণ্টা বেজে উঠবে। তখন দর্শকদের কেউ ভিতরে এসে আমায় উদ্ধার করবেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন এই বন্ধন সব অটুট আছে কি না। তবে একটাই অনুরোধ। আমার গুরুদেব বড়ো সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। বাজে লোকেদের সংস্পর্শ পছন্দ করতেন না বিশেষ। আপনারা এই গোটা অ্যাক্টোতে কেউ কোনও শব্দ করবেন না। এমনকি নিঃশ্বাসও জোরে ফেলবেন না। বাবার আত্মার কষ্ট হবে।"

আবার গমগম করে ড্রাম বেজে উঠল। গোটা ঘরে শ্মশানের নীরবতা। গণপতি চেয়ারে গিয়ে বসল। দর্শকদের থেকে চারজন উঠে গিয়ে তার হাত, পা, চোখ, দেহ বেঁধে দিল। এত আঁট করে যে, গণপতির নড়াচড়া তো দূরে থাক, শ্বাস নেওয়াই দুষ্কর। এরপর দুই সহকারী এসে কাঠের ক্যাবিনেটের ডালা বন্ধ করে দিল। ড্রামের আওয়াজও বন্ধ। একটা পিন পড়লেও শোনা যাবে। আচমকা মনে হল কাঠের ক্যাবিনেটটা যেন নড়ে উঠল। তারপরেই ধাঁই ধপাধপ বেজে উঠল তবলা। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক, দর্শকদের অনেকেই চিৎকার করে উঠল ভয়ে। তারপর যা হল তা আর কহতব্য নয়। একইসঙ্গে বাজতে লাগল বাঁশি, হারমোনিয়াম আর সেতার। করুণ সুরে বাজছে বেহালা। কেউ যেন পাগল হয়ে গিয়ে এক রসাতলের সুরে বাঁধতে চাইছে গোটা জগৎসংসারকে। মহিলাদের অনেকে ভয়ে রামনাম শুরু করলেন। কেউ কেউ কান চেপে ধরে রাখলেন এই নারকীয় সংগীত শুনবেন না বলে। মায়ের কোলের শিশুরা কেঁদে উঠল। আওয়াজ চলছেই। আর সঙ্গে সঙ্গে দুলে দুলে উঠছে সেগুন কাঠের ভারী ক্যাবিনেট। যেন

হালকা শোলার খেলনা। খানিক বাদেই দর্শকদের থেকে ভয়াল চিৎকার শুরু হল, "বন্ধ করো। বন্ধ করো।" কেউ কেউ উঠে পালাবার উপক্রম করলে। এমন সময় ঘণ্টার আওয়াজ। সব স্তব্ধ। আবার আগের মতো। যেন এতক্ষণ ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন চলছিল গোটা মঞ্চে।

সহকারীরা এসে দুইদিকের দুটো পাল্লা খুলে দিল। বাদ্যযন্ত্ররা একেবারে আগের জায়গায়। যেন কুটোটিও তাদের স্পর্শ করেনি। শুধু মাঝের পাল্লাটি বন্ধ। এবার সহকারীদের একজন অনুরোধ করল দর্শকদের মধ্যে থেকে কাউকে উঠে এসে পরীক্ষা করে দেখতে যে বাঁধন সব ঠিক আছে কি না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেউ কিছু বোঝার আগেই দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন মঞ্চে উঠে সহকারীকে প্রায় ঠেলে পাশের দরজা দিয়ে ক্যাবিনেটের মধ্যে ঢুকে গেল।

মাঝের দরজা বন্ধ। ড্রিম ড্রিম করে আবার ড্রাম বাজা শুরু হয়েছে। সহকারীরাও বুঝতে পারছে না কী করবে। এমন অবস্থায় কী করতে হবে সে নির্দেশ তাদের দেওয়া নেই।

এক মিনিট। দুই মিনিট। পাঁচ মিনিট বাদে দুই সহকারী দুই দিক থেকে খুলে দিল মাঝের ক্যাবিনেট। এ যেন সেই আগের ম্যাজিকেরই পুনরাবৃত্তি। একগাদা দড়িদড়া পড়ে আছে। হ্যান্ডকাফ গড়াগড়ি খাচ্ছে। ভিতরে গণপতি নেই। শুধু গণপতি না, যে লোকটি এইমাত্র ঢুকল সেও ভ্যানিশ।

সব দর্শকের দৃষ্টি গেল দরজার দিকে। এই বুঝি আগের মতো দরজা দিয়ে ঢুকবে গণপতি। তারা জানত না, ম্যাজিশিয়ান এক ম্যাজিক দুইবার দেখায় না।

"সর্বসমক্ষে গণপতি অন্তর্হিত হইলেন।"

২।

লালবাজারে প্রিয়নাথের কামরার আলোটা আজকেও জ্বলছে। রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। প্রিয়নাথের সামনের চেয়ারে গণপতি বসা। তার মুখের হতভম্ব ভাব কাটেনি এখনও। অনেক সময় জাদুকরকেও যে কেউ ভ্যানিশ করে দিতে পারে, তা তার দূরাগত কল্পনাতেও ছিল না। জাদুশেষের পর ঘণ্টা বাজতেই গণপতি আবার ঠিক আগের মতো নিজেকে বেঁধে ফেলেছিল। এই বন্ধন খোলা-বন্ধ করা তার কাছে ছেলেখেলার মতো। যেটা কষ্টকর সেটা হল একসঙ্গে এতগুলো বাদ্যযন্ত্র বাজানো। তাও এমন ছোটো জায়গায়। কিন্তু ঠিকঠাক করতে পারলে ফল হয় মারাত্মক। দর্শকদের চিৎকার, ভয়ার্ত আর্তনাদের আওয়াজ মোটা কাঠের পাল্লা ভেদ করে গণপতির কানে গেছে। এত কষ্টের মধ্যেও

গণপতির মন ভরে গেছে। অন্তত তার শেষ খেলায় সে মানুষের মন জয় করতে পেরেছে। এবার দর্শকদের থেকে মধ্যে থেকে একজন উঠে এসে তার বন্ধন পরীক্ষা করে জানাবেন সব ঠিক আছে। তারপরেই গণপতির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। খুললে দেখা যাবে সে বন্ধনমুক্ত। আবার দরজা বন্ধ হবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেখা যাবে কেউ নেই। গণপতি বিদায় নেবে।

কিন্তু এই শেষটাই অন্যরকম হয়ে গেল। দর্শকদের থেকে একজন উঠে এল। তারপর নিয়মমাফিক মাঝের দরজা দিয়ে না ঢুকে পাশের দরজা দিয়ে এসে সোজা বসে পড়ল গণপতির সামনে। চোখ বন্ধ থাকলেও সব বুঝতে পারছিল গণপতি। কিন্তু সে কিছু করার আগেই তার বাড়ানো দুই হাতের হাতকড়ার ঠিক ওপরে ক্লিক করে পরিয়ে দিল আরও একজোড়া হাতকড়া। নিজের হাতে এই কড়াকে আজ অবধি অনুভব করেনি গণপতি। কিন্তু হাত সামান্য নাড়তেই সভয়ে টের পেল এটা কী জিনিস। ম্যাজিক সার্কেলে এই হাতকড়াকে এখনও জব্দ করতে পারেনি কেউ। শোনা গেছে হুডিনিও নাকি পরাস্ত হয়েছিলেন। এ জিনিস ইংরেজদের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন না। খাঁটি ফরাসি। নাম পুসে। যত হাত নাড়ানো হয় কড়ার লোহা হাতের মাংস কেটে বসে যেতে থাকে। এই হাতকড়া তো একমাত্র পুলিশের কাছে থাকাই সম্ভব! তবে কি?

এই গোটা চিন্তাটা গণপতির মাথায় আসতে কয়েক সেকেন্ড মাত্র লাগল। তারপরেও যা সন্দেহ ছিল দূর হল আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে। "তোমার কাছে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে জাদুকর গণপতি। যা যা জানো সত্যি করে বলবে, না চার বছর আগে সেই চিনাপাড়ায় যেমন মিথ্যে কথা বলে চোখে ধুলো দিয়েছিলে, তেমন দেবে?"

গলার স্বরেই গণপতি প্রিয়নাথকে চিনতে পেরেছিল, চিনাপাড়ার উল্লেখে সেই সন্দেহও রইল না। সে উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল। বাইরে ড্রামের শব্দ বাড়ছে।

প্রিয়নাথই আবার কথা বলা শুরু করল, "শৈলকে কাল কেউ খুন করে তারিণীর দেশের বাড়ি ফেলে এসেছে। বীভৎস খুন। তারিণীকেও খুন করার চেষ্টায় ছিল। কিছুক্ষণ আগে জ্ঞান এসেছে।"

এইটুকু বলে প্রিয়নাথ অপেক্ষা করল গণপতি কী বলে তা দেখার জন্য। গণপতি সেই চোখ বাঁধা অবস্থাতেই একটু চমকে উঠল।

"আমার কথা আপনাকে কে বলল?"

"তারিণী। জ্ঞান ফেরার পর শুধু তিন-চারটে কথাই বলতে পেরেছে। তার মধ্যেও বারবার বলছিল, গণপতিকে বাঁচান। ওরা এবার ওকে মারবে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম আজকেই তোমার শেষ শো। আর তারপর তুমি হয়তো গায়েব হয়ে যাবে। তাই বাধ্য হয়ে এখানেই তোমায় ধরলাম।"

বাইরে ড্রামের শব্দ বাড়ছে। অস্থির দর্শকদের কেউ কেউ বলছে দরজা খুলতে। সহকারীরা খুলছে না। তারা জানে দরজা খোলার কথা গণপতির নিজের। ম্যাজিকে একটু এদিক ওদিক হলে প্রাণসংশয় অবধি হতে পারে।

"আমাকে কী করতে হবে?"

"দুটো পথ তোমার কাছে খোলা। এক, আমি সবার সামনে দিয়ে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তোমাকে টানতে টানতে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে তুলব। তাতে যা বদনাম হবে, তার জেরে তোমার জাদু দেখানো চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবে। অথবা..."

"অথবা?"

"আমি জানি প্রতি জাদুকর পালানোর জন্য একটা গোপন পথ খোলা রাখে। এই বাক্সতেও নির্ঘাত তেমন আছে। আমরা দুইজন সেই পথে পালিয়ে সোজা লালবাজার যাব। সাইগারসন সাহেবও সেখানেই অপেক্ষা করছেন। এবার বলো তুমি রাজি কি না।"

"কিন্তু আমার ম্যাজিক?"

"তুমি যা ঘোষণা করেছিলে তাই তো হচ্ছে। সকলের সামনে থেকে তুমি অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

দর্শকদের আওয়াজ বেড়েই চলছে। সবাই বলছে দরজার পাল্লা খুলে দিতে। এখুনি হয়তো দরজা খোলা হবে।

"এই মেঝেটা আলগা। ফলস স্টেজ। ঠেলে সরিয়ে দিলেই আমরা নিচের একটা গুপ্তঘরে গিয়ে পড়ব। এমনভাবেই স্টেজ বানানো। সেই তৈমুরের মতো।"

"বুঝে গেছি।" বলে এক ধাক্কায় মেঝেটা সরিয়ে প্রিয়নাথই বলল, "এসো তবে।"

৩।

সামনে রাখা জলের গেলাস থেকে এক ঢোঁক জল খেয়ে গণপতি বলা শুরু করল।

"আমায় ক্ষমা করুন। আমি বুঝতে পারিনি। আমি শুধু আদেশ পালন করেছিলাম। আমাকে ওটাই করতে হবে। কিছু জানা যাবে না, কিছু জিজ্ঞাসা

করা যাবে না। শুধু আদেশ পালন। বুঝতে পারিনি সেটা করতে গিয়ে আমার খুব কাছের দুই বন্ধুর প্রাণসংশয় হবে।"

গণপতির কথাগুলো সাইগারসনকে সংক্ষেপে ইংরাজিতে বুঝিয়ে বলছিল প্রিয়নাথ। সাইগারসন বললেন, "শুরু থেকে বলতে বলো।"

প্রিয়নাথ সেটা বলতেই গণপতি বলল, "হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন... শুরু থেকে। জানেন তো অর্ধেক সত্য মিথ্যার চেয়ে ভয়ানক। চার বছর আগে সেই শীতের রাতে চিনাপাড়ায় আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলিনি। যা বলেছি, তা অর্ধেক সত্য। আর সেটাই তদন্তকে ভুল পথে চালানোর জন্য দরকার ছিল। আমাকে তেমনই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যেমন আপনাকে বলেছিলাম, আমি বড়ো বাড়ির ছেলে, বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম, সব সত্যি। পালিয়ে হরিদ্বারের কাছে এক বেদের শিষ্য হই। তাঁর নাম পিন্ডারী বাবা। আমার আগে তাঁর আরও এক চ্যালা ছিল। তার আসল নাম কেউ জানে না। সবাই তাকে লখন বলে ডাকে।"

এটা শুনেই প্রিয়নাথ চমকে উঠল একটু। সাইগারসনকে জানাতে তিনি মুখে কিছু না বললেও বোঝা গেল তিনিও আগ্রহী হয়েছেন। নিজের চেয়ারে একটু এগিয়ে বসলেন তিনিও। মুখে কোনও কথা নেই। নিষ্পলক দৃষ্টি সোজা গণপতির দিকে। প্রিয়নাথ জানে তার মতো সাইগারসনও ডালান্ডা হাউসের লখনকে ভোলেননি।

"তারপর?"

"আমি যখন প্রথম দেখি, লখনের বয়স কুড়ির নিচে। পিন্ডারী বাবার চেলা হলেও দারুণ ইংরাজি আর হিন্দি বলতে পারত। মিশত ফিরিঙ্গি ছেলেদের সঙ্গে। এমনকি আমার মনে হত পিন্ডারী বাবাও ওকে সমঝে চলতেন। একদিন পিন্ডারী বাবা আমায় বলেন আমাকে হাতকড়া থেকে মুক্ত হওয়া শেখাবেন। কিন্তু কিছুতেই হাতকড়া খোলা গেল না। লখন খুলে দিল... সেই রাতেই ওরা পিন্ডারী বাবাকে খুন করল।"

"ওরা কারা?"

"লখন আর ওর দলবল। আমাকে রাতে কিছু খাইয়ে দিয়েছিল। সকালে উঠে দেখি ঘাটে পিন্ডারী বাবাকে ঘাটে চিরে ফেলে রেখেছে। পাশে আমি শুয়ে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ওরা বলল পুলিশ নাকি আমাকে খুনের জন্য ধরবে। লখন সেই রাতে ডেরায় ছিল না। ওর বন্ধুরা সাক্ষী দেবে। বাঁচার উপায় একটাই। ওদের কথামতো চলা।"

"তোমাকে ওরা ওদের দলে নিয়েছিল?"

"কোনও দিনও না। ওরা সবাইকে দলে নেয় না। আমাকে শুধু ভয় দেখিয়ে কাজ করাত। নানা জায়গায় ঘুরিয়েছে ওরা। হৃষীকেশ, কাশী, দিল্লি, মথুরা, লখনউ। সব জায়গায় আমার একটাই কাজ ছিল। আমি গেরুয়া বসন পরে সাধু সেজে বসতাম। নাম ছিল "বাবা বাঙ্গালি"। তাঁবু ফেলে জাদু দেখাতাম আর ওষুধ বেচতাম। যেখানেই যেতাম লখন আমায় চোখে চোখে রাখত। তবে পিন্ডারী বাবার ঘটনার পর আমিও ওকে ভয় পেতাম।"

"পিন্ডারী বাবাকে খুন করল কেন?"

"কারণ আজও জানি না। তবে আমাকে বলেছিল বাবা নাকি বাচ্চা ছেলেদের জাদু শেখানোর নামে হাত বেঁধে ভোগ করত। লখন আগে বাবাকে মানা করেছে। ও এসব পছন্দ করত না। বাবা বলেওছিল আর করবে না। তবু আমার সঙ্গে ওইসব চেষ্টা করায় ও বাবাকে মেরে ফ্যালে। বলে ওর দলে নাকি নিয়ম ভাঙলে শাস্তি একটাই। মৃত্যু।"

"ওর দলে আর কে কে ছিল?"

"তা আমার জানা নেই। তবে বেশিরভাগই ফিরিঙ্গি। কখনও একজনকে বেশিদিন দেখিনি। হাবেভাবে যতটুকু মনে হত, ও লোক জোগাড় করছে।"

"কীসের জন্য?"

"জানা নেই। তবে এটা জানি ওর উপরেও কেউ ছিল।"

"কে সে?"

"নাম জানি না। ওদের কথাবার্তায় বুঝতাম। ওরা 'গ্র্যান্ডমাস্টার' বলে ডাকত। এই গ্র্যান্ডমাস্টারকে ওরা ভগবানের মতো ভক্তি করত।"

"তোমার কাজ কী ছিল?"

"ইংরেজ রাজত্বে সবাইকে সন্দেহ করা হয়। শুধু গেরুয়াধারীরা ছাড় পায়। আমি জাতে ব্রাহ্মণ। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করি। ধরা পড়লেও গড়গড়িয়ে মন্ত্র বলে যেতে পারব। তাই হয়তো আমায় দরকার ছিল। আর সাধুরা যখন খুশি, যেখানে খুশি ঘুরেও বেড়াতে পারে।"

"এভাবে চলল কতদিন?"

"বেশ কয়েক বছর। তারপর একবার, আমরা তখন বোম্বেতে। একদিন লখন উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এল। বলল আমাদের আর ঘুরে বেড়াতে হবে না। এতদিনের কষ্ট ফল দিয়েছে। আমি বললাম, কী হয়েছে? ও বলল, এতদিনে ভূতের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের এবার কলকাতা ফিরতে হবে। গ্র্যান্ডমাস্টার আদেশ দিয়েছেন। বললাম, ভূত কী করে? উত্তর দিল, মাথায় ভর করে মাথা চিবিয়ে খায়। আর কিছু বলেনি।"

"সেটা কত সাল?"

"১৮৮৯ কি ৯০ হবে।"

"হিলি নামে কাউকে চেনো?"

চমকে উঠল গণপতি, "হ্যাঁ। এই হিলির থেকেই নাকি ভূতের সন্ধান পাওয়া গেছে। আপনি হিলিকে চেনেন?"

"চিনতাম। সামান্য। তুমি বলতে থাকো। তারপর কী হল?"

"তারপর আমরা কলকাতায় চলে এলাম। কলকাতায় এসে লখন বলল এবার আমার মুক্তি। লখন নিজে কলকাতায় ম্যাসনারিতে যোগ দিল। আমি দিলাম উইজার্ড ক্লাবে। ক্লাবের সন্ধান আমাকে লখনই দিয়েছিল। আমারও স্বপ্ন ছিল জাদুকর হব। ভাবলাম এতদিনে সেই স্বপ্ন সফল হল। কিন্তু লখন আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল। আবার যবে ডাক আসবে, সব ছেড়েছুড়ে আবার রাস্তায় বেরোতে হবে। না হলে আমার অবস্থা পিন্ডারী বাবার মতো করে ছাড়বে।"

"তারিণীর সঙ্গে আলাপ হল কীভাবে?"

"আপনি মনে করে দেখুন, আপনাকে সেই প্রথম দিনই বলেছিলাম দর্জিপাড়ায় রামানন্দ পালের বাড়ি 'নাট্যসমাজ' নামে এক নাট্যচর্চার কেন্দ্র ছিল। সেখানে আমি জাদুকরের ভূমিকায় অভিনয় করতাম। সেই নাটক লিখত শৈল। শৈলচরণ সান্যাল। আগে বামুন ছিল। বাবা তাড়িয়ে দিল। ছেলে নাকি মেয়েলি। চুঁচুড়ায় অক্ষয় সরকারের দল থেকেও তাড়িয়ে দিল। তারপর ন্যাশনাল থিয়েটারের সেই ঘটনা। রেগে গিয়ে শৈল খ্রিস্টান হয়ে গেল।"

"শৈলচরণ খ্রিস্টান?" নিজের অজান্তেই প্রিয়নাথ প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল।

"হ্যাঁ। ওর পুরো নাম ডেভিড শৈলচরণ সান্যাল।"

"কিন্তু সে নাম তো ও ব্যবহার করত না।"

"দরকারে করত। বাঙালি হিন্দুদের কাছে বামুনের ছেলের পরিচয়ই দিত। আবার ম্যাসনারিতে গিয়ে নিজের নাম বলত ডেভিড। আমায় তারিণী নিজে বলেছে।"

"ওর সূত্রেই তোমার সঙ্গে তারিণীর আলাপ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে তারিণী ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। বিশেষ করে ন্যাশনাল থিয়েটারে ওর সঙ্গে ঘটনাটা ঘটার পর।"

"কী ঘটেছিল?"

"শৈল একটু মেয়েলি। সেই সুযোগে ন্যাশনালের কিছু পুরুষ অভিনেতা ওকে ধর্ষণ করে। শৈলই আমায় বলেছে। প্রায় পাঁচ-ছয় বছর আগের কথা।"

"সে কী? পুলিশে জানানো হয়নি?

"পুলিশ নাকি সব জেনেশুনেও চুপ করে যায়। আসলে ন্যাশনালের প্রচুর পয়সা। ওরা বলে সেদিন নাকি ওই অভিনেতারা আসেইনি। তবে তারা শাস্তি পেয়েছিল।"

"কীভাবে?"

"বছরখানেকের মধ্যে সবাই অপঘাতে মারা পড়ে। এটাও শৈলর মুখেই শুনেছিলাম।"

"শৈলকে কি তারিণীই প্রথম ম্যাসনারিতে নিয়ে যায়?"

"সেটা সঠিক আমিও বলতে পারব না। হতে পারে। নাও পারে। হয়তো ও নিজেই গেছিল। কিন্তু ওর কিছু একটা উদ্দেশ্য ছিল। এটা তারিণী বারবার আমায় বলেছে। এই ম্যাসনারিতেই শৈল ওদের পাল্লায় পড়ে।"

"ওদের মানে?"

"দেখুন স্যার, আমি ম্যাসনারির সদস্য না। জানিও না ওখানে কী হয়। তারিণী সদস্য হলেও খুব বেশি জড়িয়ে থাকে না। নিজের পেটের তাগিদে ঘুরে বেড়ায়। শৈল তা না। ম্যাসনারিতে বেশ কিছু বন্ধু জোটে ওর। যারা মোটেই খুব একটা ভালো না। আর তাদের নেতা ছিল লখন।"

"সেটা কীভাবে বুঝলে?"

"একদিন ও আমার কাছে বার্তা নিয়ে এল।"

"কী বার্তা?"

এতক্ষণে গণপতি একটু উশখুশ করতে লাগল।

"কী বার্তা?"

"কলকাতায় ফিরে আসার পরে আমি আর লখনকে কোনও দিন দেখিনি। ভেবেছিলাম দুঃস্বপ্নের মতো ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি। চার বছর আগে একদিন শৈল নিজে উইজার্ড ক্লাবে এসে জানাল ডাক এসেছে। লখনের। আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। পরে ও আমাকে গোপন নামটা বলল। এটা ওর জানার কথাই না। আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম।"

"কী নাম?"

"নীবারসপ্তক। আমারই দেওয়া নাম।"

"মানে কী এর?"

"ম্যাসনদের সদস্য না হলেও লখনের মুখে ম্যাসনদের অনেক কথা শুনেছি। আমাকেও বলেছে সদস্য হতে। হইনি। বামুনের ছেলে হয়ে ওইসব সংঘে যেতে মন চায়নি। তবে ওদের নিয়ে জানি কিছু কিছু। প্রাচীনকালে তাদের নাকি এক দেবতা ছিলেন। নাম জাবুলন। এই জাবুলনের প্রথম তিন অক্ষর JAH, মানে স্বর্গ। ইংরাজি বর্ণমালার অবস্থান অনুযায়ী এদের যোগ করুন, হবে ১০+১+৫। মানে ১৬। আবার ৬+১ হয় ৭। তাই সাত সংখ্যাটা ম্যাসনদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র। প্রাচীন হিব্রুতে বুলো বা বুলন মানে উড়ি ধান, বুনো ধান। আমাদের হুগলীতে অমন বুনো ধানকে বলে নীবার। তাই একদিন ঠাট্টা করেই বলেছিলাম, তোমাদের দেবতার বাংলা নামও হয়। সপ্তনীবার বা নীবারসপ্তক। নামটা শুনে লখন গম্ভীর হয়ে যায়। খানিক ভেবে বলে, ভালো ভেবেছ। কিন্তু আর কাউকে বোলো না। তাই শৈলর মুখে ওই নাম শুনে আমি চমকে গেছিলাম।"

"লখন নিজে তোমার সঙ্গে দেখা করে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"সোনাগাছি। জানেনই তো ওই পাড়ায় আমার অল্প যাতায়াত আছে। ওখানেই লক্ষ্মীমতির বাড়ি।"

"তুমি ওখানে যাও সেটা লখন জানল কেমন করে?"

"ও সব জানে। এই যে আমায় ধরে নিয়ে এলেন, সে খবর এতক্ষণে ওর কাছে পৌঁছে গেছে। আমার দুই বন্ধুকে মেরেছে। আমাকেও আর রাখবে না। তাই যা জানি সব উগরে দিচ্ছি।"

"সোনাগাছিতে নিয়ে গিয়ে লখন কী বলল?"

"তখন শীতকাল। ঘরে লখন ছাড়াও একটা মেয়ে ছিল। লখন বলল এর নাম নাকি ময়না। ওর সামনেই কথা হল। ময়না নাকি ওর দিদি। সত্যি মিথ্যে জানি না। ও আমায় বলল, আগামী হপ্তায় ১২ ডিসেম্বর সন্ধে থেকে চিনেপাড়ায় উপস্থিত থাকতে। চিনা মন্দিরটার থেকে একটু দূরে একটা ছ্যাকড়াগাড়ি এসে দাঁড়াবে। সেখান থেকে একটা মড়া নামিয়ে দেওয়া হবে। আমার কাজ হবে সেটাকে শুইয়ে দিয়ে অপেক্ষা করা। কেউ না কেউ খুঁজে পাবেই। তখন পুলিশকে যেন আমিই খবর দিই। আর একজন বাঙালিকে পেলে পুলিশ চিনাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। আর তখনই..."

"তখনই কী?"

"তখনই পুলিশকে চিনা চিহ্ন ইত্যাদি বলে বিভ্রান্ত করে দিতে হবে।"

"কিন্তু তুমিই কেন?"

"আজ্ঞে আমিও সেটাই জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছিল পুলিশ নাকি এখনও বড়ো ঘরের ব্রাক্ষণদের সত্যবাদী মনে করে।"

"তারপর আর দেখেছ লখনকে?"

"লখনকে আর একদিনই দেখেছিলাম। এক ঝলক। সেই কার্টারের ম্যাজিক শো-র দিন। কাউকে বলিনি। কিন্তু ও আমায় ভোলেনি। কিছুদিন আগেই তারিণীর হাত দিয়ে শৈল এক বিজ্ঞাপন পাঠায়। সেখানে স্পষ্ট গোপন সংকেতের উল্লেখ আছে। আমায় আবার ডেকেছে।"

"কোথায়?"

"নিচে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের একটা ঠিকানা আছে। ওখানেই।"

"কবে? কখন?"

টেবিলে পড়ে থাকা বিজ্ঞাপনটা হাতে নিয়ে গণপতি বলল, "এই বিজ্ঞাপন সবার জন্য না। যারা বুঝবে তাদের জন্য। অন্যদের কাছে নেহাত বিজ্ঞাপন। এই দেখুন কী লেখা, সন্ধ্যায় দুই স্তনে তিনবার করিয়া পাঁচদিন মাত্র, মানে সন্ধে ছটায়, পাঁচদিন পরে।"

"তাহলে কবে দাঁড়ায়?"

"আজ সন্ধে ছটা। আমি যাইনি। ঠিক করেছিলাম শেষ শো করে পালাব। তাও ওদের খপ্পরে আর না। অনেক হয়েছে। আবার আমাকে দিয়ে কোনও পাপকাজ করাত। আপনিই আমায় পালাতে দিলেন না।" কাষ্ঠহাসি হেসে বলল গণপতি।

"শৈল আর তারিণীকে মারার কারণ জানো?"

"ওদের দলের একটা খুব কঠিন নিয়ম আছে। দলের কেউ বেইমানি করলে তাকে মরতেই হবে। সে যে-ই হোক। শৈল গোপন কিছু জেনে ফেলেছিল। হয়তো ওরা ভয় পাচ্ছিল ও বলে দেবে। কিংবা কাউকে বলে দিয়েছিল। তাই ওকে মরতে হল। তবে তারিণীকে কেন মারল বুঝতে পারছি না। অবশ্য যা শুনলাম, খুন করেনি। ডান্ডার বাড়ি মেরেছে। ওরা খুন করতে চাইলে খুনই করে। আধমরা করে রাখে না। হয়তো তারিণীর আপিসে কিছু খুঁজতে এসেছিল। তারিণী এসে পড়ায় কাজের বাধা ঘটে..."

পাশ থেকে গলা খাঁকরানোর আওয়াজ পেতেই প্রিয়নাথ খেয়াল করল, আলোচনার অনেকটাই সাইগারসনকে ইংরাজিতে বলা হয়নি। লজ্জিতভাবে

গোটাটা বলতেই সাইগারসন আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর চিবুক বুকের কাছে। দুই ভুরু প্রায় জোড়া। অনেক পরে ধীরে ধীরে সাইগারসন বললেন, "তার মানে চার বছর আগে পলের হত্যা নেহাত দুর্ঘটনা না, যেমনটা আমরা ভেবেছিলাম। এক সপ্তাহ আগেই পরিকল্পনা করা ছিল, কবে, কখন, কীভাবে খুন করা হবে। কার্টার স্টেটসম্যানে চিঠি লিখে যা জানাবে বলেছিল সেটা কি তবে আরও ভয়ানক কিছু? বড়োলাটই বা সেদিন আমাদের ও কথা বললেন কেন? উনিও বিভ্রান্ত করতে চাইলেন? দুটো কারণ হতে পারে। এক, বড়োলাট নিজেও এই খুনের সঙ্গে যুক্ত। আর যদি সেটা না হয় প্রিয়নাথ, দ্বিতীয় যে কারণটা খোলা থাকতে পারে সেটা ভাবতেও পারছি না। যে করেই হোক, গণপতি আর তারিণীকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। জাবুলন শত্রুর শেষ রাখে না। আমার কাছে এসেছিল বলেই হয়তো শৈলকে মরতে হল। খেলা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে হাজার গুণ ভয়ংকর। যা ভাবছি তা যদি সত্যি হয়, অফিসার তবে চার বছর আগে খেলা শেষ হয়নি। সবে শুরু হয়েছিল। এতদিনে আমি শেষটা আন্দাজ করতে পারছি। ওফফ! কী ভয়ানক!!"

ষষ্ঠ পর্ব— তাহারা মরেনি তবু

১।

"হ্যালো, কী খবর?"

"একটা কথা ছিল।"

"বলে ফ্যালো।"

"কিছুদিন আগেই আপনি আমাকে আমার অফিসঘরে প্রায় গান পয়েন্টে জেরা করেছিলেন, মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ। আসলে আমি কারও ওপরে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।"

"আমি একটু আগে অরুণবাবুর থেকে নিয়ে আসা কাগজপত্রগুলো পড়ছিলাম। কিছু কিছু ধরতে পারছি, আবার অনেকটাই ঠিক গ্রিপে আসছে না।"

"আমি কী করতে পারি বলো?"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে

চাই। জেরা না। আমার মনে হয় কিছু জট একমাত্র আপনিই খুলতে পারবেন।"

"কীভাবে?"

"আসলে নিউটনের তৃতীয় সূত্র জানেন তো? সিস্টেমের মধ্যে থেকে সিস্টেমকে ঠেলা দিয়ে নড়ানো যায় না। বাইরের কাউকে লাগে। ধরে নিন আমিই সেই।"

"ওয়েল। তা শুরুতে বললেই হত, তুমি আমার জবানবন্দি নিতে চাও। এত ভণিতার কী দরকার ছিল?"

"এ মা! ছি! ছি! জবানবন্দি কেন হবে? কিছু ইনফরমেশান আপনার কাছে আছে। কিছু আমার কাছে। আমরা একসঙ্গে কাজ করছি ঠিকই, কিন্তু এখনও নিজেদের মধ্যে ইনফরমেশান শেয়ার করিনি। মনে হয় এবার সেটার সময় এসেছে।"

"আমি রাজি। তবে তুমি যা জানো সেটাও শেয়ার করতে হবে। ফেয়ার ডিল।"

"সে তো বটেই। কারণ যদি আমার ধারণা ঠিক হয়, তবে শুধু আপনি না, আমার পিছনেও লোক লেগেছে। না লাগলেও খুব শিগগির লাগবে।"

"কেন?"

"দেখা হলে বলব। কাল আমি চন্দননগরে আপনার অফিসে যাব?"

"না, না। অফিসে না। ওখানে অনেক লোক। তোমার অফিস?"

"একই সমস্যা। কেন যেন মনে হচ্ছে অফিসে লোক নজর রাখতে পারে। এমন কোনও জায়গা যেখানে বিশেষ লোকজন নেই।"

"তুমি সাজেস্ট করো।"

"আমার দেশের বাড়ি চুঁচুড়ায় ডাচদের একটা কবরখানা আছে। সারাদিন খালি পড়ে থাকে। আমি কাল বিকেল চারটে নাগাদ চলে যাব। আপনিও চলে আসুন। তবে পুলিশের গাড়িতে আসবেন না।"

"ওকে ডান। ওটা চিনি। মৃত্যুঞ্জয়ের মিষ্টির দোকানের পাশে তো? চলে যাব।"

"ভালো কথা, বিশ্বজিতের অটোপ্সি রিপোর্ট এল?"

"হ্যাঁ, এসেছে। অদ্ভুত রিপোর্ট।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"কাল সাক্ষাতে বলব। এখন রাখি।"

২।
আমার মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসেছে সেটা উর্ণা খুব ভালো টের পেয়েছিল। আগে সময়ে অসময়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চ্যাট করতাম। লুকিয়ে ঘুরতে যেতাম। যবে থেকে দেবাশিসদার এই ঘটনা ঘটেছে, রাতে ঘুমানোর সময় ছাড়া বাড়ি ঢোকাই হয় না। উর্ণার মেসেজ সিন হয়ে পড়ে থাকে। উত্তর দেবার সময় পাই না। সেদিনই বেশ রাতে বাড়ি ফিরে একগাদা কাগজ ছড়িয়ে বিছানায় বসে আছি, উর্ণার ফোন এল।

"কোথায়?"

"নিজের ঘরে। তুমি এত রাতে ফোন করলে? গলা এত ভারী কেন?"

"দরকার আছে। একবার আসব?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত বারোটা বেজে দশ। এত রাতে উর্ণা আমার ঘরে আসতে চাইছে কেন? যদি বাই চান্স ধরা পড়ে যাই, তবে কী হতে পারে, সেটা ও আমার চেয়ে ভালো জানে।

"কিছু বলছ না কেন? আসব? খুব দরকার। প্লিজ।"

"মা বাবা কোথায়?"

"মা ঘুমাচ্ছে। বাবা বাড়িতে নেই। আসব কি না বলো।"

"তবে এসো। দরজা ভেজানোই আছে।"

ফোন কেটে গেল। আর তার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঘরে ঢুকল উর্ণা। কেঁদে কেঁদে দুই চোখ লাল। হাতে মুঠো করে ধরে রাখা কী যেন।

"কী হয়েছে?"

প্রথমে কিছুই বলল না উর্ণা। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কথা বলতে পারছে না। দুই হাতে মুখ ঢেকে শুধু কাঁদছে। আমি খানিক ইতস্তত করে পিঠে হাত রাখলাম। কান্না আরও বেড়ে গেল তাতে। চুপচাপ বসে রইলাম। উর্ণার হাতে সেই কাগজটা এখনও ধরা। খানিক বাদে মাথা উঠিয়ে উর্ণা বলল, "প্লিজ, প্লিজ তুর্বসু। আমার বাবাকে তুমি বাঁচাও।"

"কী হয়েছে কাকুর?"

"আমি জানি না। কিন্তু বাবা আর আগের মতো নেই। সর্বদা কেমন যেন একটা ভাব। অস্থির। বিশেষ করে গত দশ-পনেরো দিন ধরে। তুমি সেই দেবাশিসবাবুর কেসটা নেবার পর।"

"কাকু কিছু বলেছেন তোমায়?"

"না। বাবা কি কিছু বলে? তবে হাবেভাবে বুঝতে পারছি। আজ বাড়িতে

উকিল এসেছিল। বাবা উইল করছে।"

"সে তো উইল যে কেউ করতে পারে। এ নিয়ে এত ভাবছ কেন?"

"ভাবতাম না। কিন্তু গতকাল বাবা আমায় ডেকে অফিসের কাগজপত্র বুঝিয়ে দিল। হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে কী করব, ফ্যামিলি পেনসন কীভাবে পাওয়া যাবে, পিএফের টাকা তুলতে কার কাছে যেতে হবে এসব বোঝাচ্ছিল। আমি অবাক। বাবাকে এত ভালোভাবে কথা বলতে শুনিনি কোনও দিন। আমি বারবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমার এত তাড়া কীসের? বলল, কিছু তো বলা যায় না মা, কখন কী হয়? 'একে একে শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি'।"

"তুমি জানতে চাওনি এমন কেন বলছেন?"

"জিজ্ঞাসা করেছি। অদ্ভুত উত্তর দিল। বলল, মানুষ হয়ে ভগবান হতে চেয়েছিলাম। এখন সাক্ষাৎ শয়তানের কবলে পড়েছি।"

"এর মানে কী?"

"জানি না। বাবা বলেওনি।"

"তা এখন তুমি আমার কাছে এলে কেন?"

"বাবা আজ বাড়ি নেই। এনজিও-র কাজে কোথায় যেন গেছে। পারমিশান ছাড়া বাবার ঘরে ঢোকা আমার মানা। কিন্তু কাল কলেজে অনুষ্ঠান। 'সোনার তরী' কবিতাটা পড়ব ঠিক করেছি। নেটে দুরকম লেখা। কোনটা ঠিক জানতে চুপিচুপি বাবার ঘর থেকে সঞ্চয়িতাটা নিতে গেছিলাম। সেই বইয়ের ভিতর থেকেই এটা পেলাম।"

উর্ণার হাতে একটা প্যাডের কাগজ মুঠো করে ধরা। হাতে নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা—

"সুধী সদস্যবৃন্দ,

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে, আমাদের সংস্থার সদস্য ও পরম সুহৃদ বিরূপাক্ষ রায়, সামান্য কিছুদিন রোগভোগের পরে পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করেছেন। তিনি যে গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তা প্রায় মধ্যপথেই ত্যাগ করায় একসময় তিনি সংস্থার বিরাগভাজনও হন। তবু তিনি আমাদের ভ্রাতা এবং তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। তবে আমাদের কাজ থেমে থাকা না। এগিয়ে চলা। স্বর্গীয় বিরূপাক্ষ রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আগামী শনিবার, সন্ধে সাড়ে সাতটায় নিচের ঠিকানায় এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। সদস্যদের সেই সভায় উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। সভায় আগামী দিনের কর্মপন্থাও স্থির হবে।"

নিচে চন্দননগরের একটা চেনা ঠিকানা আর চেনা একজনের নাম। সভাপতি— দেবাশিস গুহ।

উফফ!! এই লোকটা মারা গিয়ে যেন আরও বেশি করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন... ঠিক যেন... ভূতের মতো। আমি সেই কাগজটা থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না। কেউ যেন আমার সব চিন্তাভাবনার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। এতদিন যেভাবে এগিয়েছি সবই কি ভুল তবে? চোখের সামনে থেকে একশো বছর আগের কালো পর্দাটা সরছে। কিন্তু তাতে যা দেখা যাচ্ছে তা আরও গভীরতর অন্ধকার।

"জেঠু, মানে তোমার বাবা ক্যান্সারে মারা গেছিলেন না?" উর্ণা প্রশ্ন করল।

"তাই তো জানতাম এতদিন।"

"তার মানে?"

"বাবা বেশিদিন ভোগেননি। বাবার পেটে একটা ব্যথা হত। কিছুদিন ধরেই। আমি ভালো ডাক্তার দেখাব বলেছি। বাবা রাজি না। বাবার চেনা ডাক্তার ছিল। রাসবিহারীতে বসেন। তিনিই বাবাকে দেখতেন। তাঁকে ছাড়া বাবার কাউকে পোষাত না।"

"ডা. অশোক মল্লিক?"

"হ্যাঁ, তুমি চেনো?"

"আমরাও তো ওঁকেই দেখাই। ওঁর নিজের একটা রিসার্চ ল্যাবরেটরি আর ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে।"

"হ্যাঁ, উনিই। উনিই বাবাকে দেখতেন। তবে শেষে ধরা পড়ল ক্যান্সার। লাস্ট স্টেজ। তখন আর কিছু করার ছিল না।"

"কী গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন তোমার বাবা, জানো?"

"না। বাবা-মা চিরটাকাল আমার থেকে কিছু একটা লুকিয়ে গেছেন। কেন চুঁচুড়ার বাড়ি ছেড়ে এলাম? কেন বাবা চাকরি থেকে ভলেন্টারি রিয়ারমেন্ট নিলেন, কিচ্ছু জানাননি। এমনকি আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হওয়াতে দুজনেরই খুব আপত্তি ছিল। তাও আমি জেদ করায় বাবা রাজি হয়ে যান। স্টার্ট আপের জন্য এক লাখ টাকা দিতেও রাজি হন। তখন অদ্ভুত একটা কথা বলেছিলেন বাবা। বলেছিলেন, শোন, যার অফিসে বসছিস, আমার সেই ঠাকুর্দা কিন্তু চরম লোভেও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। আমিও করিনি। তুই যেন লোভের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিস না।"

"কী প্রসঙ্গে বলেছিলেন এ কথা?"

"তা বলেননি। সে কথা ছাড়ো। তুমি এত রাতে এত আপসেট হয়ে গেলে কি শুধু এই শোকসংবাদ দেখে?"

উর্ণার চোখের জল প্রায় শুকিয়ে গেছিল। আবার চোখ জলে ভরে এল।

"তুমি কি কিচ্ছু বোঝো না তুর্বসু রায়? এই কাগজে যে দুজনের নাম আছে তাঁরা গত এক বছরে মারা গেছেন। বাবাও এখন উইল বানাচ্ছেন। এর মানে বোঝো?"

আমি এবার অনুমতি না নিয়েই জড়িয়ে ধরলাম উর্ণাকে। এই প্রথমবার। কপালে আলতো ঠোঁট ছুঁইয়ে বললাম, "এর মানে আর কিছুই না। বন্ধুরা মারা গেলে মানুষের মন এমনিতেই দুর্বল হয়ে যায়। তার ওপরে তাঁরা একই সংস্থায় কাজ করতেন। দেবাশিসদাকে যে কাকু চিনতেন সেটা আমারও জানা ছিল না। সে যাই হোক। তুমি চিন্তা কোরো না। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যাও। কাকুর যাতে কেউ কোনও ক্ষতি না করতে পারে, সেটা আমি দেখব।"

মৃদু হাসি ফুটল উর্ণার মুখে। এতক্ষণে।

"বড়ো আমার বীর পালোয়ান রে। তবে শোনো, বাবা যেন কিচ্ছু জানতে না পারে।"

"আরে হ্যাঁ। সে তো বটেই। তবে আমি ড্যাম শিওর, ভয় পাবার মতো কিচ্ছু হয়নি। যদি হয়েও থাকে, তবে আমি আছি। তুমি চাপ নিয়ো না। রাত একটা বাজল। কাল সকালে কলেজ আছে তো?"

মাথা নাড়ল উর্ণা। আছে।

"তাহলে? যাও, শুতে যাও। আমারও ঘুম পেয়েছে। আর এই কাগজটা আমার কাছে থাক। আর হ্যাঁ, সেদিন চক্রবর্তী চ্যাটার্জীতে নাইট নামের এক ভদ্রলোকের একটা বই কিনলে না? ফ্রিম্যাসনদের নিয়ে? ঘুমাতে যাবার আগে একবার ওটা দিয়ে যেয়ো তো। একটু দরকার আছে।"

উর্ণা চলে গেলে ঘরের দরজা বন্ধ করে একদৃষ্টে কাগজটার দিকে চেয়ে রইলাম। শত চেষ্টাতেও আজ রাতে আমার ঘুম আসবে না। একটা রেজিস্টার্ড সংস্থার প্যাডে গোটা চিঠিটা ছাপানো। উপরে বড়ো বড়ো করে লেখা—

NIBAR (RGTD).

A Non-Govermental Organisation fighting for Human Rights. Home & Abroad.

পাশে অদ্ভুত এক চিহ্ন। এই চিহ্ন আমি চিনি। চিনা অক্ষর ই-চিং। কিছুদিন আগেই অফিসার অমিতাভ মুখার্জি আমায় দেখিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির

ডাকবাক্সে কেউ ফেলে যাচ্ছিল। তিনটে লম্বা দাগের উপরের দুটো ভাঙা, নিচেরটা অক্ষত। মানেটাও বলেছিলেন অফিসার। ভয়াবহ পরিণতি, ধ্বংস, মৃত্যু। এখানে অবশ্য সেই চিহ্নের চারপাশে লেখা আছে চারটি ল্যাটিন শব্দ।

Dissimulo. Fraternitati. Unio. Oblitus.

৩।

খুব ছোটোবেলায় একবার বাবার হাত ধরে এই ওলন্দাজদের কবরখানাটায় ঢুকেছিলাম। তখন এখানকার ওবেলিস্কগুলো পাহাড়ের মতো বড়ো বড়ো লেগেছিল। এত বছরে কবরখানার হাল আরও বিগড়েছে। গতবার যেন আর-একটু পরিষ্কার দেখেছিলাম। এবার জঙ্গলে ভরা। অফিসার মুখার্জি এখনও পৌঁছাননি। কবরখানা শুনশান। শুধু বড়ো বড়ো গাছ হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। সামনে বিরাট একটা জামরুল গাছ। তার সামনে থেকেই একের পর এক কবর। হাঁটতে হাঁটতে কবরের এপিটাফের নামগুলো পড়ছি। কিছু আছে। কিছু কবরচোরেরা উপড়ে নিয়ে গেছে। বাবার সেই পাতলা বইটা "চুঁচুড়া কথা" সঙ্গে নিয়ে এসেছি, আর মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছি। এই তো কর্নেলিস ডে জং-এর কবর। এই কবরখানার সবচেয়ে পুরোনো কবর। ১৭৪৩-এর। মজার ব্যাপার, একটু দূরেই সবচেয়ে নবীনতম কবরে শুয়ে আছেন এমা ড্রাপার। ১৮৪৭ সালে তাঁকে গোর দেওয়া হয়েছিল। সিপাই বিদ্রোহের তখনও দশ বছর বাকি। কিন্তু আমার মন অন্য জায়গায়। ভার্নেৎ-এর সমাধিটা কোথায়? সেই ভার্নেৎ, যাঁর তুতো বোন স্বয়ং শার্লক হোমসের ঠাকুমা ছিলেন? বইতে তাঁর কথা স্পষ্ট লেখা আছে। খুঁজতে খুঁজতে এক কোণে পেয়ে গেলাম সেই সমাধি। লম্বাটে। চুন সুরকি দিয়ে বাঁধানো। চমকটা খেলাম সমাধির মাথার কাছে গিয়ে। অন্য সমাধির মতো এখানে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্যাঁচার মতো মুখওয়ালা VOC খোদাই করা নেই। আছে গোল একটা সিল। তার দুই বিপরীত দিকে যোগচিহ্নের মতো বড়ো বড়ো দুটো ক্রস। প্রতিটাকে ঘিরে আরও চারটে। এমন অদ্ভুত চিহ্ন আমি আগে কখনও দেখিনি। ঠিক তার পাশেই আবার কোনাকুনি দুটো অন্য চিহ্ন। তিনটে তারা আর একটা রাজমিস্ত্রিদের ম্যাসন'স স্কোয়ার। এই চিহ্ন আমি চিনি। একেবারে শুরুতে এ দেশে ফ্রিম্যাসনরা এই চিহ্নই ব্যবহার করত। কিন্তু অন্যটা কী?

"খুব দেরি করে ফেললাম?"

গলার আওয়াজে বুঝলাম ইনস্পেক্টর মুখার্জি এসে গেছেন। আমি এতক্ষণ

মন দিয়ে কবরটা দেখছিলাম বলে খেয়াল করতে পারিনি।

"কী দেখছ এত মন দিয়ে?"

"এই কবরটা আগে দেখেছেন?"

"আমি এখানে অনেক আগে একবার এসেছিলাম। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে। তারপর এই এলাম।"

"আমারও সেই দশা। আচ্ছা অন্য সব কবরে VOC খোদাই করা, কিন্তু এই ভার্নেৎ সাহেবের কবরে অন্য চিহ্ন কেন? এই দেখুন, এই দুটো তো ফ্রিম্যাসনদের চিহ্ন। অন্য দুটো কী?"

মুখার্জি একটু ঝুঁকে চিহ্ন দুটো দেখেই সোজা হয়ে গেলেন। বললেন, "স্ট্রেঞ্জ!"

"কেন? অবাক হবার কী হল?"

"এঁদের বলে জেরুজালেম ক্রস। ফাইভ ফোল্ড ক্রস-ও বলে অনেকে। দেবাশিসদার বাড়িতে দেখেছিলাম।"

"এর মানে কী?"

"পাঁচটা ক্রস হল যিশুর দেহের পাঁচ ক্ষতচিহ্নের প্রতীক। অনেকে আবার বড়োটিকে যিশু আর চারটিকে তাঁর চার শিষ্য হিসেবে মনে করেন। ১২৮০ সালে জেরুজালেমে প্রথমবার কোট অফ আর্মসে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর অন্য একটা মানেও নাকি আছে। অষ্টাদশ শতকে ফ্রিম্যাসনদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে যায়। একদল যিশুর অহিংসাবাণী মেনে চলতেন। অন্য দল তা মানেননি। যাঁরা মানতেন তাঁরা প্রকাশ্যে জেরুজালেম ক্রসকে নিজেদের কোট

অফ আর্মসে ব্যবহার শুরু করেন। চরমপন্থী ফ্রিম্যাসনরা বিদ্রোহ করেন। তাঁদের বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু দলের মধ্যেই তাঁদের সমর্থক ছিল। গোপনে তাঁরা ঘোঁট পাকাতে থাকেন ও নানারকম স্যাবোটাজ করেন। তাঁদের আলাদা চিহ্ন ছিল। যদিও সেটা কী, কেউ জানে না।"

"আপনি স্টিফেন নাইটের নাম শুনেছেন?"

অফিসার মাথা নাড়লেন। শোনেননি।

"আমিও এতদিন শুনিনি। জাস্ট গতকাল এঁর লেখা একটা বই পেয়েছি। কাল সারারাত এঁর বই পড়ে ঘুমাতে পারিনি।"

"কেন? কী আছে তাতে?"

"ফ্রিম্যাসনদের নিয়ে যতটুকু যা জানি তার নব্বই ভাগই নাকি এই ভদ্রলোকের জন্য। ভূমিকায় লেখা আছে। ১৯৮৩ সালে গ্রানাটা থেকে তাঁর একটা বই প্রকাশ পায়। দ্য ব্রাদারহুড। ফ্রিম্যাসনদের নিয়ে লেখা। এই সেই বই। সে বই কলকাতায় কোন পথে এল কে জানে? বইটা প্রকাশ মাত্র সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যায়। সেখানে নাইট পরিষ্কার দাবি করেছেন, এই ফ্রিম্যাসনরা ইউরোপের নানা দেশের বড়ো বড়ো পদ অধিকার করে আছে। একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই 'Freemasons applaud violence, terror and crime, provided it is carried out in a crafty manner'। এই বইতে তিনি এটাও দেখিয়েছেন বিশেষ করে ইংল্যান্ডের গোটা রাজনৈতিক ক্ষমতা এখন ফ্রিম্যাসনদের হাতে। সেটা তারা কী করে করল তা জানতে পারেননি নাইট। চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এটাও নাকি বলেছিলেন, ফ্রিম্যাসনরা একবার ভয়ানক এক চক্রান্ত করে, যাতে ইংল্যান্ডের অস্তিত্ব অবধি বিপন্ন হতে পারত। তিনি নাকি সন্ধান করে অনেকটা বারও করেছিলেন। প্রমাণ জোগাড় করছিলেন। কিন্তু তার আগেই মাত্র তেত্রিশ বছর বয়েসে নাইট আচমকা মারা গেলেন।"

"খুন?"

"এখানেই তো মজা। খুন হলেও সেটা প্রমাণ করা যাবে না। নাইটের মাথায় ১৯৮০ সাল নাগাদ একটা টিউমার ধরা পড়ে। সেটা সারাতে তিনি অনেকের কাছে যান। এমনকি আমাদের ভারতীয় গুরু ভগবান রজনীশের কাছেও। ১৯৮৪-তে টিউমার অপারেশন হয়। সাকসেসফুল। পরের বছরই এক টিভি প্রোগ্রামে নাইট ঘোষণা করলেন ফ্রিম্যাসনদের মধ্যের সেই চরমপন্থী গ্রুপের সন্ধান তিনি পেয়েছেন এবং তারা নাকি তখনও সক্রিয়। এই গ্রুপের

নাম জাবুলন আর দুই বছরের মধ্যেই তার নতুন বই আসবে এদের নিয়ে। দুই মাসও গেল না। নাইট মারা গেলেন।"

"মৃত্যুর কারণ?"

"ডাক্তার বলেছিল ওই টিউমার নাকি আবার ফিরে এসেছিল। কিন্তু মিথ্যে কথা। মারা যাবার আগের দিনও বন্ধুদের এক পার্টিতে গেছিলেন নাইট। একেবারে স্বাভাবিক। তাই আমার ধারণা... খুন। যাই হোক, এসব আলোচনা পরে হবে। আগে বলুন, দারোগা প্রিয়নাথ মুখার্জি আপনার কে হন?"

সপ্তম পর্ব— মানুষের শরীরের ধুলো

১।

সাইগারসন বলে নিয়েছিলেন শুরুতে আজ তিনিই কথা বলবেন। প্রয়োজনে তাঁর কথা অনুবাদ করে দেবে প্রিয়নাথ। অবশ্য প্রিয়নাথের কিছু বলার থাকলে সেটাও সে বলতে পারে। সাইগারসনের মুখ থমথমে। সচরাচর যে ফুর্তিবাজ মানুষটাকে দেখা যায় সে যেন কোথায় হারিয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে তারিণীর কেবিনে এঁরা দুজন ছাড়াও রয়েছে গণপতি। গতকাল রাতে পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছিল গণপতিকে। ডাক্তার সরকারের ওষুধে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। তারিণী মাথা তুলে বসেছে। জ্বর কমেছে। আজ ডাক্তার তাকে দুধ বার্লি পথ্য দিয়েছেন।

ব্রায়ার রুট পাইপে তামাক ভরতে ভরতে সাইগারসন বললেন, "ব্রিটিশদের এই এক সমস্যা। তাঁদের দেশের ঘটনার আসল প্রভাব ঠিক কী বা কতটা সেটা ইংল্যান্ডে থেকে বোঝা যায় না। বোঝা সম্ভব না। আমি শুরুতে ঠিক সেই ভুলটাই করতে যাচ্ছিলাম। ভাবতাম আমি পৃথিবীর সেরা কনসাল্টিং ডিটেকটিভ, ফলে আস্তিনের ভিতরে তাস লুকিয়ে রাখার অধিকার একমাত্র আমারই আছে। প্রথমবার ভুল ভেঙেছিল চার বছর আগে। আপনার আর তারিণীচরণের সাহায্য ছাড়া ওই কেস সমাধান করা যেত না। অবশ্য সেটাকে সমাধান বলা যায় কি না তা নিয়ে আমার নিজের মধ্যেই এখন সন্দেহ জাগছে। বুঝতে পারছি ওটা শেষ তো না-ই, বরং শুরুর সূচনা ছিল। অশুভের ইঙ্গিত।

আজ এই ঘরে আমরা যে চারজন আছি, প্রত্যেকের কাছে কিছু কিছু তথ্য আছে, যা আমরা পরস্পরের থেকে গোপন রেখেছি। কারণ হয়তো অবিশ্বাস,

ভয় কিংবা সন্দেহ। মুশকিল হল যারা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রে মেতেছে, তারা ঐক্যবদ্ধ। তাই তাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে আমাদেরকেও এক হতে হবে। ফলে যেটা দরকার, যে যা কিছু জানি, সব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেব। সম্পূর্ণ চিত্রটা পরিষ্কার না হলে বিপদ ঠেকানো যাবে না। আর যদি আমার ধারণা সঠিক হয়, তবে বিপদ ভয়ংকর। এত ভয়ংকর যা আমরা কেউ হয়তো কল্পনাও করতে পারছি না।"

পাইপের আগুন নিভে গেছিল। দেশলাই কাঠি ঠুকে আবার পাইপ ধরিয়ে সাইগারসন বললেন, "চার বছর আগে আমি এই দেশে যখন আসি, তখন তার দুটো কারণ ছিল। ইংল্যান্ডে অপরাধীদের চালনা করতেন কোনও প্রতিষ্ঠান না, এক সম্মাননীয় প্রফেসর। তাঁর নাম জেমস মরিয়ার্টি। ১৮৮০-র শুরু থেকেই ইংল্যান্ডের গুপ্তচর বিভাগের কাছে খবর ছিল, এই প্রফেসরের সঙ্গে ফ্রিম্যাসনদের একটা দল নিয়মিত সম্পর্ক রেখে চলেছে। এরা কারা জানবার চেষ্টা করা হয়েছে বহুবার। কিন্তু চুনোপুঁটিদের নামই জানা গেছে। কোনও অদ্ভুত উপায়ে রাঘব বোয়ালরা পর্দার আড়ালে থেকে গেছে বারবার। তবু যাঁর দিকে প্রথম থেকেই ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের নজর ছিল, তিনি বেডলামের এক ডাক্তার। এলি হেনকি জুনিয়র। আমি আগেও এঁর কথা বলেছি। এটাও বলেছি যে ফ্রিম্যাসনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু আসল কারণ আরও গভীরে। বেডলামে থাকাকালীনই এলি কিছু একটা আবিষ্কার করেন, যার প্রকৃত স্বরূপ আমরা এখনও জানতে পারিনি। তবে সে আবিষ্কার মানবজাতিকে ধ্বংস অবধি করে দিতে পারে, এমনই নাকি তার ক্ষমতা। বেডলামে আমাদের গুপ্তচর জানিয়েছিল, হেনকি আর তাঁর শিষ্যরা, যার মধ্যে ডাক্তার রিচার্ড হ্যালিডেও ছিল, এই আবিষ্কারে দারুণ উৎফুল্ল হয়ে গেছিলেন। সরকারের টনক নড়ল। সেই আবিষ্কার যাতে হাসপাতালের গণ্ডি না ছাড়াতে পারে, সেইজন্য দুবেলা হেনকি, আর তাঁর বন্ধুদের সার্চ করা হতে লাগল। নজর রাখা হল তাঁদের উপরে। কিচ্ছু পাওয়া গেল না। আসলে যে-কোনো বড়ো যন্ত্রে একেবারে ছোটো কগ চাকাটাই কাজের কাজ করে। এখানেও তাই করেছিল।

হেনকিদের দলের পিছনে যে মরিয়ার্টির শয়তানি বুদ্ধি কাজ করছিল, সেটাকে সরকার উপেক্ষাই করেছিল ততদিন। সেই আবিষ্কার নিশ্চিন্তে বেডলামের প্রাচীর পার করল। নিয়ে বেরোল এমন একজন, যাকে সন্দেহ করার কথা কেউ ভাবতেই পারবে না। সাফাইওয়ালাকে আর কে গুরুত্ব দেয়? মরিয়ার্টি জানত সেই আবিষ্কারের ঘটনা সরকার জানে। লন্ডনে বসে সেটা

নিয়ে কিচ্ছু করা যাবে না। সেই সাফাইকর্মীকে দিয়ে জিনিসটা পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতায়। ইংরেজরা যাকে দ্বিতীয় লন্ডন বলতেন। ভেবে দেখুন, এখানে লন্ডনের প্রায় সব সুবিধাই আছে, কিন্তু ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের চোখরাঙানি নেই। ফলে এই অস্ত্র নিয়ে কাজ করার স্বাধীনতা অনেক বেশি। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল, যার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। সেই সাফাইকর্মী এ দেশে এসে বেশিদিন শান্ত থাকতে পারল না। আমাদের এই ইন্সপেক্টর প্রিয়নাথই তাকে কবজা করলেন।"

"হিলি?"

"একদম তাই। কিন্তু হিলি ধরা পড়ার আগে কাজের কাজটি করে দিয়েছিল। পুলিশ কমিশনার আমাকে হিলির কাগজপত্র দেখিয়েছেন। হিলি এ দেশে এসে প্রথমেই যায় হুগলীতে। সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন উইলিয়াম পামার। যাঁকে অনেক আগেই সরকারবিরোধী কাজের জন্য ইংল্যান্ড থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। খুব ভুল না হলে হিলি পামারকে হেনকির আবিষ্কারটা দেয়। এই অবধিই তার কাজ। জেলে হিলির সঙ্গে ওয়ার্নারের আলাপ হয়। ওয়ার্নারের সঙ্গে সমাজের উঁচুতলার পরিচয় ছিল। সে হিলিকে কী বুদ্ধি দিয়েছিল জানি না, দুই বছর বাদে দুজনেই পালাল। মাঝের এই দুই বছর হিলির চুরি করে আনা জিনিস কোথায় ছিল জানা নেই।"

"এটা কত সালের ঘটনা?"

"১৮৮৭ সালের। কারণ তখন বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে আমি একা থাকি। আমার সঙ্গীর সদ্য বিয়ে হয়েছে। আমার দাদার কাছে খবর আসে, পামারের সঙ্গে একজন দেখা করতে গেছিল। কিন্তু সেটাকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। আসলে হিলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ১৮৮৯-এ হিলি জেল থেকে পালালে লন্ডনের অপরাধীরাও নড়েচড়ে বসে। বেডলামে প্রায়ই দরজা বন্ধ করে মিটিং শুরু হয়। তখন গোটা লন্ডন উত্তেজনায় ফুটছে। গোয়েন্দা বিভাগের প্রায় সবাই নিশ্চিত, জ্যাক দ্য রিপার নামে পতিতাদের যে বা যারা খুন করছে তারা শল্যচিকিৎসক না হয়ে যায় না। ফলে তাঁদের উপরে নজরদারি ছিলই। সেই পরিবেশে এই ধরনের মোলাকাত সরকার ভালো চোখে নেয়নি। এদিকে এতজন নামী চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়া কিছু সম্ভব না। ১৮৯১-এর মার্চে সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। আসল বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে হবে। মরিয়ার্টিকে মরতে হবে। আর সেই খুনের দায়িত্ব পেল আইনের সবচেয়ে বড়ো রক্ষক। আমি।"

সবাই চুপ। আবার খোলা জানলা দিয়ে দুটো মৌমাছি ভিতরে ঢুকে গুনগুন করছে। সাইগারসন একটু অন্যমনস্ক হয়ে সেইদিকে তাকালেন। ম্লান হেসে বললেন, "এইসব শেষ হয়ে যাক। মৌমাছির একটা খামার খুলব। আজকাল বড়ো ক্লান্ত লাগে। যাক যা বলছিলাম। প্রায় এক বছর আমাকে লুকিয়ে রাখা হল। প্রচার করে দেওয়া হল রাইখেনবার্গ জলপ্রপাতে পড়ে মরিয়ার্টির সঙ্গে আমিও মারা গেছি। কিন্তু ১৮৯২ নাগাদ দুটো সমস্যা দেখা দিল। মরিয়ার্টির মৃত্যুর পরেও তাঁর সঙ্গীরা বিশ্বাস করত আমি বেঁচে আছি। ফলে আমাকে লন্ডনে রাখা কঠিন হয়ে গেল। দ্বিতীয় কারণটা তোমরা জানো। রিচার্ড হ্যালিডে নাম বদলে ম্যাজিশিয়ান কার্টারের দলে ঢুকে পড়ল। অন্যদিকে ইন্ডিয়া থেকে খবর এল পামার মৃত্যুশয্যায়। বেডলামে গোপনে হ্যালিডেরা কিছু পরীক্ষা চালাত, কিন্তু সেটা ঠিক কী, সে বিষয়ে আমাদের ধারণা ছিল না। হ্যালিডের ওপরে নজর রাখতে আমায় এ দেশে পাঠানো হল।"

"আপনি হ্যালিডে বা কার্টারের ঘর গোপনে পরীক্ষা করেননি?" প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল।

"করেছি। বহুবার। সন্দেহজনক কিচ্ছু পাইনি। মাঝে মাঝে আমারও মনে হতে লাগল আমরা বুনো হাঁসের পিছনে ধাওয়া করছি। এ দেশে এসে শুনি আর-এক কাণ্ড। বোম্বে নিয়ে যাওয়ার পথে হিলি পালিয়েছে, বদলে যাকে কাঠগড়ায় হাজির করা হয় সে অন্য কেউ।"

"একেবারেই তাই সাহেব", প্রিয়নাথ বলে ওঠে। "আমি নিজে তার প্রমাণ। আমি বলেছিলাম। সংবাদপত্রেও ছাপা হয়েছিল। কিন্তু কেউ মানেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা, কঠিন শাস্তি পাবে জেনেও সেই লোকটি বারবার দাবি করছিল সে-ই হিলি।"

"এর কারণ কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

"যা মনে হয়, সরকারি দারোগা হিসেবে তা বলার এক্তিয়ার আমার নেই।"

"এখানে তো সরকারি কেউ নেই। নির্ভয়ে বলুন।"

"আমার বিশ্বাস আসল হিলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়তো মেরে ফেলা হয়েছে। আর সেই জায়গায় প্রচুর অর্থ ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে এই লোকটিকে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়। বিচার শেষ হতে না হতে একে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

"আর এই কাণ্ডটি কে বা কারা করতে পারে?"

"সরকারের কোনও বড়ো পদাধিকারী।"

"ব্রাভো ইনস্পেকটর! এবার বুঝলেন তো, ভয়টা ঠিক কোথায়? এদের হাত কোথায় আর কতদূর ছড়িয়ে তার আন্দাজটুকু আমাদের নেই। তবে আমার ধারণা ছিল কার্টার আর হ্যালিডে এই খেলার দুই বড়ো গুটি। রক্ত পরিবর্তনের যে ঘটনাটা গতবার শুনেছিলাম সেটা আদৌ সত্যি কি না তা নিয়ে আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে। দুটো ব্যাপার পরিষ্কার। পলের মতো কার্টার আর হ্যালিডের খুনও নেহাত উত্তেজনার বশে না। হিলিকে যেমন কাজ হতে না হতেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এদেরও তাই। এই খেলায় এরাও বোড়ে। এক মাসের উপরে সোনাগাজির এক ঘরে ডালান্ডা হাউসের পাগলদের উপরে কোনও একটা পরীক্ষা করা হচ্ছিল। করছিল স্বয়ং হ্যালিডে। আমাদের বোঝানো হয়েছিল, সেই পরীক্ষা নেহাত রক্ত বদলে পাগলামো সারানোর পরীক্ষা। আমরাও বিশ্বাস করেছিলাম। ভেবেছিলাম পলের মৃত্যু নেহাত দুর্ঘটনা। কিন্তু গণপতির কাছে যা শুনলাম, তাতে এটা পরিষ্কার, পলকে যে খুন করা হবে, সেটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এক সপ্তাহ আগে থেকে। কিন্তু কেন? জানি না।"

"রমণপাষ্টি।" ক্ষীণ কণ্ঠে বলল তারিণী।

২।

এতক্ষণ সে যে ঘরে আছে সেটাই কারও খেয়াল ছিল না। সাইগারসন একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন। তারিণী অসুস্থ না হলে বোধহয় তাকে জড়িয়ে ধরেই নাচতেন।

"তুমি আমায় বলেছিলে। প্রথম দিনই বলেছিলে। আমি শুধু মেলাতে পারিনি। তার মানে পলের মৃত্যু খুন না, দুর্ঘটনা না। একেবারে রিচুয়ালিস্টিক ডেথ। বড়ো কাজে হাত দেবার আগে আত্মবলিদান। তাও সেই সাধু অরিজেনের কায়দায়। শুধু এক্ষেত্রে কাটা অণ্ডকোশ মুখে পুরে দেওয়া হয় না। কি, তাই তো?"

"হ্যাঁ। এক্ষেত্রে সেই অণ্ডকোশ পাঠিয়ে দেওয়া হয় তার কাছে, যাকে এই খেলার পরের চাল দিতে হবে।"

"ঠিক। ঠিক। কিন্তু দ্যাখো, তারপরেই সব চুপচাপ। যেন কিছুই হয়নি। আমরাও নিশ্চিন্ত।" সাইগারসন বলে চললেন, "গোটা ইংল্যান্ডে ডাক্তারদের কড়া নজরে রাখা হল। বেডলাম আর বার্ট হাসপাতালের সন্দেহে থাকা সব ডাক্তারকে ছাঁটাই করা হল। আমি নিজেও ছোটোখাটো মামলায় জড়িয়ে

পড়লাম। ভাবলাম ভারতে আর আসতে হবে না। একটা ছোটো কাঁটা আমার মনে বিঁধে ছিল। গত চার বছরে বারবার যেটা ভেবেও কূল করতে পারিনি। এই গোটা কাহিনিতে একজন আড়ালে থেকে গেছে। সে কোথা থেকে এল আর কোথায় গেল, কিছুই জানি না। শুধু কয়েকটা ব্যাপার ছাড়া। ডালান্ডা হাউসে আমি আর প্রিয়নাথ তাকে দেখেছিলাম, কার্টারের ম্যাজিক শো-তে সে ছিল, কার্টারের গলায় তার আঙুলের ছাপ আমি দেখেছি। তবে সে নিতান্ত নেটিভ ছোকরা, ব্রিটিশ সরকারের তাকে নিয়ে ভাবার কিছু নেই ভেবে অবজ্ঞা করেছিলাম। গণপতি আমার চোখ খুলে দিল। সেই প্রথম আমি খেয়াল করলাম ওয়ার্নার, হিলি, লখন থেকে শুরু করে কার্টার, হ্যালিডে সবাই হয় জারজ সন্তান, নয় হাফবর্ন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ১৩১৪ সালের ১৮ মার্চ ফ্রিম্যাসনদের গ্র্যান্ডমাস্টার জ্যাকোয়া দ্য মলির দেহ ছিন্নভিন্ন করে পুড়িয়ে মারে রাজা আর পুরোহিত। এই জ্যাকোয়ার পিতা কে তা সঠিক জানা যায় না। ফলে ম্যাসন আর জাবুলনদের মধ্যে রক্তের শুদ্ধতার বাছবিচার নেই। বরং উলটোটা। আমাদের শ্বেতাঙ্গ সমাজ বা নেটিভ ভারতীয় সমাজ যাদের ঘৃণা করে দূরে ঠেলেছে, তাদেরই জাবুলন এক ছাতার তলায় এনেছে। তাই লখন এই খেলার বোড়ে না। রীতিমতো ঘোড়া বা নাইট। একটাই সমস্যা। চার বছর আগে তাকে দেখেছিলাম। তারপর কেউ তাকে দেখেনি। আমি নিশ্চিত, আড়ালে থেকে সে গোটা খেলাটা খেলছে। কিন্তু সেটার ভয়াবহতা বুঝলেও সেটা ঠিক কী হতে পারে, বিপদ কোন দিক থেকে আসবে, তা ধরতে পারছি না। তাই সবার আগে একটা কাজ করতে হবে। ভালো আঁকিয়ে দিয়ে তার একটা ছবি আঁকিয়ে নিতে হবে আমাদের স্মৃতি থেকে।"

প্রিয়নাথ এই অংশটা বাংলায় বলতেই গণপতি বলে উঠল, "দরকার নেই। আমি দুদিন আগেই লখনকে দেখেছি।"

"নিজের চোখে?"

"নিজের চোখে। তবে সশরীরে না। যেদিন দারোগাবাবু আমায় শো থেকে তুলে নিয়ে এলেন, সেই শো-র আগে আমার বন্ধু হীরালাল ছায়াবাজি দেখাচ্ছিল। ওরই তোলা ছবি। তাতে কলকাতার নানা জায়গার ছবির সঙ্গে রাজভবনের ছবিও আছে। সেই রাজভবনের সামনেই আমি লখনকে দেখেছি। ও খেয়াল করেনি ওর ছবি তোলা হয়ে গেছে।"

"এক্সেলেন্ট!" শিস দিয়ে উঠলেন সাইগারসন। "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে

ছবি আমাদের জোগাড় করতে হবে। এবার তারিণী বলো। দু-একটা ছোট্ট প্রশ্ন। ইংল্যান্ডে আমায় জানানো হল, ভারতে, বিশেষ করে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় কিছু মানুষ হঠাৎ পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে। মানুষ খুন করছে। আবার পরমুহূর্তেই সে ঘটনা ভুলে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, চোখের সামনে যাকে খুন করতে দেখা যাচ্ছে, তার হাতের ছাপের সঙ্গে মৃতের দেহে পাওয়া হাতের ছাপ মিলছে না। আমাদের বিজ্ঞান এর কোনও ব্যাখ্যা দেয় না। আমি নিজে ভূতে বিশ্বাস করি না। যাকে বাঁচানোর জন্য অনেক কিছু জেনেও লুকিয়েছ, তাকে তো ওরা মেরেই ফেলেছে। শৈল তোমার এত কাছের বন্ধু। তুমিই ওকে ম্যাসনদের কাছে নিয়ে গেছিলে। তোমায় কি ও কোনও দিন কিছু বলেছে? জানো ওরা কী করতে চলেছে?"

তারিণী মাথা নাড়ল। তার দুচোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। ধরা গলায় বলল, "আমি ওকে অনেকবার বারণ করেছিলেম। ন্যাশনালের ঘটনাটা ঘটার পর একেবারে মনমরা হয়ে গেছিল। দুই-তিনবার নিজের প্রাণ নেবার চেষ্টাও করেছিল। বিষ খেয়ে। আমি বাঁচিয়েছি। তারপর আমি বললেম, চল আমাদের সংগঠনে যাবি। যেতে চায়নি। আমিই জোর করে নিয়ে গেলাম। তারপরেই কেমন যেন বদলে গেল। আমি নিয়মিত যেতে পারতাম না। ও যেত। একদিন দেখি খেস্টান হয়েছে। বললাম, কী দরকার? বলল, দরকার আছে। লেখার হাত ভালো ছিল। নাটক লেখা বন্ধ করে বিজ্ঞাপন লিখত। তারপর এক বছর ঘুরল না। ওকে যারা অত্যাচার করেছিল সব একে একে মরল। সন্দেহ হল। বললাম, তুই কি কিচু জানিস? বলল, যিশু শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু যিশু তো সবাইকে ভালোবাসেন জানি। তিনি কেন শাস্তি দেবেন? পুলিশে জানাতে পারতাম। জানাইনি। বন্ধুকে ধরিয়ে দেব? তারপর সেদিন দারোগাবাবু বেরিয়ে যেতে ওর লেখা নাটকটা পড়লাম। পড়েই আমি ভয় পেয়ে গেছি। এ যদি সত্যি হয় তবে শৈল আগুন নিয়ে খেলছে। ঠিক করলাম ওর এই নাটক কিছুতেই প্রকাশ পেতে দেব না। ওকে বলব পুলিশকে সব জানাতে। ও ফিরল না। বাধ্য হয়ে আমি দারোগাবাবুকে নাটকটা দিয়ে এলাম। মুখে কিছু বললাম না। যদি তাতে শৈলর কিছু ক্ষতি হয়।"

"আমি নাটকটা পড়েছি। কিন্তু তাতে ভয় পাবার মতো কিছু তো দেখতে পেলাম না!" প্রিয়নাথ বললে।

"আপনি ভালো মানুষ দারোগাবাবু। প্যাঁচের কথা বুঝবেন কেমন করে? তাও ভেবেছিলাম যদি বোঝেন। নিজের হাতে বন্ধুকে ধরিয়ে দিতে মন চাইছিল

না। এখন সেই বন্ধুই যখন নেই... দেখি, নাটকের বইটা। এনেছেন? সেদিন খুব সম্ভব এটার বাকি কপিগুলো খুঁজতেই ওরা এসেছিল। আমি মাঝে চলে আসায়..."

প্রিয়নাথ পকেট থেকে বইটা এগিয়ে দিল। তারিণী পাতা উলটে বলল, "এই দেখুন চতুর্থ অঙ্কে। কাপালিকের গৃহে একজন প্রবেশ করেছে। কাপালিক তাকে প্রশ্ন করছে। এই প্রশ্ন একেবারে ম্যাসনিক ব্রাদারহুডে যোগ দেবার দিন যখন দীক্ষা হয়, সেদিন করা হয়। ম্যাসনিক ব্রাদাররা জানেন। তারপরেই এই ভূতের কথা। এই ভূতের কথাই বাবু প্রসন্নকুমার আমায় বলেছিলেন। সেটা ঠিক কী কেউ জানে না। হতে পারে হিলির চুরি করে আনা সেই অজানা জিনিষ, হতে পারে অন্য কিছু। কিন্তু ম্যাসনে এই ভূত খুব কুখ্যাত। জাবুলনরা এটা নিয়ে কিছু করার চেষ্টায় আছে সেটা ম্যাসনরাও জানে। তারা শান্তিপ্রিয়। তাই তারাও চায় এই ভূতের খোঁজ পেতে, যাতে তারা ভূতকে নিরস্ত করতে পারে। আমার ধারণা, যেভাবেই হোক শৈল সেই ভূতের খবর জানতে পেরেছিল।"

"কিন্তু এই ভূতটা ঠিক কী আর এটা দিয়ে জাবুলন কী করতে চাইছে?" এবারে বেশ অধৈর্য হয়েই বললেন সাইগারসন।

"ভূত কী তা জানি না, তবে... আমায় একটা পেনসিল দেবেন?" দুর্বল গলায় বলল তারিণী। সাইগারসন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পকেটবুকে রাবারব্যান্ডে বাঁধা পেনসিলটা বার করে তারিণীর হাতে দিলেন। তারিণী প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি বাংলায় আপনাকে বলছি। আপনি সাহেবকে ইংরাজিতে বলে দেবেন।" এই বলে বইয়ের এক জায়গায় পেনসিল দিয়ে হালকা হালকা দাগ দিতে থাকল।

"ফ্রিম্যাসনদের যে কটা কোড আছে তার মধ্যে এটা ম্যাসনদের প্রায় সবাই জানে। পুরোনো কোড। রিভার্স রিড। কেউ কেউ একে অক্স-টার্নও বলেন। যেভাবে গোরু খেতে লাঙল দেয়। সামনে থেকে পিছনে গিয়েই আবার সেই পথে পিছনে ফেরা। বাক্যের সামনে থেকে পিছনে পড়লে একরকম। উলটো পড়লে আলাদা। বাংলায় এর নাম বিপরীত সম্পাতি। বড়ো একটা লেখাকে ছোটো ছোটো ভাগে ভেঙে দেওয়া হয়। সাধারণভাবে পড়লে একটা অর্থ অবশ্যই থাকে। কিন্তু আসল অর্থ লুকিয়ে আছে উলটো করে পড়লে। ম্যাসনরা যখন জেরুজালেমে ছিল তখন এই কোড চালু হয়। এখানে শেষ বাক্য থেকে শুরু করতে হবে। তারপর পড়তে হবে শেষ থেকে শুরুতে। প্রথমে একটা শব্দ বাদ দিয়ে দ্বিতীয় শব্দ। এই দেখুন। পরের

বাক্যে দুটো বাদ দিয়ে তৃতীয় শব্দ। এইভাবে। দেখুন, আমি দাগ দিয়ে দিলাম। এবার নিচ থেকে উপরে পড়ুন।"

প্রিয়নাথ একবার পড়ল। দুইবার পড়ল। বারবার পড়ল। এ যে অবিশ্বাস্য! সে এতটাই অবাক হয়ে গেল যে পাশে দাঁড়িয়ে উশখুশ করা সাইগারসনকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে দেবার ভাষা জোগাচ্ছিল না।

অষ্টম পর্ব— দেখা গেল পথ আছে

১।

অফিসার ঠিক এই প্রশ্নটা আশা করেননি। খানিক আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "এ কথা তোমার মনে হল কেন?"

"দেখুন, সত্যি বলতে কেসটা শুরুতে আমি ধরতেই পারছিলাম না। তারিণী, প্রিয়নাথ, গণপতি, তৈমুর সব মিলিয়ে মিশিয়ে এমন জট পাকিয়েছে যে ছাড়ানো অসম্ভব। যখন আমি এক এক করে ছাড়াতে শুরু করলাম, তখনই একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল হল।"

"কী সেটা?"

"গতকাল রাত থেকে আমি ঘুমাইনি। প্রায় সারারাত ভেবেছি কেসটা নিয়ে। দেবাশিসদার খুন। বিশ্বজিতের খুন। রমণপাষ্টি। হিলি। রামানুজ। সবাইকে নিয়ে। আর তাতেই খেয়াল করলাম কেসের বেশ কয়েকটা আসল দিক আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। ম্যাজিকে কী হয় জানেন তো? আসল ম্যাজিক চলে অন্য জায়গায়। দর্শকদের ধোঁকা দিয়ে অন্যদিকে মনোযোগ দিতে বলা হয়। এটাও সেরকম।"

"তাই নাকি? কীরকম?"

"একেবারে শুরু থেকে শুরু করি। না হলে বোঝানো যাবে না। বছর তিনেক আগে আমি যখন প্রথম ডিটেকটিভের অফিসটা খুলে বসি, তখন বিজ্ঞাপন দেখে দেবাশিসদা আমায় ডাকেন। এমন একটা কেস দেন, যার কোনও মেরিট নেই। তাঁর যে স্ত্রী এমনিতেই তাঁর সঙ্গে থাকছিলেন না, তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড়ের। সেটা একেবারেই ধোঁকার টাটি। আসল উদ্দেশ্য উনি কথায় কথায় বলে ফেলেছিলেন। "আমি তারিণীচরণের প্রপৌত্র।" মজার ব্যাপার, গতকালই আমি জানতে পেরেছি, উনি আমার বাবাকেও চিনতেন। শুধু চিনতেন না, বাবা মারা যাবার পর ওঁর বাড়িতে এক

স্মরণসভাও হয়েছিল, যা আমি জানতামই না। তাহলে বাবাকে না ধরে সোজা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কেন? কারণ একটাই হতে পারে। দেবাশিসদার কোনও উদ্দেশ্য ছিল, যেটা বাবা জানতেন। ফলে বাবার থেকে সাহায্য পাবার আশা ছিল না। উনি বারবার আমাকে তারিণীর ডায়রির কথা জিজ্ঞাসা করতেন, জানতে চাইতেন সেটা কোথায় আছে? আমি বলতে পারিনি। কী ছিল তারিণীর ডায়রিতে? জানা নেই। এদিকে সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ না করে ক্লায়েন্ট হিসেবে যোগাযোগ করার আর-একটা কারণ দেখতে পাই। উনি বোধহয় বুঝেছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং করার পরেও আমার এই গোয়েন্দাগিরি বাড়ির লোকে ভালোভাবে নেয়নি। ফলে বাড়িতে ক্লায়েন্ট নিয়ে আলোচনার সুযোগ কম। এইভাবেই চলতে পারত, যদি না একদিন আচমকা দেবাশিসদা খুন হতেন। খুন হবার আগে উনি ঠিক কী করলেন? পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন না, নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন না, শুধু আমায় একটা হোয়াটসঅ্যাপ করলেন। তাও চার লাইন কবিতা লিখে। এটা আপনার লজিক্যাল মনে হয়?"

"হয় না, তবে মানুষ ভয় পেয়ে গেলে প্যানিকে কী করে তার কোনও ঠিক নেই।"

"প্যানিকে মানুষ চিৎকার করে, পাগলামো করে, মাথা ঠোকে। ডায়রি পেন নিয়ে বসে কবিতা লেখে না।"

"তা বটে।"

"তারপর এল কাটা অণ্ডকোশ। যেটা আপনার বাড়ি ফেলে আসা হয়েছিল। যেটা দেখে আপনি ভয় পেয়ে সেটাকেই লাইব্রেরি নিয়ে গেলেন।"

"হ্যাঁ, সেটা কী হয়েছে?"

"দেবাশিসদার বুকের কাটা দাগ আর সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন দেখে আমিই প্রথম আপনাকে লিং চি-র কথা বলি। দেবাশিসদা চিনেপাড়ায় যেতেন, তাই আমাদের সন্দেহ আরও প্রবল হয়। এমনকি কোনও চিনা দল গংসি-এর পিছনে আছে, সে বিশ্বাস আমাদের জন্মে যায়। এই গোটাটাই আমার ভুল। আমার ভাবনার ভুল। আমি নিজেও ভুল ভেবেছি, আপনাকেও ভাবিয়েছি। ফ্রিম্যাসনদের নিয়ে এত কিছু তো পড়েছেন। রমণপাষ্টি মানে জানেন?"

"আরে! এটাই তো ছিল সেই বিশ্বজিতের কাছে দেওয়া চিরকুটে।"

"হ্যাঁ। আমি অনেক খুঁজলাম কাল। প্রথমে পাইনি। তারপর 'সংবাদপত্রে

সেকালের কথা'-র একটা ডিজিটাল ভার্সন খুঁজতে গিয়ে এটা পেলাম। পড়ে দেখুন। ছোট্ট ছোট্ট টীকায় কী লেখা আছে—

'রমণপাষ্টি— ম্যাসনদিগের বর্গক্ষেত্র। বৃহৎ কোনও কার্যে লিপ্ত হইবার পূর্বে ম্যাসনগণ এই ছকক্রীড়ার মাধ্যমে আত্মবলিদান করিয়া থাকেন।" মানে পরিষ্কার। দেবাশিসদা নিজেই নিজের মৃত্যুকে স্টেজ করেছেন। ঠিক যেভাবে একজন সফল নাট্যকার করেন। আমরা সবাই তাঁর দেখানো পথে চলছি, তাঁর পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছি, তাঁর সাজানো ক্লু খুঁজে পেয়ে আনন্দে নেচে উঠছি। সোজা কথায় দেবাশিসদা আমাদের নিজের উদ্দেশ্যে ইউজ করছেন। এমনকি মৃত্যুর পরেও। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি। প্রায় তিন বছর ধরে উনি জাল বিছিয়েছেন। প্রমাণ চান? এই দেখুন", বলে রামানুজের কাছ থেকে পাওয়া কাগজটা বাড়িয়ে ধরলাম অফিসারের সামনে।

"হ্যাঁ, এটা দেখেছি তো।"

"কাগজটা খেয়াল করুন। ঠিক যে কাগজে আমায় কবিতা লেখা হয়েছিল, সেই কাগজ। তবে আমায় লেখা কাগজের মতো এটা তাড়াহুড়ো করে ছেঁড়া না। একেবারে নিপুণভাবে ধৈর্য ধরে গোড়া থেকে কেটে নেওয়া, যাতে দেখেও না বোঝা যায় এই পাতা কোনও খাতা থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে।"

"তাতে কী হল?"

"এবার ভালো করে দেখুন, এই কাগজের ঠিক উপরের কাগজে কিছু একটা লেখা হয়েছিল। এটায় তার ছাপ পড়েছে।"

এই ম্যাজিকটা আমি অফিসারের সামনেই দেখাব বলে ঠিক করেছিলাম। পকেট থেকে একটা কাঠপেনসিল বার করে খুব হালকা হাতে সেই ছাপের ওপরে বোলাতেই খুব চেনা চারটে লাইন সামনে এল—

"প্রিয়নাথের শেষ হাড়/ তৈমুরের কাব্যগাথা/ গণপতির ভূতের বাক্স/ তারিণীর ছেঁড়া খাতা"

"এর মানে কী?"

"মানে একটাই। যা ভাবছি, তাই ঠিক। এই কবিতা অনেক ভেবেই পাঠানো। তাড়াহুড়োতে না। এটা লিখে এমনভাবে ছেঁড়া হয়েছে যাতে মনে হয় দেবাশিসদার তাড়া ছিল। এটা লেখার পরেই তিনি বিশ্বজিতের নির্দেশটা লেখেন। ভালো কথা, বিশ্বজিতের পোস্টমর্টেমে কী যেন বেরিয়েছে বললেন?"

"ও হ্যাঁ। দিন পনেরো আগে মারা হয়েছে। কিন্তু ওখানে ফেলা হয়েছে সেদিন বা আগের দিন। বডি খুব সম্ভব কোনও বরফের চাঁইতে বা মর্গে রেখে

দেওয়া হয়েছিল। ডিটেইল পরে পাব। তবে যেটা ইন্টারেস্টিং, ছুরি দিয়ে NO লেখা ছিল না। একটা ত্রিভুজ আর গোল। চারদিকে লেখা ছিল JAHBOULON। আমরা ওই অন-টা উলটে নো দেখেছিলাম।"

২।

অনেক সময় মানুষ উটপাখি হয়ে যায়। চোখের সামনে প্রমাণ থাকলেও দেখতে চায় না। আমরাও জাবুলনকে যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছিলাম না। বিশ্বজিতের এই খুনটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব দেখানো। কেন এমন করছে এরা? নিজের উপরেই রাগ ধরছে। বেশ জোরেই বলে ফেললাম, "আপনি এবার সত্যিটা বলুন দেখি।"

"মিথ্যে কথা কী বলেছি তোমায়?"

"মিথ্যে বলেননি। সত্য গোপন করেছেন। ঠিক একশো বছর আগে কলকাতায় যে ঘটনা ঘটেছিল, তার তিনজন সাক্ষী ছিল। তারিণীচরণ রায়, গণপতি চক্রবর্তী আর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। গণপতি বিয়ে করেননি। লিভ টুগেদার করতেন সার্কাসের হিঙ্গনবালা ওরফে হরিমতীর সঙ্গে। সুতরাং গণপতির যা কিছু জানা ছিল সব তাঁর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। তাঁর কোনও উত্তরাধিকারীও নেই যার কাছে কোনও সূত্র থাকতে পারে। তারিণীর উত্তরাধিকারী আমি। দেবাশিসদা আমায় খুঁজে বার করেছেন ঠিক। আর থাকেন আপনি। যাকে দেবাশিসদা বিনে পয়সায় পড়াতেন, চ্যালা বলে ডাকতেন, বিয়েতে সাক্ষী করেছিলেন। আপনার পদবি মুখোপাধ্যায়... আর কিছু বলব?"

অমিতাভ মুখার্জির মুখে অদ্ভুত হাসি।

"কিছু জিনিস স্বীকার করতে নেই। বুঝে নিতে হয়। তুমি তো গোয়েন্দা। আমি সব বলে দেব কেন? তবে তোমার এটা বুঝতে এত সময় লাগল দেখে অবাক হচ্ছি।"

"আর হ্যাঁ, আপনি আরও একটা মিথ্যে বলেছেন আমায়। আপনি আদৌ প্রিয়নাথের শেষ লেখাটা দেখেননি। যতটুকু শুনেছেন, দেবাশিসদার মুখে শুনেছেন। ভুল বললাম?"

"এটা কেন বলছ?"

"আমি খুব স্পেসিফিক্যালি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি ওই পাণ্ডুলিপি দেখেছেন কি না। আপনি বলেছিলেন দেখেছেন। তাতে কলকাতার এক জাদুকরের খুন নিয়ে কথা আছে। এদিকে 'নীবারসপ্তক' নামের ২০৬

নম্বর লেখা, যেটা প্রিয়নাথ লিখছিলেন, তার বেশ কিছু নোটস, কাটিং অরুণবাবুর ফাইলে আছে। সেখানে দেখি সম্পূর্ণ অন্য খবর। অন্য নোটস। বিশেষ করে অদ্ভুত কিছু দাঙ্গার, জাতিগত হানাহানির কথা আছে এতে। আমি নেটে চেক করেছি। কলকাতায় এই ধরনের দাঙ্গার সেই শুরু। প্রিয়নাথ এসব নিয়ে লেখেননি এটা হতেই পারে না। আমিও অবাক হচ্ছি, আপনাকে দেবাশিসদা কীভাবে বোকা বানিয়েছেন তা দেখে।"

"মানে?"

"প্রিয়নাথের একটা লেখা চুরি করে আনেন দেবাশিসদা। ওতেই যদি সব থাকে তাহলে আপনাকে প্রয়োজন কোথায়? কোন জিনিস একমাত্র উত্তরাধীকারীর কাছেই থাকতে পারে? যার জন্য দেবাশিসদা আপনার খোঁজ করেছিলেন?"

"তাহলে খুলেই বলি। আমি এসব কিচ্ছু জানতাম না। বাবা ছোটোবেলায় মারা গেছেন। মামাবাড়িতে মানুষ। পৈতৃক বাড়িতে শরিকি সমস্যা। ঢুকতে পারি না। দেবাশিসদা আমায় পড়াতেন। আগেই তো বলেছি। ২০১২-তে গোপালচন্দ্রের ফাইলটা পেয়ে উনি উত্তেজিত হয়ে যান। বলেন যে করেই হোক, আমাকে শরিকি বাড়ির পজেশন নিতে হবে। মায়ের মুখে শুনেছিলাম প্রিয়নাথ দারোগা নাকি আমার কী সম্পর্কে প্রপিতামহ হন। একবার কথায় কথায় ওঁকে এটা বলেওছিলাম। তারপরেই উনি উঠে পড়ে লাগলেন। বললেন আর্কাইভে নাকি পুরোনো সব দলিল দস্তাবেজ থাকে। সেখান থেকে উনি আমার হক আদায় করে দেবেন। ওই পাণ্ডুলিপিতে নাকি প্রমাণ আছে।"

"সে প্রমাণ আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?"

"না। এটা উনি দেখাতেন না। বলতেন সময় হয়নি। হলে সব আমাকেই দিয়ে দেবেন। আমিও ঘাঁটাতাম না।"

"বুঝতে পারছেন, কেন উনি চাইতেন আপনি ওই বাড়ির পজেশন নিন?"

"বুঝেছি। ভূতের বাক্স। দেবাশিসদা বলেছিলেন, লেখার একদম শেষে ছিল গণপতির ভূতের বাক্সের ভূতকে নাকি আয়ত্তে আনা গেছে। সেটার ধড় নাকি প্রিয়নাথের কবজায় রয়েছে।"

"আর মুন্ডু?

"তারিণীর কাছে।"

"বাহ। আর এটা আপনি এতদিন বলেননি? এই কি সেই গুপ্তধন, যার কথা দেবাশিসদা বলতেন?"

"তাই হবে হয়তো। আমি আসলে ব্যাপারটাকে খুব একটা পাত্তা দিইনি। অ্যাকাডেমিক খেয়াল ভাবতাম। উনি তো এটাও বলতেন, যদি সেটা খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে সারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় আনা যাবে।"

"প্রিয়নাথ ভূত নিয়ে ঠিক কী লিখেছেন? কোনও আইডিয়া আছে?"

"স্পষ্ট কিছু না। তবে শুনেছি শুরুর দিকে প্রিয়নাথের লেখা যেমন অসামান্য বর্ণনাময়, শেষের দিকে কেমন যেন গুটিয়ে গেছে। অলংকারের ব্যবহার বেশি, সোজা কথাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লেখা, অনর্থক বাগাড়ম্বর। তবে ভূতের কাণ্ড নিয়ে নানা গল্প আছে। দেবাশিসদা সিরিয়াসলি বলতেন। আমার বিশ্বাস হত না। রূপকথার গল্পের মতো।"

"কীরকম?"

"সেই সময় কলকাতায় নাকি হঠাৎ হঠাৎ লোকজন পাগলের মতো আচরণ করতে আরম্ভ করেছিল। কোনও কারণ ছাড়াই কেউ ছাগল কাটতে গিয়ে ভাইয়ের গলা রামদা দিয়ে কেটে দিচ্ছে, খিদিরপুরে মুসলমান শ্রমিক হাসতে হাসতে হিন্দুর গলা টিপছে, বিদ্যুতের তার লাগাতে গিয়ে ইচ্ছে করে কাউকে মেরে ফেলা হচ্ছে— এমন সব। দুটো ব্যাপার অবশ্য খুব ইন্টারেস্টিং। এক, ঘটনার পরে কারও সে কথা মনে নেই আর দুই হাতের ছাপ নাকি বদলে যাচ্ছিল। তবে এসবের একটারও কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। হয়তো তাই এগুলো প্রিয়নাথ ছাপেননি। আষাঢ়ে গপ্পো আর কাকে বলে!"

আমি একটু চমকে উঠলাম। "আপনি আনন্দবাজারে কিছুদিন আগে এই খবরটা দেখেছেন? খিদিরপুরে হিজড়াদের খোলায় হয়েছিল? দেখুন, আমি মোবাইলে সেভ করে রেখেছি। বেশ ইন্টারেস্টিং।"

অফিসার "কই দেখি" বলে আমার হাত থেকে নিয়েই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"এমনিতে তো ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। কিন্তু..."

"আপনি যে আষাঢ়ে গপ্পোগুলো বললেন তার সঙ্গে মিল পাচ্ছেন?"

অফিসার উত্তর দিলেন না। শুধু উপরে নিচে মাথা নাড়লেন।

"আর-একটা তথ্য দিই? সেদিন জবানবন্দি নেবার সময় রামানুজ বলে ফেলেছিল, বিশ্বজিৎ নাকি এই খিদিরপুরের খোলাতেই যেত। তারিখটা দেখুন। রামানুজের সঙ্গে দেখা হবার কয়েকদিন আগে। মিলছে? রামানুজ যা বলছে, আমার ধারণা ও তার থেকে অনেক বেশি জানে। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে দেবাশিসদার ওই কাগজটা ও ইচ্ছে করেই আমাদের দিল। হয়তো দেবাশিসদার এমনই নির্দেশ ছিল। কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে, আর কে সত্য গোপন

করছে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। জাল কোথায় কীভাবে পাতা আছে কে জানে? ওকে জেরা করতে হবে। ছাড়লে চলবে না।"

"বুঝলাম। তবে এত কাণ্ড কীসের জন্য সেটাই তো বুঝছি না। সেটা বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো হবে না তো?"

আমি জানতাম ঠিক এই প্রশ্নটাই আসবে। ব্যাগ থেকে টেমারলেনে মোড়া পালার বইটা বার করলাম। মলাট দেখে মুখার্জির চক্ষু চড়কগাছ। হেসে বললাম, "যা ভাবছেন তা নেই। তবে যা আছে দেবাশিসদা সেটারই খোঁজ করছিলেন সম্ভবত।"

পাতা ওলটাতে বাংলা পালা-টা দেখতে পেলেন মুখার্জি। মুখে একটু হতাশ ভাব। "ওহহ এটা। দেখেছি তো আগে।"

"হ্যাঁ দেখেছেন। আমিও দেখেছি। কিন্তু লক্ষ করিনি। শৈলচরণের লেখা শেষ রচনা। খুব সম্ভব এটার জন্যেই মরতে হয়েছিল তাঁকে। আপাতদৃষ্টিতে একেবারেই যৌনগন্ধী এক পালা। রূপকথার। কিন্তু প্রথমবার লক্ষ করিনি। কাল দেখতে গিয়ে বইয়ের একেবারে শুরুতে এই বিজ্ঞাপন অংশে চোখ পড়ল। প্রায় দেখাই যায় না, কে যেন খুব হালকা হাতে পেনসিলে কিছু শব্দে দাগ দিয়েছে। শুধু শব্দগুলো পড়ুন"।

"সাবধান-ষড়-হত্যার-রাণী-জুবিলিতে। এর মানে কী?"

"উঁহুঁ! রিভার্স রিড। এগুলো উলটো করে পড়তে হয়। নাইট লিখেছেন"।

"জুবিলিতে রাণী হত্যার ষড়। সাবধান! জুবিলি কী?"

"সেটা আমিও জানতাম না। নেটে কাল খোঁজ করে পেলাম। মহারানি ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের ডায়মন্ড জুবিলি উপলক্ষ্যে ১৮৯৭ সালে বিরাট এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একটা ইংল্যান্ডে, অন্যটা এই দেশে। এমনকি সেই উপলক্ষ্যে স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়ার নাকি ভারতে আসার কথা ছিল। সেই প্রথমবার। শেষ অবধি কিছু একটা হয়। কী হয়, জানা নেই। আচমকা রানির ভারতে আসার প্ল্যান বাতিল হল। যদি এই লেখা সত্যি হয়, তবে তো বলতে হয় রানিকে খুনের এমন কোনও ষড়যন্ত্র হয়েছিল যা শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে যায়। কারণ এই লেখার সাল দেখুন। ঠিক তার আগের বছর।"

"সেটা কি সেই ভূত দিয়ে?"

"হতেই পারে। আর সেই ভূত এমন একটা কিছু, যা সাধারণের ধারণার বাইরে। যা মানুষকে নিমেষে পাগল করে দেয়। হাতের ছাপ বদলে দেয়। জন এফ কেনেডিকে যে মেরেছিল, সেই লি হার্ভে অসওয়াল্ড, বারবার বলেছিল

তার খুনের ঘটনার কিচ্ছু মনে নেই। তার গত চব্বিশ ঘণ্টার স্মৃতি কে যেন মুছে দিয়েছে। ভুলে গেছেন? বিচারসভায় নিয়ে যাবার সময়ই তাকে খুন করা হয়। পাছে আরও কিছু সত্য বেরিয়ে আসে।"

"তুমি বলতে চাও এবারও তেমন কিছু হচ্ছে?"

আমি গতকাল উর্ণার থেকে পাওয়া কাগজটা অফিসারের হাতে দিলাম।

"এ কী! এ তো..."

"একদম তাই। আপনার চেনা চিহ্ন। কিন্তু তাড়াহুড়ো করা যাবে না। এরা অত্যন্ত হুঁশিয়ার আর বিপদজনক। এরা কিছু করতে চাইছে। রিচুয়ালিস্টিক খুনের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। আমাদের চেনাশোনার মধ্যে একমাত্র উর্ণার বাবা আছেন, যিনি হয়তো এদের সঙ্গে জড়িত এবং ভাগ্যক্রমে এখনও জীবিত। কিন্তু বাকি কারা আছে? তাদের কী কাজ? কিচ্ছু জানি না। আপাতদৃষ্টিতে এটা আর দশটা এনজিও-র মতোই। আইনি পথে এগোনো যাবে না। একেবারে গোপনে কাজ করতে হবে।"

"কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না। এখন তো রানি নেই। এখন এদের উদ্দেশ্য কী?"

"একটু আগে স্টিফেন নাইটের বইয়ের কথা বলছিলাম তো আপনাকে। ইংল্যান্ডের আসল চালক নাকি এখন এই ফ্রিম্যাসনরাই। ধরে নিন এই নতুন করে উঠে আসা জাবুলনরা ঠিক সেটাই চাইছে। প্রথমেই গোটা দেশে ঝামেলা বাধিয়ে দেবে। মানুষ মানুষকে মারবে পাগলের মতো। জাতিদাঙ্গা বাধবে। ভূতের প্রভাবে মানুষ আর মানুষ থাকবে না। তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পাবে। এসব আসলে ডেমো। নিজেদের জানান দেওয়া। মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া। ভক্ত তৈরি করা। যারা দুর্বল তাদের অনেকেই কেউ ভয়ে, কেউ ভক্তিতে তাদের সমর্থন করবে। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, ভূতের পরাক্রমের কথা জানতে পারলে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দল এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আর সেই সুযোগে চলবে দরদাম। টাকার। ক্ষমতার। দেশের আসল নিয়ন্ত্রণ এসে যাবে এদের হাতে। কিং না হয়েও কিং মেকার"

"কী সাংঘাতিক! যা বলছ, তা যদি সত্যি হয়, তবে তো ভয়ানক ব্যাপার! কিন্তু এতদিন চুপ থেকে ঠিক এখনই কেন জেগে উঠল এঁরা?" অফিসারের মুখে কেমন একটা হতভম্ব ভাব।

আমিও কাল রাত জেগে ঠিক এটাই ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কফি হাউসের সামনে গোপালের বলা কথাগুলো মনে পড়ল। আর এক মুহূর্তে

সব কুয়াশা যেন সরে গেল চোখের সামনে থেকে। "এডা তো সেমিফাইনাল। ফাইনাল হইব নেস্ট ইয়ার"

একটু হেসে বললাম, "এই বছরটা ভুলে গেলেন অফিসার মুখার্জি? ২০১৮। সবে পঞ্চায়েত ভোট শেষ হল। সামনের বছর ভারতের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। লোকসভা নির্বাচন। সেই একশো বছর আগের জুবিলির মতো। এরা এতদিন শুধু চুপচাপ অপেক্ষা করছিল। এখনই তো এদের জেগে ওঠার পালা। উঠছেও। হিলির ভূত কী জিনিস জানি না, কীভাবে তাকে জব্দ করব তাও জানা নেই। তবু আমি আমার মত এগোচ্ছি। আপনি বরং একটা কাজ করুন। আপনার দপ্তরে খোঁজ নিন আর কোথায় কোথায় এই ধরনের অদ্ভুত খুনোখুনি হচ্ছে। সব খবর পেপারে আসে না। দরকার হলে সেখানে গিয়ে সরজমিনে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। আমি নিশ্চিত, কিছু না কিছু ক্লু পাওয়া যাবেই। তবে আবার বলছি। যা করবেন, গোপনে করবেন। আপনার দপ্তরেও যে এঁদের লোক বসে নেই তার গ্যারান্টি কোথায়? দেরি করা যাবে না। হাতে একদম সময় নেই"

অন্তিম পর্ব— অপরাহ্ণে রোদের ঝিলিক

অফিসার চলে যাবার পরেও আমি বসে রইলাম চুঁচুড়া কবরখানায়। সন্ধে হয়ে আসছে। পাখিরা ঘরে ফিরছে একে একে। সামনের জামরুল গাছে তাদের সবাই বাসা বেঁধেছে। গার্ড আর বেশিক্ষণ থাকতে দেবে না আমায়। প্রিয়নাথের কথামতো তারিণীর কাছে নাকি সেই ভূতের মুন্ডু ছিল। কোথায় রাখতে পারে তারিণী সেই মুন্ডু? কোন গোপন স্থানে? ডিরেক্টরের মধ্যে তো এই বই আর সেই ছবি বাদে একটা সুতলি অবধি নেই। আর ভূতটার রকম ঠিক কী, তা বুঝতে না পারলে মুন্ডু খোঁজাও তো মুশকিল।

কোলে বইটা রেখে একটা সিগারেট ধরালাম। এমনিতে সিগারেট খাওয়া প্রায় ছেড়েছি বললেই চলে। কিন্তু আজ আর নিতে পারছি না জাস্ট। সারারাত জাগা। প্রচণ্ড হতাশ লাগছে। আমার প্রতিটা পদক্ষেপ আগে থেকেই যেন জেনে বসে আছে কেউ। কোনও দিকে কোনও দিশা দেখতে পাচ্ছি না। নো ক্লু। তবে আমি নিশ্চিত শৈলর লেখা এই নাটকের বিজ্ঞাপন শুধু না, গোটা নাটকটাই একটা জ্বলন্ত কয়লায় মত। এতে এমন কিছু লেখা আছে, যা আমাদের চিন্তার বাইরে। চোখের সামনেই আছে, কিন্তু ডিকোড করতে পারছি না। শৈল এই
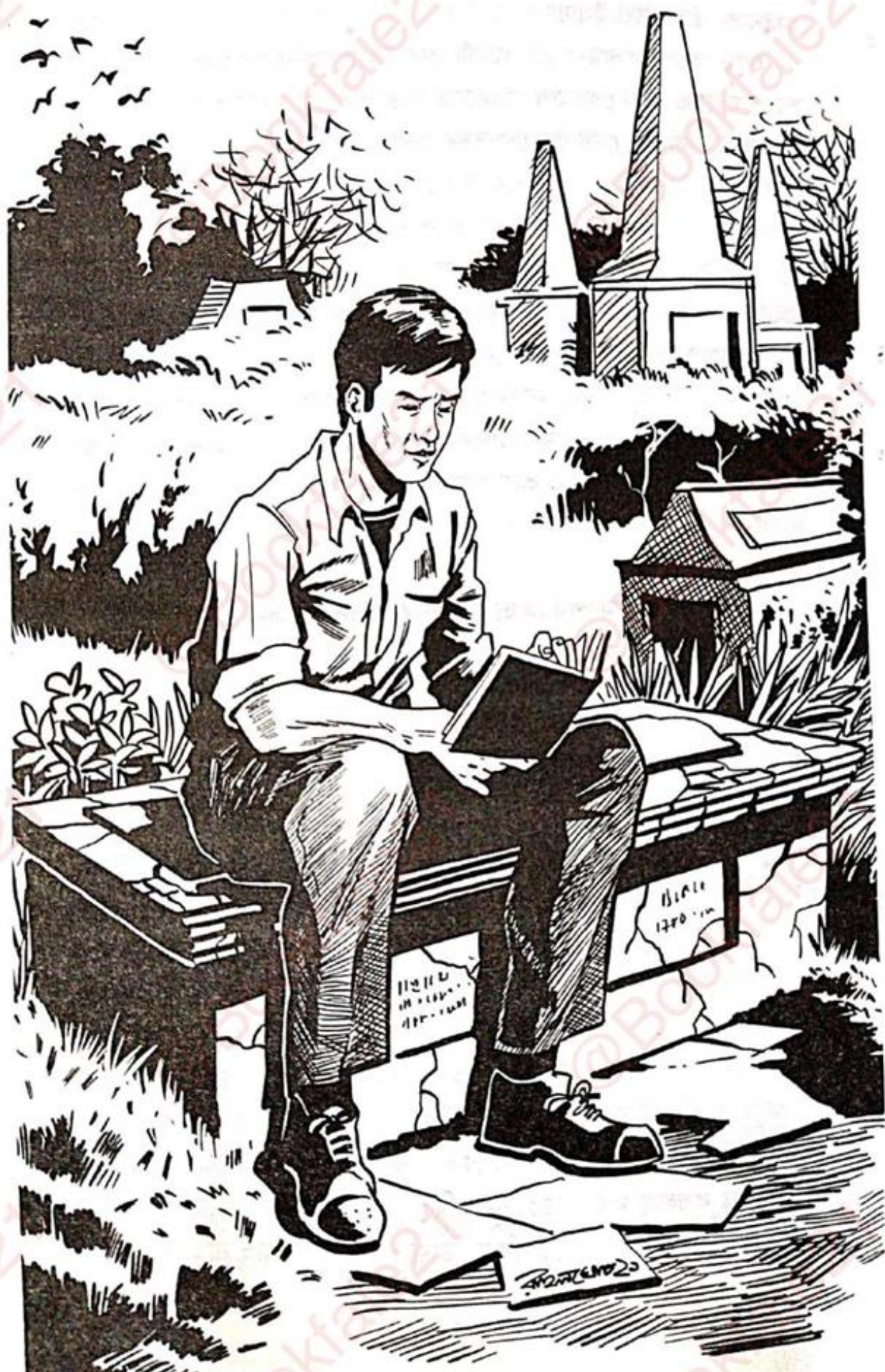
নাটক লিখে কাউকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। কিংবা যেটা আরও খারাপ, চেয়েছিল ব্ল্যাকমেল করতে। কিন্তু কীভাবে? এই নাটকের রহস্যভেদ না করলে কেসের সমাধান অসম্ভব।

এইসব ভাবছি আর বইটা খুলে টেমারলেনের মলাটের দিকেই চেয়ে আছি। কী কপাল আমার! শুধু মলাটটা রয়ে গেছে আমার কাছে। গোটা বই থাকলে আজ আমি কোটিপতি। এটা এত যত্নে রাখারই বা কী দরকার ছিল তারিণীর?

রাগ গিয়ে পড়ল টেমারলেনের উপরে।

পুড়িয়ে ফেলি? যে বই নেই, তার মলাট দিয়ে কী লাভ? মলাটটা আলাদা করে খুলে নিয়ে লাইটার জ্বালিয়ে পিছনে ধরলাম। আগুনের শিখা মলাটকে স্পর্শ করেনি, কিন্তু তাতে তাপ লাগছে। আর... আর সেই তাপে আপাতশূন্য সেই মলাটের পিছনের খালি জায়গা জুড়ে এসব কী ফুটে উঠছে? এই চিহ্ন, এই অক্ষরের কিছু আমার চেনা। তবে অনেকটাই অচেনা। এ যে একের পর এক ফর্মুলা লেখা! ঠিক কোন কেমিস্ট্রির বইয়ের মতো। কী এগুলো? কে লিখেছে এসব?

বুঝেছি। ভ্যানিশিং ইঙ্ক। উনিশ শতকে নানা গোপন বার্তা এই কালিতে লিখে পাঠানো হত। ফলে সাদা চোখে কিছু দেখা যেত না। কিন্তু একটু তাপ দিলেই...

লাইটারটা খুব ধীরে ধীরে মলাটের উপরের দিকে নিয়ে গেলাম। প্রচণ্ড জড়ানো প্যাঁচানো অক্ষরে কী যেন লেখা। তবে এ ভাষা আমি চিনি। বিশুদ্ধ ইংরাজি। আর তাতে লেখা আছে—

The Detailed Procedure to make B.H.N.T.

"সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মত জ্বলে
জাগে নাকি হে জীবন— হে সাগর—
শকুন্ত-ক্রান্তির কলরোলে।"

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

সূর্যতামসী খ্যাত শ্রী কৌশিক মজুমদার প্রণীত

নীবারসপ্তক

অভিনব রহস্যময়-ডিটেক্‌টিভ-প্রহেলিকা।

ভীষণ ঘটনাবলীর এমন অলৌকিক ব্যাপার কেহ কখনও পাঠ করেন নাই
পাঠকদিগকে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ইহা ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুনিপুণ, অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ শ্রীতারিণীচরণ রায়ের
আর একটি নূতন ঘটনা—সুতরাং ইহা যে গ্রন্থকারের সেই সর্ব্বজন-সমাদৃত
সূর্যতামসী উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইবে,
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাঠকালে যাহাতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠকের
আগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়; এইরূপ রহস্য-সৃষ্টিতে গ্রন্থকার বিশেষ সিদ্ধহস্ত;
তিনি দুর্ভেদ্য রহস্যাবরণের মধ্যে হত্যাকারীকে এরূপভাবে প্রচ্ছন্ন রাখেন যে,
পাঠক যতই নিপুণ হউক না কেন, যতক্ষণ গ্রন্থকার নিজের সুযোগমত সময়ে স্বয়ং
ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাইয়া দিতেছেন, তৎপূর্ব্বে
কেহ কিছুতেই প্রকৃত হত্যাকারীর স্কন্ধে হত্যাপরাধ চাপাইতে পারিবেন না।
অমূলক সন্দেহের বশে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে কেবল বিভিন্ন পথেই চালিত
হইবেন; এবং ঘটনার পর ঘটনা যতই নিবিড় হইয়া উঠিবে, পাঠকের হৃদয়ও
ততই সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে থাকিবে। ইহাতে এমন একটিও পরিচ্ছেদ
সন্নিবেশিত হয় নাই, যাহাতে একটা-না-একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাব অথবা কোন
চমকপ্রদ ঘটনার বিচিত্র-বিকাশে পাঠকের বিস্ময়-তন্ময়তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না
হয়; এবং যতই অনুধাবন করা যায়, প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রহস্য কেবল
নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে থাকে—গ্রন্থকারের রহস্য-সৃষ্টির যেমন আশ্চর্য্য
কৌশল, রহস্যভেদেরও আবার তেমনি কি অপূর্ব্ব ক্রম-বিকাশ। এইরূপ
ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস এপর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে আর বাহির হয় নাই। একবার পড়িতে
আরম্ভ করিলে অদম্য আগ্রহে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। না পড়িলে বিজ্ঞাপনের
কথায় ঠিক বুঝা যায় না। পড়ুন—পড়িয়া মুগ্ধ হউন। চিত্র-পরিশোভিত, সুরম্য বাঁধান

8	1	6
3	5	7
4	9	2